জিন
এম. জে. বাবু

এম. জে. বাবু

সম্পাদনায়

উম্মে কুলসুম সাদিয়া
মুকাম্মিল, মুহম্মদিয়া জামিয়া শরীফ

উ ৎ স র্গ

আমার একমাত্র বোন রুবি আক্তার
ও
দুলাভাই আব্দুল আউয়ালকে

প্রকাশকাল	First published
জানুয়ারি ২০২২	January 2022
প্রকাশক	Published by
রাজীব দত্ত	Rajib Datta
গ্রন্থরাজ্য	Grantharajjo
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০	38/4 Banglabazar, Dhaka-1100
ফোন: ০১৮৩২১৬৯২১৬	Phone : 01832169216
জিন	Jin
এম. জে. বাবু	M. J. Babu
গ্রন্থস্বত্ব	Copyright
লেখক	Writer
প্রচ্ছদ	Cover design by
সজল চৌধুরী	Sazal Chowdhury
বর্ণবিন্যাস	Compose
গ্রন্থরাজ্য কম্পিউটার্স	Grantharajjo Computers
মুদ্রণ	Printed by
একাত্তর প্রেস	Eakattor Press
প্যারিদাস রোড, ঢাকা	Piaridas Road, Dhaka
মূল্য	Price
৫৮০.০০	580.00 only

E-mail : grantharajjobd@gmail.com

ISBN : 978-984-95736-7-8

লেখকের কথা

আসসালামু আলাইকুম।

বইটি ২০১৭ সালে শুরু করি আর পূর্ণাঙ্গ শেষ করি ২০২১ সালের ৯ই নভেম্বর। মাঝখানে এতগুলো বছর চলে গেল, অনেকগুলো বই লেখা হলো, কিন্তু এটা শেষ হলো না। যাইহোক, অবশেষে উপরওয়ালার রহমতে সব শেষ করলাম। বইয়ে অসংখ্য রেফারেন্স আছে সুতরাং কিছু রেফারেন্স হয়তো এদিক-ওদিক হতে পারে। সেজন্য আমাকে জানালেই ইনশাআল্লাহ আমি ঠিক করে নেব।

আশা করি, আপনারা সকল প্রত্যাশা ছেড়ে এই বইটি একজন নতুন লেখকের বই হিসেবে পড়বেন। বেশি আশা রেখে বইটি শুরু না করার অনুরোধ রইল। কারণ এটা আমার তিনটি বই (দিমেন্তিয়া আর অ্যাবসেন্টিয়া, পিনবল) এর মতো না। সম্পূর্ণ ভিন্ন জনরার, ভিন্ন বই।

বইতে উল্লিখিত রুকইয়া শুধু স্যাম্পল। অভিজ্ঞ রাকীর পরামর্শ নেওয়ার অনুরোধ রইল। তবুও রুকইয়াটি আমি দিলাম কারণ, বলা যায় না কোনটা কখন কাজে লাগে।

বইয়ের কিছু অংশ, স্রেফ একটা প্যারা গল্পের খাতিরে তাফসীর থেকে হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে। বইয়ে রেফারেন্স দেওয়া তথ্যগুলো হলো নন ফিকশন, আর বাকি সব ফিকশন।

"জিন" আমার কাছে একটি অধ্যবসায়ের নাম। প্রায় পাঁচ বছর এর পিছনেই চলে গেছে।

অবশ্য যাওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। মোটা দাগে যদি বলি, আমার ইচ্ছা, উদ্দেশ্য হচ্ছে লেখার মাধ্যমে ইসলামি দুনিয়াকে তুলে আনা আর তা যাতে সব শ্রেণীর পাঠক আনন্দ নিয়ে পড়তে পারে- সেরকম করে উপস্থাপন করা।

গৎবাঁধা নন-ফিকশন লিখতে পারতাম। তেমন ক্ষতি হতো না। কিন্তু আমার নিজের নন-ফিকশন পড়তে আলসেমি লাগে। সে কারণে যা ঐতিহাসিক থ্রিলার লেখকরা করে, আমিও তা করলাম।

অকাল্ট আর হরর থ্রিলার হিসেবে এসব তথ্য তুলে আনলাম। আমি আমার আগের দুটো বইয়ে (দিমেন্তিয়া আর অ্যাবসেন্টিয়া) ইনফো ডাম্প করেছিলাম। উদ্দেশ্য সফল হয়েছে আমার, পাঠকও বিরক্ত হয়নি।

জিনও তেমন। তবে একটু ভিন্ন। পুরো বইয়ে সরাসরি রেফারেন্স ব্যবহার করেছি। যেমন, অমুক এই কথা বলেছে বা এই বইয়ে এরকম বলা আছে।

এমন করার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ জিন, কালো জাদু নিয়ে এত মিথ আর ভুল তথ্য যে, রেফারেন্স দিয়ে না লিখলে আমার লেখার ভ্যালিডিটি চলে যেত। সবাই ভাবতো অন্য আট দশটা বইয়ের মতো এই তথ্যগুলোও বুঝি মুখরোচক।

আর দ্বিতীয় ধাক্কাটা আসতো ইসলামি স্কলারদের থেকে। তারা আঙুল তুলতো এসব কোথা থেকে পেলাম সেদিকে। তাছাড়া যারা ভিন্নমত তারাও ধরতো। নানান কিছু করতো, যেমনটা এক মতের মানুষ আরেক মতের মানুষের সাথে করে।

বিষয়টি অত্যধিক সেন্সিটিভ, রিস্কি। এখানে পান থেকে চুন খসলে 'কাফির' বলতে দ্বিধাবোধ করবে না। এসব ভেবে সরাসরি রেফারেন্স দিয়ে লেখা।

আশা করি বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটি। আমি জানি আপনাদের খানিকটা বিরক্ত লাগবে, কিন্তু আমার দিকটাও কনসিডার করবেন। তাছাড়া সোর্সগুলোও বেশ ভালো।

আর কথা বাড়াব না, আমার কাজে সাহায্যকারীদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে শেষ করব। আরবি ভাষার ক্ষেত্রে আমার জ্ঞান শূন্যের কোঠায়। এ ব্যাপারে সাহায্য করেছেন শ্রদ্ধেয় বড় ভাই নঈম সিদ্দিকী। আল্লাহ তায়ালা তাকে সফলতা দান করুন। বইটির বেটা রিডার হিসেবে ছিল আরিয়ান শুভ এবং শাশ্বত ইসলাম অভয়। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

আমাকে লেখক বানানোর জন্য যারা উৎসাহ দিয়ে আসছেন তাদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে সফল করুন। ধৈর্য ধরে বইটি সম্পাদনা করেছেন উম্মে কুলসুম সাদিয়া। আল্লাহ তায়ালা তাকেও সফলতা দান করুন।

যে কোনো প্রয়োজনে,
mjbabu808@gmail.com

সম্পাদকের কথা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য। রসূল পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অফুরন্ত দরূদ ও সালাম।

"জিন" বইটিকে নির্ভরযোগ্য তথ্যসমৃদ্ধ ফিকশন বলা যেতে পারে। আমাদের মধ্যে অনেকেরই নানান তথ্য জানার আগ্রহ থাকলেও নন-ফিকশন পড়ার প্রতি অনাগ্রহ কাজ করে। তাদের জন্য এই বইটি বেশ উপযুক্ত। লেখক এখানে খুব দক্ষতার সাথে গল্পে গল্পে জিন জাতির ইতিহাস, কালো জাদুর প্রকারভেদ, জিন তাড়ানো বা কালো জাদু কাটানোর উপায় বর্ণনা করেছেন। যা নন-ফিকশনের একঘেয়েমি দূর করে বইটিকে উপভোগ্য করে তুলেছে।

"জিন" বইটি যেমন এক হিসেবে লেখকের প্রথম বই, আমারও প্রথম সম্পাদনা। "ছাপাখানার ভূত" বলে বাংলায় একটি কথা রয়েছে। বাংলা বানানে এতই বৈচিত্র্য যে, কোনো বাংলা বই একেবারে নির্ভুল করে প্রকাশ করা বোধ হয় অসম্ভব। তাই এই বইয়ে আমাদের ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। আপনার চোখে পড়া ভুলগুলো অনুগ্রহপূর্বক আমাদেরকে জানালে আমরা পরবর্তী মুদ্রণে শুধরে নেব ইনশাআল্লাহ।

নিজের নাম ছাপার অক্ষরে দেখতে পাওয়া বোধ হয় প্রত্যেক বইপ্রেমীর আজন্ম লালিত স্বপ্ন। আমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। আমার এই যাত্রার শুরু লেখক হিসেবে না হয়ে সম্পাদক হিসেবে হওয়ার পেছনে যার অবদান অনস্বীকার্য, তিনি হচ্ছেন লেখক এম. জে. বাবু। তিনি, আমার শুভাকাঙ্ক্ষীগণ এবং এই বইয়ের সকল পাঠকের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।

ওয়াসসালাম।

উম্মে কুলসুম সাদিয়া

ঢাকা

নভেম্বর, ২০২১

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ

এই বইটি মূলত একটি তথ্যভিত্তিক বই। বইয়ে অসংখ্য রেফারেন্সসহ তথ্য দেওয়া আছে এবং পুরো বইটি ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। শুধু তাই নয়, একটি পূর্ণাঙ্গ রুকইয়া দেওয়া আছে যা হয়তো আপনাদের বিরক্ত করবে। অবশ্য এটি না পড়লেই ভালো হবে। যখন প্রয়োজন পড়বে ইনশাআল্লাহ সেটি বের করে দেখে নেবেন। সুতরাং বইটি হাতে নেওয়ার আগে আপনারা মাথায় রাখবেন যে, আপনাদেরকে অনেক তথ্য হজম করতে হবে।

ٱلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ

﴿سورة الانعام: ٨٢﴾

"যাঁরা ঈমান আনেন এবং তাঁদের ঈমানকে যুলুম তথা শিরকের সাথে মিশ্রিত করেন না, তাঁদের জন্যই নিরাপত্তা, আর তাঁরাই সৎপথ প্রাপ্ত।"

(সূরা আনআম — ৮২)

প্রাককথন

মেয়েটি তার বাম হাত দিয়ে শক্ত করে পুতুলটিকে বুকের সাথে ধরে রেখেছে। ধূসর রঙের ছোট একটি কাঠের পুতুল, পুতুলটির গায়ে মিহি জবা ফুলের নকশা, জবার উপর লাল রং করা। সমস্ত পুতুলটি ধূসর হলেও কোন এক অদ্ভুত কারণে জবা ফুলটি শুধু লাল রং করা। পুতুলের রং কেমন, তা নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই। সে চিন্তা করছে পুতুলটি যেন হাত থেকে ফসকে পড়ে না যায়। পুতুলটি মেয়েটির বুকের একাংশ এমনভাবে দখল করে আছে যেন ছোট একটি শিশু মায়ের বুকে আলতো করে লেপ্টে আছে।

আজকে সন্ধ্যায় তার মায়ের ছেঁড়া একটি শাড়ির আঁচল কুড়িয়ে এনে তা পুতুলটির গায়ে আলতো করে লেপ্টে দিয়েছে। মিহি কাপড়টা পুতুলটিকে ভাসা ভাসা মেঘের মতো জড়িয়ে আছে। সে তার মাকে অনুকরণ করে পরিয়েছে, যেভাবে তার মা পরে ঠিক সেভাবে। পুতুলটি তার অনেক প্রিয়। এই পুতুলটিই তার একমাত্র খেলার সাথি। তাই সে পুতুলটিকে হাতছাড়া করে না, সাথে নিয়ে রাখে সবসময়।

মেয়েটি এক হাত দিয়ে পুতুলটি আর অন্য হাত দিয়ে তার মায়ের শাড়ির আঁচল আগলে আছে। আঁচলটি টেনেই ধরে আছে যার দরুন তার মা তার দিকে একটু ঝুঁকে আছে। মেয়েটি ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। তার চোখ দুটো ছোট ছোট করে দেখছে সব, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে আছে। ভয় যে তাকে চোরাবালির মতো আস্তে আস্তে গ্রাস করছে তা তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ভয়ের সাথে মেয়েটি পরিচিত না তবুও যেন ভয় তার কত প্রিয়। পরগাছার মতো আস্তে আস্তে ভয় তাকে দখল করে নিচ্ছে, আগলে নিচ্ছে তার বাহুডোরে। কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করতে না পারলে ভয়ের দাসত্ব স্বীকার করতে হবে তাকে।

সে পুতুলটিকে বুকের সাথে জড়িয়ে নিয়ে ঘুমাচ্ছিল। মধ্যরাতে হঠাৎ করে তার মা তাকে তুলে নিয়ে এসেছে। চোখ জ্বলছে তার, ঠিকমতো তাকাতে পারছে না। যা কিছু তার চোখের সামনে উদয় হচ্ছে সব সে ঝাপসা দেখছে। বারবার চোখ কচলাচ্ছে। চোখের পাতায় হাতের ঘর্ষণের ফলে জ্বলছে তবুও যেন তার চোখ দুটি চিরচেনা আপন রূপে ফিরছে না।

সে চোখ খুলে রাখার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। একটু পরপর তার চোখ লেগে আসছে, তারপর আবার মায়ের ঝাঁকি খেয়ে চোখ খুলছে, কিন্তু এবার আর সে পারছে না। এবার তার মনে হচ্ছে আরেকটু থাকলে সে ঘুমে নিচে গড়িয়ে পড়বে। নিজের ইচ্ছা আর শরীরের বিরুদ্ধে মায়ের আঁচল ধরে ধরে সন্তর্পণে হাঁটছে। মৃদু অন্ধকারে কোথায় যাচ্ছে সে ঠিক জানে না। অন্ধভাবে অনুসরণ করছে তার মাকে।

ঘুমে জড়ো জড়ো অবস্থায় সে তার মাকে জিজ্ঞেস করল, "মা, কোথায় যাচ্ছি এত রাতে?"

কথাগুলো বলতে বলতে জড়িয়ে আসল মেয়েটির গলা।

মেয়েটির এই কথা শুনে মা হেসে বলল, "মা, আজ তোমার জন্য একটি সারপ্রাইজ আছে।"

সারপ্রাইজ! তার সারপ্রাইজ খুব ভালো লাগে। তার মা তাকে মাঝেমধ্যেই সারপ্রাইজ দেয়। এই পুতুলটি সে এমন এক সারপ্রাইজে পেয়েছিল। ঘুমে তার চোখ জ্বালা করছে। মেয়েটির ইচ্ছে করছিল ঘুমাতে। কিন্তু সে সারপ্রাইজ মিস করতে চাচ্ছে না। তাই কিছু না বলে সন্তর্পণে এগিয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে মেয়েটি তার মায়ের পিছু পিছু একটি খোলা কামরার কাছে এলো, কামরাটি নিগূঢ় অন্ধকারে ঢাকা নেই, কামরাটির ভিতর মৃদু আলো দেখল সে, কিন্তু তবুও তার ভিতরে ঢুকতে মন সায় দিচ্ছিল না।

সে তার বাড়ির প্রত্যেকটি কামরাই চেনে। তার আবদ্ধ জীবনে এই বাড়ির কামরাগুলো ছিল এক টুকরো স্বর্গ। সেগুলোকে সে ভুলবে কী করে! কিন্তু আজ সে যে কামরাটিতে এসেছে, তার মনে হলো সে এখানে আর আগে কখনো আসেনি। দেওয়ালের দিকে তাকাতেই তার ভয় লাগছে। গাঢ় লাল রঙের ছাপ দেয়ালগুলো দখল করে আছে। সে বুঝতে পারল না দেয়ালে লাল রঙের কীসের ছাপ এগুলো। ছাপগুলোর দিকে মেয়েটি অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। একটা মায়া যেন জড়িয়ে আছে ছাপগুলোর মধ্যে। ছোট্ট মেয়েটি যে নিজের অজান্তেই সে মায়ার বশীভূত হচ্ছে তা তার বোধগম্য হলো না আর।

মৃদু আলোয় আলোকিত হয়ে আছে কামরাটি। মেয়েটি দেয়াল থেকে চোখ সরিয়ে নিচে নামাল। নিচে ফ্লোরে কী যেন একটি জিনিস রাখা। মেয়েটি দেখেই ভয় পেয়ে গেল, মায়ের আঁচল ধরে ফেলল, মা তার দিকে রাগী চোখে তাকাল, ভয় পেয়ে মায়ের আঁচল ছেড়ে চোখ কুঁচকে তাকাল ফ্লোরে রাখা জিনিসটির দিকে; কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না।

মেয়েটির অনেক ভয় করছে। সে পুতুলটিকে আরও শক্ত করে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরল। ভয় যেন নিজেকে জাহির করে আকস্মিক আক্রমণ করল তাকে। এতক্ষণ সে ভয়ের অস্তিত্ব পাচ্ছিল কিন্তু এরকমভাবে ভয়ের মুখোমুখি আর হয়নি। চোখের মণি ভয়ে ছোট হয়ে গেল। হঠাৎ করে নিভে গেল চোখের মণি, ক্ষণিকের জন্য অন্ধকারে ঢেকে গেল তার দুনিয়া; ভয় যেন ক্ষণিকের জন্য হারিয়ে গেল, কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পর মণি আবার জ্বলে উঠল। ঠিক তখনই আবার ভয় গ্রাস করে নিল তাকে। এই আলোর ভয়ানক দুনিয়া থেকে যেন অন্ধকারের প্রাণহীন জগৎ তার কাছে ভালো হয়ে গেল। পুতুলটিকে জড়িয়ে ধরার পরও তার ভয় কাটছে না।

সে তার মায়ের দিকে তাকিয়ে আঁচল ধরে তোতলাতে তোতলাতে বলল, "মা! মা! আমার ভয় করছে।"

তার কথাগুলো কামরার চার দেয়ালে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে আবার তার কাছেই ফিরে এলো। তার মা তার দিকে তাকাল। অপলক, নির্জীব দৃষ্টির আড়ালে কেমন একটা বিষাক্ত কামনা ফুটে উঠল। সে টের পেয়েছে বইকি! তার শরীর জমে গেল মায়ের দিকে তাকিয়ে।

মা মুখ ফিরিয়ে বলল, "কোনো ভয় নেই মা। আমি আছি। তুমি এখানে একটু দাঁড়াও।"

সে তার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বড্ড অস্বাভাবিক মনে হলো তার মায়ের গলা। তার মনে হলো মায়ের ভিতর থেকে অন্য কেউ কথা বলল। মায়ের মুখ হঠাৎ অচেনা হয়ে গেল তার কাছে। সে চিনতেই পারল না তার সামনে এই মৃদু আলোয় কে দাঁড়িয়ে আছে। সে দেখল তার মা মুখ ফিরিয়েই নিজের আঁচল ছাড়িয়ে নিয়েছে তার হাত থেকে।

পাথরের মতো ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল সে। ভয়ের তীব্রতা যেন বেড়ে গেল কয়েকগুণ। ভয়ে দুহাত দিয়েই পুতুলটিকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইল সে। তার নাকে এসে একটি গন্ধ লাগল। সে আগে কখনো এই গন্ধ পায়নি। গন্ধ এতই তীব্র যে সে সহ্য করতে পারল না, নাক চেপে ধরল। তার হাত থেকে নিচে পড়ে গেল পুতুলটি।

ধপ করে আওয়াজ হলো। আওয়াজটা প্রতিধ্বনিত হয়ে যেন কয়েকগুণ জোরালো হয়ে ফিরে এলো তার কানে। ছিমছাম পরিবেশে যে নির্জনতা বিরাজ করছিল তা ভেঙে খানখান হয়ে গেল। দেরি না করে ঝুঁকে পুতুলটি তুলে নিল সে। তার হাত কাঁপছে, পুতুলটিকে সে কোনো মতে

ধরে বুকের সাথে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। তার মায়ের দিকে ফিরে দেখল তার মা ভাবলেশহীনভাবে চোখ বড় করে তাকিয়ে আছে। সে চোখ নামিয়ে ফেলল। সে তার মায়ের এমন চাহনি সহ্য করতে পারছে না। তার বড্ড ভয় করছে। এটা মা কি না এ নিয়ে যেন তার মধ্যে এক বিভ্রম সৃষ্টি হচ্ছে যেন। সে পুতুলটিকে সমস্ত শক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরে রইল।

"মা, এদিকে এসো।"

মায়ের আওয়াজ তার কানে এলো। ভয় অনেকাংশে কমে গেল তার। কারণ এবার মা চিরাচরিত গলায় বলল। প্রিয়জনের একটু অস্তিত্ব যেন পাহাড়সম ভয়কে দূরে ঠেলে দেয়। মেয়েটির বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হলো না। মেয়েটি আওয়াজকে উদ্দেশ্য করে দেখল তার সামনে একটি অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক সেকেন্ড পর সে বুঝল অবয়বটি আর কেউ নয়, তার মা। তার সমস্ত বিভ্রম কেটে গেল, ভয়ও যেন তার কাছ থেকে ছুটি নিতে লাগল।

মেয়েটি তার মাকে উদ্দেশ্য করে সামনে এগিয়ে মায়ের পাশে এসে দাঁড়াল। তার দিকে তাকিয়ে হাসি দিল মা। হাসিটা কেমন যেন ম্লান। চিরচেনা তার মায়ের হাসি থেকে যেন অনেক দূর এই হাসি। মৃদু আলোতে হঠাৎ সে দেখতে পেল তার মায়ের চোখের নিচে কী যেন চিকচিক করে উঠল। অচিরেই সে বুঝতে পারল তার মায়ের দুচোখ বেয়ে পানি পড়ছে।

মা কাঁদছে!

মায়ের কান্না দেখে তার অনেক কষ্ট হচ্ছে। বুকের ভিতরে কেউ যেন সন্তর্পণে চাপ দিচ্ছে। চাপটা এত গভীর না, কিন্তু তবুও তা বুকটাকে কেমন ভারী করে দিচ্ছে। চাপ বুক পেরিয়ে গলায় এসে পড়ল। গলাটাও কেমন তার ভারী হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কথা বলতে গেলেই সবকিছু চেপে আসবে। সে শরীরটাকে হালকা ঝাড়া দিয়ে আড়ষ্টতা দূর করলো।

সে জড়ানো কণ্ঠে বলল, "মা, কাঁদছ কেন?"

মা তার কথা শুনে তড়িঘড়ি করে চোখের পানি মুছল। মুখে একটি ম্লান হাসি ঝুলিয়ে বলল, "এমনি মা।"

মা ঝুঁকে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। মন ভালো হয়ে গেল তার। যখন এভাবে তার মা তাকে আদর করে তখন তার অনেক ভালো লাগে। সে-ও তার মাকে জড়িয়ে ধরল। তার মা তাকে জড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

মা তাকে ছাড়িয়ে নিল। মায়ের দিকে তাকাল সে। মা এখন আর কাঁদছে না। সে খুব খুশি হলো। কিন্তু হঠাৎ করেই মায়ের মুখ কেমন শক্ত হয়ে গেল আবার। মা তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে। সে মায়ের

একপাশ দেখল। সেখানে চোয়াল শক্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। মা দাঁতে দাঁত চেপে আছে; নিশ্চয় রেগে আছে। কিন্তু সে তো কোনো কিছু করেনি। তাহলে মা কেন রেগে আছে!

মা আবার তার দিকে তাকাল। ধক করে উঠল তার বুক। মায়ের চোখ দুটি অনেক লাল হয়ে আছে।

মা তার দিকে তাকিয়ে ভারী গলায় বলল, "মা, পুতুলটি দাও।"

সে ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কেন মা?"

মা মুখ শক্ত করে বলল, "এমনি, দাও।"

সে তার মায়ের কথায় ভয় পেল। মা রেগে আছে। মা যখন রেগে যায় তখন এরকম শক্ত মুখ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কথা বলে না তার সাথে। তাকে আদর করে না, কপালে চুমু খায় না, কোলে তুলে নেয় না। তার এটা ভালো লাগে না। সে মাকে রাগাতে চায় না। কিন্তু মা রেগে যায়।

সে পুতুলটি তার মায়ের দিকে বাড়িয়ে দিলে মা অনেকটা টান দিয়েই সেটি নিয়ে নিল। পুতুলটিকে নিচে রেখে তার দিকে তাকিয়ে চোখ দিয়ে ইশারা করল। সে বুঝতে পারল তার মা কী বোঝাতে চাচ্ছে। এই ইশারা সে তখনই পায় যখন মা তাকে বসতে বলে। সে বসার জন্য নিচে তাকাল। তার চারপাশে একটি কালো রেখা। মোটা কালো রেখা। সে রেখাটিকে চেনার চেষ্টা করছে।

হ্যাঁ, বৃত্ত।

মেয়েটি "বৃত্ত!" বলে চিৎকার দিল। এবার তার চিৎকার নির্জনতাকে ভেঙে দিল আবার। তার চিৎকার শুনে মা আবার মুখ শক্ত করে ফেলল। মাকে দেখে ভয়ে বৃত্তের মধ্যে বসে পড়ল সে।

তার মা ঝুঁকে কী যেন তুলল। সে ভালো করে খেয়াল করে দেখল মা নিচ থেকে একটি ব্যাগ তুলে নিল। লাল রঙের একটি ব্যাগ। লাল রং তার ভীষণ প্রিয়। কিছুদিন আগে মা লাল রঙের এক প্যাকেট সন্দেশ এনে দিয়েছিল। সন্দেশ তার ভীষণ ভালো লাগে। তবে সে বেশি খায় না। মা বলে বেশি মিষ্টি খেলে নাকি দাঁতে পোকা ধরে।

সে কৌতূহলী হয়ে মায়ের ব্যাগের দিকে তাকিয়ে রইল। ব্যাগটি খানিকটা চারকোণা বাজারের ব্যাগের মতো। মা যখন বাইরে বের হয়, এরকম ব্যাগ নিয়ে বের হয়। মা ব্যাগের চেন খুলে ব্যাগ থেকে চকচকে একটি জিনিস বের করে আনল। সে এই আবছা আলোয় বুঝতে পারল না সেটি কী। মা মুখ শক্ত করে রেখে ব্যাগ থেকে বের করা বস্তুটি নিচে রাখল, তারপর চোখ বন্ধ করে কী যেন বলল। মেয়েটি এবারও বুঝতে পারল না। সে তাকিয়ে আছে মায়ের ঠোঁটের দিকে।

মা চোখ বন্ধ করে আছে, তার ঠোঁট দুটি অনবরত নড়ছে। অনেকক্ষণ মা চোখ বন্ধ করে ঠোঁট নাড়াল। হঠাৎ তার মায়ের পিছনে একটি ছায়া দেখতে পেল সে। হঠাৎ করেই ছায়াটি উদয় হলো মায়ের পিছন থেকে। ছায়ামূর্তিটি দেখে তার বুক ধক করে উঠল, গলা শুকিয়ে গেল। সে আঁতকে উঠে পিছনে পড়ে গিয়ে চিৎকার দিল। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ছায়ামূর্তির দিকে তাকাল সে। নিজেকে সামলে নিয়ে এক দৌড়ে মাকে জড়িয়ে ধরল।

"মা আমার ভয় লাগছে। তোমার পিছনে কী যেন আছে।" সে চোখ বুজে বিড়বিড় করে বলল।

"মা, তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি চোখ খোল।" মায়ের ঠান্ডা গলা শুনল সে।

তার মনে সাহস এলো। আস্তে আস্তে চোখ খুলল সে। চোখ খুলে সে উঁকি দিয়ে তার মায়ের পিছনে তাকাল। না, এবার মায়ের পিছনে কোনো ছায়ামূর্তি নেই। ভালো করে খেয়াল করল সে। আবছা আলো-ছায়ার খেলা ছাড়া কিছুই দেখল না, তবুও মাকে জড়িয়ে ধরে রাখল সে। হঠাৎ করে সে হালকা গোঙানির আওয়াজ পেল। সে এই আওয়াজ আগেও শুনেছে। মা কাঁদছে। মা কখনো তার সামনে কাঁদেনি। সে লুকিয়ে মাকে কাঁদতে দেখত। মা তাকে দেখলেই কান্না বন্ধ করে চোখ মুছে ফেলত। কিন্তু আজ তেমন কিছু করছে না। তার সামনেই অঝোরে কাঁদছে।

"মা তুমি ওখানে গিয়ে বসো।" মা তাকে কোল থেকে সরিয়ে ওই বৃত্তের দিকে নির্দেশ করে বলল।

সে আবার গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে বৃত্তের মাঝখানে গিয়ে বসল। মা নিচ থেকে সেই জিনিসটি তুলে নিয়েছে। সে খেয়ালই করেনি মায়ের হাত থেকে বস্তুটি কখন নিচে পড়েছে। সে আগে কখনো এরকম কিছু দেখেনি। জিনিসটি লম্বা, চিকন। তাতে আলো পড়ে চকচক করছে। মা সেটির একপাশে ধরে আছে। মা সেটি নিয়ে আবার চোখ বুজে বিড়বিড় করে কী যেন পড়তে লাগল। পরিবেশটা হঠাৎ করে বদলে গেল। কেমন থমথমে হয়ে গেল সবকিছু। তার ঠান্ডা লাগছে। সে পুতুলটি কুড়িয়ে নিল, পুতুলটিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রাখল নিজের বুকের সাথে, তারপর আস্তে আস্তে চোখ তুলে তাকাল মায়ের দিকে।

আবছা আলোয় দেখতে পেল তার মায়ের পিছনে একটি ছায়া। কালো লম্বা একটি ছায়ামূর্তি মায়ের আশেপাশে ঘুরছে। মুহূর্তেই ছায়ামূর্তিটি মায়ের পিছনে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই ছায়াটি তার দিকে তাকাল। ভয়ে চোখ বুজে ফেলল সে। তীব্র ভয় পেল। হাত থেকে

পুতুলটি আবার খসে পড়ল। আস্তে আস্তে চোখ খুলল সে। চোখ মেলে দেখল সে ছায়াটি মায়ের পিছন থেকে এসে তার চারপাশে ঘুরতে লাগল। বৃত্তটির চারপাশে তাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। সে চিৎকার করল, কিন্তু তার গলা থেকে কোনো আওয়াজ বের হলো না। ভয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে দৌড় দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু সে তার জায়গা থেকে নড়তে পারল না, তার পা দুটি যেন পাথরের মতো মাটির সাথে লেগে আছে।

সে তার মায়ের দিকে তাকাল। মা এখনও চোখ বুজে বিড়বিড় করে কী যেন পড়ছে। ছায়াটি একটু পরপর তার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। সে ভয়ে পুতুলটি খুঁজতে লাগল। মায়ের পাশেই সেটি পড়ে আছে। সে পুতুলটির দিকে হাত বাড়াল, কিন্তু সেটি তার নাগালের বাইরে। ছায়ামূর্তিটি এখনও তার চারপাশে ঘুরছে। সে অনেকবার চেষ্টা করল পুতুলটি ধরতে, কিন্তু নাগাল পেল না। সে ভয়ে দুহাত দিয়ে তার চোখ ধরল। আঙুল ফাঁক করে তাকাল, ছায়ামূর্তিটি এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে আবার আঙুল এক করে চোখ বুজে রইল।

তার বাম হাত হঠাৎ করে কে যেন শক্ত করে ধরল। সে ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠল। চোখ খুলে দেখল মা তার বাম হাত ধরে আছে।

সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, "মা তুমি আমাকে ব্যথা দিচ্ছ।"

তার মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ বের হলো না। মা সেই ব্যাগ থেকে বের করা বস্তুটি এক হাত দিয়ে ধরে আছে। সে কিছু বোঝার আগেই সেটি তার গলা বরাবর নেমে এলো। তার গলায় সে প্রচণ্ড রকমের ব্যথা অনুভব করতে লাগল। অসহনীয় ব্যথা। সে চিৎকার দিতে চেষ্টা করল। চিৎকার দিতে গিয়েই বুঝল তার গলা প্রচণ্ড ব্যথায় ঝুলে পড়ছে। আস্তে আস্তে সে যন্ত্রণা গলা থেকে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। তার মাথা ঝিমঝিম করছে। তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। প্রচণ্ড কষ্টে কাতরাচ্ছে সে।

সে তার মায়ের দিকে তাকাল। মায়ের মুখ এখনও কঠিন। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তার প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে, চোখ দুটি বুজে আসছে, ঘুমানোর আগে তার পুতুলটিকে দেখার চেষ্টা করল। সেটি লাল হয়ে আছে। পুতুলটির দুচোখ বেয়ে কেমন যেন লাল রঙের পানি গড়িয়ে পড়ছে। সে পুতুলটির দিকে তাকিয়ে আছে। তার পুতুল লাল হয়ে যাচ্ছে। এটা তার মোটেও ভালো লাগছে না। এই চরম কষ্টের মাঝেও যেন পুতুলটির এই অযত্ন সে সহ্য করতে পারছে না। ঘুমিয়ে যাওয়ার আগে মাকে বলতে হবে পুতুলটির সাথে এমন কেন করেছে।

"মা! মা! তুমি কেন পুতুলটির সাথে এমন করেছ?"

কথাগুলো যেন আর বের হলো না। গলা দিয়ে স্রেফ গরগর শব্দ হলো। তার শেষ বাক্যগুলো নিজের কাছে অনেক ভারী মনে হলো। মুহূর্তেই সে তলিয়ে গেল অন্ধকার গহ্বরে।
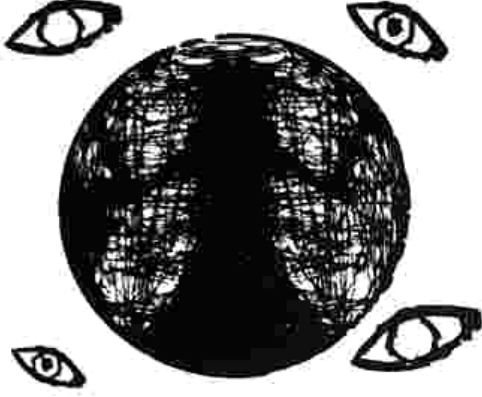
প্রিন্সিপালের রুমে বসে আছে সাজেদ। মাথা নিচু করে রুক্ষ কাঠের খয়েরি রঙের টেবিলটার দিকে তাকিয়ে আছে। কতক্ষণ ধরে তাকিয়ে আছে তা খেয়াল নেই, কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে আছে তা নিশ্চিত। পাশেই সাজেদের স্ত্রী তারিন। সেও আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। সে এখন কী করছে তা সাজেদ জানে না। খানিক আগেই তারিন মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারপাশ দেখছিল। এখনও বুঝি তা-ই করছে। যখন কিছুই করার থাকে না তখন বারবার একই কাজ করা তার স্বভাব।

সাজেদ এসেছে এতিমখানায়। হঠাৎ করেই তারিন সিদ্ধান্ত নিল সে বাচ্চা দত্তক নেবে। জেদ ধরে বসল। সে যা জেদ করে তা করবেই। সাজেদ উপায়ান্তর না দেখে চলে এলো এই এতিমখানায়। বড়লোক বাপের একমাত্র মেয়েগুলো বড্ড একরোখা আর জেদি। যা সিদ্ধান্ত নেবে তা যেকোনো মূল্যে আদায় করবে। অবশ্য তারা জীবনে খুব কম ব্যাপারেই এরকম সিদ্ধান্ত নেয়।

সাজেদ আর তারিনের বিয়ে হয়েছে প্রায় সাত বছর। ছয় বছর আগে তারিন প্রথমবারের মতো কনসিভ করেছিল। কিন্তু জন্ম মাত্র কয়েক মাস আগেই মিসক্যারিজ হলো। সে শোক কাটিয়ে উঠতে তারিন আর সাজেদের লেগে গেল কয়েক বছর। দ্বিতীয়বার যখন বাচ্চা নিতে গেল তখন আর নেওয়া হলো না। ডাক্তার দেখানোর পর বুঝতে পারল সাজেদের স্পার্ম কাউন্ট লো হয়ে গিয়েছে। সাজেদ দেশে-বিদেশে অনেক ডাক্তার দেখিয়েছে কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। সাজেদের শ্বশুর অনেক কবিরাজও দেখিয়েছে কিন্তু সব যেন বর্ষার বৃষ্টির মতো হিতে বিপরীত করেছে।

উঠতি পলিটিক্যাল জায়েন্ট সাজেদ। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের একজন সংসদ সদস্য। যদি এই খবর কোনো কারণে ছড়িয়ে যায় তার পাবলিক ইমেজ অনেকটাই নিচে নেমে যাবে, অবশ্য তার শারীরিক অক্ষমতার কথা তারিন ছাড়া

আর কেউ জানে না, কারণ তারিন বাচ্চা না হওয়ার দোষ নিজের উপর নিয়ে নিয়েছে; সবাইকে বলে বেড়ায় সমস্যা তার নিজের। সাজেদের পিতৃকুলের দিক থেকে কেউ নেই বলে তারিনকে কোনো রকম খোঁচা শুনতে হয় না। এই অসুখের সংসারে বোধ হয় এই সুখটুকুই ছিল দুজনের–খোঁচাহীন জীবন।

সাজেদের শ্বশুর খন্দকার শহিদ হোসেন। বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী। বয়স প্রায় সত্তর ছুঁইছুঁই। সাধারণ কোনো মন্ত্রীর মতো মোটেই নয় সে। মেদহীন শরীর, মাথাভর্তি সাদা চুল, ক্লিন শেভড মুখ। এই সবকিছুই যেন তাকে অন্য সবার থেকে আলাদা করে ফেলে। তারিনও ঠিক বাপের বেটি। দুধে আলতা গায়ের রং, চোখা নাক, টানা চোখ আর দুপাশে সমানভাবে প্রশস্ত চিবুক নিঃসন্দেহে তারিনকে রূপের রাণি করে তুলেছে। তারিনের মতো রূপবতী আর কোনো মেয়ে দেখেনি সাজেদ। মেয়েটি যখন সাজেদের বউ হয়ে আসে তখন সে শুধু একটি বছর তার দিকে তাকিয়েই পার করে দিয়েছিল।

শহিদের হাত ধরেই রাজনীতিতে প্রবেশ সাজেদের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল সায়েন্সে পড়ার সময় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে সে। অল্প দিনেই অনেক নাম কামিয়ে ফেলে। নজর কাড়ে বড় বড় নেতাদের। সাজেদ টার্গেট করে ক্ষমতাসীন দলের খন্দকার শহিদ হোসেনকে। অল্প দিনে শহিদ হোসেনের প্রিয়পাত্র হয়ে যায় সে। তারপর রাস্তা তার জন্য এমনিতেই পরিষ্কার হয়ে যায়। এই নির্বাচনে সে এমপি হয়। যদিও নির্বাচন নামে কিছুই ছিল না। শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতির জের ধরেই এমপি হয়েছে সাজেদ। আর সাথে শ্বশুরের হাত ছিল মাথায়। দুয়ে দুয়ে চার। কম বয়সে এমপি হয়ে গেল সে।

সাজেদ টেবিলের উপর থেকে চোখ তুলে সামনে তাকাল। প্রিন্সিপাল সাহেব মাথা নিচু করে একটি খাতা দেখে যাচ্ছেন। এমপি এসেছে এই বিষয়ে যেন তাঁর কোনো পাত্তাই নেই। পৃথিবীতে এই এক শ্রেণির মানুষকে সাজেদের ভালো লাগে না। তারা মন্ত্রী কিংবা প্রেসিডেন্ট — কাউকে ভয় করে না। তারা হলো শিক্ষক শ্রেণি। তবে সব শিক্ষক না, কিছু কিছু শিক্ষক।

আর কিছু শিক্ষকদের মধ্যে একজন সাজেদের সামনে বসা প্রিন্সিপাল সাহেব। তার সামনে বসে শুধু খাতা উল্টিয়ে যাচ্ছেন। সেই আসার পর থেকে দেখে যাচ্ছে তিনি এমন করছেন। একজন এমপি না, সাধারণ একজন মানুষ হিসেবে যতটুকু আপ্যায়ন পাওয়ার কথা ততটুকুও পায়নি সে। সেজন্য তার মেজাজ প্রায় খিটখিটে হয়ে আছে। দাঁতে দাঁত চেপে বসে আছে।

"কিছু বলো, আর কতক্ষণ এভাবে বসে থাকব?" তারিন মাথা নিচু করে সাজেদের কানে কানে বলল।

সাজেদ নড়েচড়ে বসল। টেবিলের উপর আধঘণ্টা আগের রেখে যাওয়া চায়ের কাপ সরিয়ে হাত দুটো টেবিলের উপর রাখল। সে যখন বসে কথা বলে তখন সে এমন করে। সাথে হাত দুটো মুঠ করে রাখে।

"প্রিন্সিপাল সাহেব!" সাজেদ খানিকটা ভারী গলায় ডাক দিল।

প্রিন্সিপাল খাতার উপর থেকে চোখ সরিয়ে তার দিকে তাকালেন।

প্রিন্সিপাল সাহেবের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না সাজেদ। চোখ আবার নামিয়ে টেবিলের দিকে তাকিয়ে রইল। প্রিন্সিপালের নাম মাওলানা শফিকুল ইসলাম। মদিনা ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন লিস্যান্স। বয়স ষাটের উপর। মাথায় টুপি পরে আছেন। দাড়িগুলো সব সাদা। তাঁর চেহারা থেকে কেমন যেন একটি আলো আসে। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে না সাজেদ। সেজন্য আসার পর থেকে মাথা নিচু করে তাকিয়ে আছে সে।

প্রিন্সিপাল সাহেব চোখ তুললেন, তারপর শান্ত গলায় বললেন, "বাচ্চারা ঘুম থেকে উঠুক। সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।"

এই বলে তিনি আবার খাতা দেখতে লাগলেন। তিনি একদম স্বল্পভাষী, বেশি কথা বলেন না, সাজেদের সেরকমই মনে হলো।

"ঘুমের সময় কখন শেষ হবে?" তারিন নিচু গলায় সাজেদকে বলল।

"১২টার দিকে," প্রিন্সিপাল সাহেব খাতা দেখতে দেখতে বললেন।

সাজেদ ঘড়ি বের করে সময় দেখল, ১২টা বাজতে আরও পাঁচ মিনিট বাকি, বারোটার দিকে মাদরাসা বিরতি দেয়। আসার সময় সে প্রিন্সিপালের রুমের সামনে লাগানো বোর্ডে দেখেছিল। রুটিন লাগানো ছিল সেখানে, কালো বোর্ডে চক দিয়ে লেখা রুটিন।

সাজেদ নোয়াখালী-২ আসনের এমপি। কিন্তু অধিকাংশ সময় কাটায় ঢাকায়। বর্তমানে যেই এতিমখানায় এসেছে সেটি হাটহাজারিতে। বিশাল মাদরাসা আর এতিমখানা একসাথে। হাটহাজারীর এক প্রান্তে এতিমখানাটি অবস্থিত। এই এতিমখানার সন্ধান দিয়েছে রফিক। রফিক সাজেদের পিএস। তার বাড়ি নোয়াখালীর নিজামপুরে। সে বাইরে গাড়িতে বসে আছে। রফিক আগেই সব ঠিক করে রেখেছে। প্রিন্সিপালের সাথে কথা বলে রেখেছে। সাজেদ শুধু আসবে, বাচ্চা সিলেক্ট করবে তারপর দেখে নিয়ে যাবে।

প্রিন্সিপাল সাহেব খাতাটা বন্ধ করে সাজেদের দিকে তাকালেন। চোখে চোখ পড়াতে সাজেদ চোখ নামিয়ে ফেলল।

"কয়জন বাচ্চা নিতে চান?" প্রিন্সিপাল সাজেদের দিকে তাকিয়ে বললেন।

"একজন," ওপাশ থেকে তারিন বলল।

প্রিন্সিপাল এবার তারিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ছেলে না মেয়ে?"

"মেয়ে নেব।" এবার সাজেদ কথা বলল।

"মেয়ে তো বেশি নেই। মাত্র নয় জন আছে। তার মধ্যে তিন বছরের নিচে আছে দুজন। আর বাকিরা সবাই তিন বছরের উপরে। আচ্ছা চলুন আমার সাথে। যাকে ভালো লাগে তাকে নেবেন।" এই বলে প্রিন্সিপাল উঠে দাঁড়ালেন।

সাজেদ আর তারিনও উঠে দাঁড়াল। প্রিন্সিপাল রুম থেকে বাঁ পাশের করিডর দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। একটু সামনেই সিঁড়ি। তিনি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলেন। সাজেদ আর তারিন তাঁকে অনুসরণ করল। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বিশাল বারান্দা। বারান্দার বাঁ পাশে অনেকগুলো রুম। ডান পাশ থেকে নিচের মাঠ দেখা যায়। সাজেদ মাঠে তাকিয়ে দেখল অনেক ছেলে মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হলো, আস্তে আস্তে মাদরাসা থেকে সবাই বের হয়ে মাঠে এসে জড়ো হচ্ছে। মাঠের পশ্চিম পাশে একটি পুকুর। পুকুরের পাড়ে সবাই ভিড় করছে। মনে হয় গোসল করার জন্য সবাই পুকুরে যাচ্ছে। কারও কাঁধে পাঞ্জাবি, কারও কাঁধে গামছা বা লুঙ্গি। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে প্রিন্সিপালকে অনুসরণ করতে লাগল সে।

প্রিন্সিপালকে দেখে অনেক ছাত্র ভিতরের রুম থেকে বেরিয়ে এসে সালাম দিল। কেউ কেউ বড়, আর কেউবা একদম বাচ্চা। কারও কারও থুতনির নিচে কয়েকটা দাড়ি উঠেছে। তারা আবার বেশ আয়েশ করে দাড়িতে হাত বুলাচ্ছে। সবাই বের হয়ে এসে মুখে হাসি ফুটিয়ে সালাম দিচ্ছে। নির্ভেজাল হাসি। এরকম হাসি সাজেদ অনেকদিন দেখে না। তাই যে এসে সালাম দিচ্ছে, সাজেদ তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে।

কিছুক্ষণ সোজা হাঁটার পর প্রিন্সিপাল করিডরের বাঁ পাশের চিকন একটি করিডরের মধ্য দিয়ে আবার হাঁটা শুরু করলেন। সাজেদ বুঝতে পারল সেটি ভিতরের দিকে যাচ্ছে। সরু করিডরের দুপাশে দেয়াল। উপরে মিটমিট করে কম পাওয়ারের লাইট জ্বলছে। সে আলোয় প্রিন্সিপাল সাহেব হাঁটছেন। তাঁকে অনুসরণ করছে সাজেদ।

সাজেদকে অনুসরণ করে তারিন সামনের দিকে এগোচ্ছে। তারা করিডর ধরে এগিয়ে সামনে একটি দরজা দেখতে পেল। দরজার পাল্লা দুটো দুপাশে ছড়ানো। দরজার সামনে পর্দা দেয়া। পর্দাটি ঢেকে রেখেছে সমস্ত দরজাটি। প্রিন্সিপাল এসে দরজার সামনে দাঁড়ালেন। তারিন আর সাজেদও পিছন পিছন এসে দাঁড়াল।

"আসসালামু আলাইকুম" প্রিন্সিপাল বড় করে সালাম দিয়ে ভিতর থেকে উত্তরের অপেক্ষায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

"হুজুর আসুন।" ভিতর থেকে আওয়াজ এলো।

আওয়াজটা কোনো এক কিশোরীর বলে মনে হলো সাজেদের। হুজুর পর্দাটা সরিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। বাকি দুজন দ্বিধায় পড়ে গেল ভিতরে যাবে কি না, তাই বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল।

"আপনারাও আসুন।" ভিতর থেকে প্রিন্সিপাল বললেন।

তারিন প্রথমে ঢুকল, তারপর সাজেদ। কামরাটি বেশি বড় না, মাঝারি আকারের। সেখানে কোনো জানালা নেই। মাথার উপর শুধু কয়েকটা বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে। সেই আলোয় আলোকিত হয়ে আছে কামরাটি। কামরার দু পাশে বিছানা পাতা। একটি করে ছোট তোশক আর বালিশ।

প্রত্যেক বালিশের পাশেই একটি করে কুরআন মজিদ রাখা আর প্রত্যেক বিছানায় একটি করে মেয়ে আছে। সবাইকে এক ধরনের কাপড় পরিয়ে রেখেছে, বেগুনি রঙের সালোয়ার, মাথায় ওড়না প্যাঁচানো। বাচ্চাগুলোকে এতই মায়াবী লাগছিল যে সাজেদ চোখ ফেরাতে পারল না। সব বাচ্চারা সাজেদ আর তারিনের দিকে কৌতূহলী হয়ে তাকাল। ছোট ছোট চোখ দিয়ে তারা দুজনকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

তারিন সবগুলো বাচ্চাকে এক এক করে দেখতে লাগল। সবচেয়ে ছোট বাচ্চাটির উপর চোখ পড়ল তার। তার পায়ের কাছে যে বিছানাটি পাতা সেখানেই বসে আছে বাচ্চাটি। বয়স তিনের কম হবে না। ফুটফুটে একটি বাচ্চা। তারিনের খুব ইচ্ছা হলো বাচ্চাটিকে কোলে নিতে, কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিল। সে খেয়াল করল আটটি বাচ্চা সেখানে।

একদম কোণায় একটি বিছানা পাতা। বিছানার উপর একটি বাচ্চা দেয়ালের দিকে মুখ করে। কাত হয়ে শুয়ে আছে। হঠাৎ করেই তীব্র আকর্ষণ বোধ করল সে। আকর্ষণটি তারিনকে টেনে নিয়ে গেল বাচ্চাটির দিকে।

তারিন সন্তর্পণে পা ফেলে হেঁটে গেল বাচ্চাটির দিকে। বাচ্চাটির গায়ে পাতলা একটি কাঁথা। মনে হয় বাচ্চাটি ঘুমিয়ে আছে। তার কেন যেন ইচ্ছে হলো বাচ্চাটিকে ছুঁয়ে দেখতে। সে ঝুঁকে বাচ্চাটির কপালে হাত দিয়ে চমকে গেল। তার মনে হলো সে কোনো গরম পাতিলের উপর হাত রেখেছে।

জ্বরে বাচ্চাটি পুড়ে যাচ্ছে। তারিনের হাতের ছোঁয়া পেয়ে বাচ্চাটি চোখ খুলে তার দিকে তাকাল। সে চমকে উঠে অজান্তেই দুই পা পিছিয়ে গেল। মেয়েটির চোখ ছয় বছর আগে মারা যাওয়া তারিনের মেয়ের মতো, যেমনটা তারিন কল্পনা করতো। কল্পনার মেয়েকে যেন সে স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে, আসল দুনিয়াতে। সে ক্ষণিকের জন্য থমকে গেল।

সাজেদ হঠাৎ তারিনের এরকম আচরণ দেখে পিছন থেকে ছুটে এলো।

"কী হয়েছে?" সে তারিনের কাঁধে হাত রেখে বলল।

তারিন সাজেদের দিকে তাকিয়ে আবার নিজের দৃষ্টি ফেরাল শুয়ে থাকা বাচ্চাটির দিকে। সাজেদ তারিনের দৃষ্টি অনুসরণ করে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তারিনের মতোই চমকে উঠল। মেয়েটিকে তার অনেকদিনের চেনা মনে হলো। তার প্রতি অজানা টান অনুভব করল সাজেদ।

সে থমথমে গলায় বলল "এত সুন্দর চোখ......"

কথা শেষ করতে পারল না সাজেদ।

"আমি একেই দত্তক নিতে চাই," তারিন বলে উঠল।

সাজেদ কিছু বলল না, মেয়েটির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

"এর নাম মাহা। মাহা সালাম দাও তো!" পিছন থেকে প্রিন্সিপাল বললেন।

সাজেদ আর তারিন দুজনেই মাহার দিকে তাকাল। তাকে ঠোঁট নাড়াতে দেখল দুজন। কী সুন্দর গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁট মেয়েটির! ঠোঁট দুটি নড়ল ঠিকই, কিন্তু কোনো আওয়াজ পেল না তারিন আর সাজেদ। সাজেদ ভাবল হয়তো তারা মেয়েটির কাছে অচেনা দেখে সে আস্তে আস্তে কথা বলেছে।

তারিন মেয়েটিকে কোলে তুলে নিল। মেয়েটির শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে তবুও সে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরল। জড়িয়ে ধরতেই এক পশলা প্রশান্তি নেমে এলো তারিনের মাঝে। কেমন শান্ত হয়ে গেল এতদিন যাবৎ জ্বলতে থাকা তার মন। যেন বৃষ্টি এসে তাকে ভিজিয়ে দিলো। খানিকের জন্য আবেগী হলো সে।

"আমরা একেই নেব।" তারিন বলল।

হুজুর তারিনের কথা শুনে চুপ থাকলেন কিছুক্ষণ, তারপর ইতস্তত হয়ে বললেন, "কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে, মাহা কথা বলতে পারে না।"

কথা শুনে সাজেদ চমকে উঠলেও তারিন স্বাভাবিক আছে। তার মধ্যে কোনো ভাবান্তর হলো না যেন। বরং শান্ত স্বওে তারিন বলল, "সমস্যা নেই, আমরা একেই নেব।"

তারিনের কথা শুনে রাগ হলো সাজেদের। বাচ্চা দত্তক নিচ্ছে মুখ থেকে 'বাবা' ডাক শোনার জন্য। আর সে ডাক শুনতে না পেলে দত্তক নিয়েই বা কী লাভ!

সাজেদ আপত্তি করার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিল, ঠিক এমন সময় প্রিন্সিপাল হাসি দিয়ে বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ!"

তারিন মাহাকে নিয়ে গাড়িতে বসে আছে। সাজেদও প্রিন্সিপালের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এসেছে। রফিক কাগজপত্রের ঝামেলা দেখবে, তা নিয়ে ভাবছে

না সাজেদ, ভাবনার বিষয় হলো এখন লোকজনকে কী বলবে। সে রফিককে চেক দিয়ে আসতে পাঠিয়েছে। তিন লাখ টাকার চেকটা নিজেই দিয়ে আসতে পারত। রফিককে বিশ্বাস নেই, টাকাগুলো মেরেও দিতে পারে, তবে আজ এত বছরে এ ধরনের কোনো কাজ করেনি রফিক। সে এসব ভাবতে ভাবতেই রফিক বের হয়ে এলো।

একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে রফিক গাড়ির কাছে এসে মুখ নামিয়ে বলল, "চেক দিয়ে এসেছি।"

"আচ্ছা," সাজেদ বলল।

রফিক প্রশ্ন করল, "এখন কোথায় যাব?"

সাজেদ মুখ ফিরিয়ে জবাব দিল, "ঢাকায় চলো।"

গাড়ি ছেড়ে দিল। তারিনের কোলে মাহা। পিছনের উইন্ডশিল্ড দিয়ে মাহা তাকিয়ে আছে মাদরাসার দিকে। মাদরাসার ছাদের উপর ছায়াটি দাঁড়িয়ে ছিল। মাহা সেদিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। সে ছাড়া আর কেউ খেয়াল করল না ছায়াটিকে। আস্তে আস্তে ছায়াটি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।
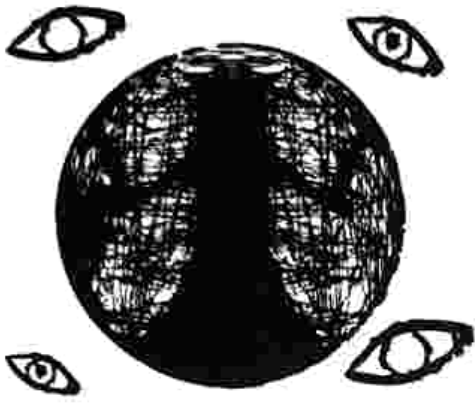
প্রতিদিনের মতো আজও একটা ঝাঁকুনি খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল হাফেজ মিয়ার। ঘুম ভাঙতেই অন্ধকারে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তিনি। আলসেমি দুই চোখে বিদ্যমান, তাই তো চোখ দুটি পলকের সাথে তাল মিলিয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম; কিন্তু আলসেমিকে প্রাধান্য দিলে চলবে না, তাঁকে তাঁর কাজ করতে হবে। তাঁর কাজ অন্য সবার মতো নয়, কোনো সাধারণ কাজও নয়। তাঁর কাজ বিশেষ কাজ, দুনিয়াবি কাজ থেকে ঊর্ধ্বে একটি কাজ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার ঘরের খেদমতগারির কাজ।

আজকে পঁয়ত্রিশ বছর যাবৎ তিনি মুক্তারপুর গ্রামের মসজিদের মুয়াজ্জিন আর খাদেম। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে নিজের গলার সুর দিয়ে এই গ্রামবাসীকে মসজিদের দিকে ডাকছেন। এই কাজ কতটা রহমত আর বরকতের তিনি তা জানেন। তাই নিঃসন্তান হয়েও তাঁর বুকের ভিতর থেকে কোনো দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তাঁকে রহমত দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন তাই হতাশা তাঁকে গ্রাস করতে পারে না।

হাফেজ মিয়া বিছানা থেকে উঠে বসলেন। একটি হাই তুলে বিছানা থেকে নেমে খাটিয়ার নিচে তাকালেন। একটি লণ্ঠন মিটমিট করে জ্বলছে। তিনি লণ্ঠনটি নিয়ে সলতে বাড়িয়ে দিলেন। লণ্ঠনের আলোয় পুরো ঘর আলোকিত হয়ে গেল, সেই আলোয় নিজের পাঞ্জাবিটি দেখলেন। পাঞ্জাবিটি হাতে নিয়ে বের হয়ে এলেন।

পাঞ্জাবি পরতে পরতে বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালাকে ডাকতে লাগলেন। পাঞ্জাবি পরে বাইরে বের হয়ে এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে ঘরের দিকে তাকালেন। ছোট একটি টিনের ঘর, দুটো রুম। তাঁর পরিবারে কেউ নেই। স্ত্রী পাঁচ বছর আগে মারা গিয়েছেন, সন্তানাদি তো হয়নি আর তাই পুরো বাড়িতে তিনি একাই। দরজা খোলা রেখেই চলে গেলেন।

লণ্ঠন নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মসজিদের দিকে চললেন। সরু পথ, দুপাশে ভূতের মতো লম্বা লম্বা তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে। দূরে শিয়াল ডাকছে। ঝিঁঝি পোকার শব্দের সাথে শিয়ালের ডাক মিশিয়ে অদ্ভুত থমথমে একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। অবশ্য এই পরিবেশের সাথে হাফেজ মিয়া পরিচিত। তাই কোনো ভয় তাঁকে কাবু করতে পারে না। তিনি যিকির করতে করতে মসজিদের দিকে চললেন।

দূর আকাশে আলোর লাল আভা ফুটে উঠেছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার অনেকটাই দূর হয়ে গিয়েছে। মসজিদের দরজায় ছোট একটি তালা ঝুলছে। তাঁর কোমরে চাবি বাঁধা। লণ্ঠনটি নিচে রেখে পাঞ্জাবি তুলে কোমর থেকে চাবি বের করে আন্দাজেই তালা খুলে নিলেন। দরজা খুলতেই ভিতর থেকে কেমন যেন একটি গরম বাতাস তাঁকে পার করে যেন চলে গেল। তিনি কিছুক্ষণের জন্য থমকে গেলেন, ভাবতে লাগলেন বিষয়টা নিয়ে।

এরকম তাঁর সাথে প্রথমবার হয়নি, আরও কয়েকবার হয়েছে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আয়াতুল কুরসি পাঠ করে বুকে তিনবার ফুঁক দিয়ে মসজিদে ঢুকলেন হাফেজ মিয়া।

মসজিদ এখনও কাঁচা রয়ে গিয়েছে। চাল টিনের, বাকি সব ছনের। গ্রামের মানুষ ইবাদতে উদাসীন। ফজরের সময় কেউ আসে না। কীভাবে নামাজ পড়তে হয় অধিকাংশ মানুষ তা-ই জানে না। এ নিয়ে তাঁর আক্ষেপের কমতি নেই। কী লাভ এই দুনিয়ার পিছনে ঘুরে, গন্তব্য যেখানে সাড়ে তিন হাত কবর। তিনি গ্রামের মানুষকে অনেক বোঝান কিন্তু লাভ হয় না। আগে শুক্রবারে কিছু মানুষ আসত, এখন তা-ও হয় না। মসজিদ মরুভূমির মতো শূন্য হয় থাকে। কবে এই মানুষগুলো বুঝবে! তাদের জন্য চিন্তার অন্ত নেই তাঁর।

লণ্ঠন নিয়ে হাফেজ মিয়া বের হয়ে এলেন। মসজিদের কাছেই ছোট একটি পুকুর। এই পুকুরেই অজু করতে হয়। পুকুরে ঘাট নেই তবে দুটি কড়ই গাছের গুঁড়ি রাখা আছে। লণ্ঠনটি পুকুর পাড়ে রেখেই তিনি একটা গুঁড়িতে নামলেন অজু করার জন্য। বিসমিল্লাহ বলে পুকুরে হাত দিয়ে পানি তুলে মুখে দিলেন। কুলি করে পানি পুকুরে ফেলতেই টপ করে একটা শব্দ হলো। সেই শব্দের সাথে তাল মিলিয়ে আরেকটা কীসের যেন শব্দ হলো।

মাছ হয়তো। তিনি সেদিকে কর্ণপাত না করে অজু সারলেন। গুঁড়ি থেকে পাড়ে পা রাখতেই জুতো ফসকে গেল। গোড়ালি জুতো থেকে সরে মাটিতে পড়ল সেটা। তিনি মুখ বাঁকিয়ে বললেন, "এই রে!"

তাঁর মেজাজ গরম হয়ে গেল। পাড়ে নেমে লণ্ঠন নিয়ে পিছনে ফিরলেন পা ধোয়ার জন্য। লণ্ঠনের আলোয় পুকুরের অন্য পাড়টাও স্পষ্ট হয়ে গেল। পুকুর

থেকে পা তুলতেই তাঁর চোখ গেল ওই পাড়ে। ওই পাড়টায় কয়েকটা গাছ আর ছোট ছোট ঝোপঝাড়। সেই ঝোপঝাড়গুলো নড়ছে। নড়ছে বললে ভুল হবে, যেন প্রবল বাতাসে কাঁপছে। অথচ, হাফেজ মিয়া বাতাসের কোনো শব্দই পাচ্ছেন না। সেই ঝোপঝাড়ের থেকে চোখ সরিয়ে তিনি একটু উপরের দিকে তাকালেন। ব্যাস, স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

আকাশে দুটি অগ্নিপিণ্ড ছোটাছুটি করছে। পুব আকাশের লাল আভা যেন সেগুলোর অগ্নিতাণ্ডবে ঢেকে গিয়েছে। আগুনের তাপ যেন হাফেজ মিয়া এত দূর থেকেও টের পাচ্ছেন। ভয়ে পাথরের মতো হয়ে গেলেন তিনি।

কষ্ট করে মুখ দিয়ে আওয়াজ করলেন, "লা হাওলা ওয়ালা... ।"

ঠিক এমন সময় দূরের কোনো মসজিদ থেকে আজানের শব্দ ভেসে এলো। আজানের শব্দ তার কানে আসতেই শরীরে একটি ঝাড়া দিয়ে তিনি মসজিদের দিকে দৌড় দিলেন। পিছন ফিরে তাকানো উচিত হবে না ভেবে সেদিকে আর তাকালেন না। মসজিদের ভিতর ঢুকেই চোখ বুজে দরজা বন্ধ করে কাঁপতে লাগলেন। নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তাঁর মনে পড়ে গেল হুজুরের কথা, হুজুর বলেছিলেন আজান দিলে এসব দূরে চলে যায়। এদিকে আজানের সময়ও হয়ে গিয়েছে, তাই তিনি দেরি করলেন না। লণ্ঠনটি মিম্বরের পাশে রেখে আজান দিতে শুরু করলেন।

নিজের সমস্ত শক্তি জড়ো করে ডাক দিলেন, "আল্লাহু আকবার, আল্লা...হু আকবার।"

তাঁর শরীরের কাঁপুনি যেন চলে গেল, নব উদ্যমে তিনি আজান দেয়া শুরু করলেন। আজান দেওয়া শেষ করতে করতে অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে আসলেন তিনি। চারপাশ খানিকটা ফরসা হয়ে এলো। দক্ষিণ দিকের জানালা খুলে দিতেই শোঁ শোঁ করে ভিতরে ঠান্ডা বাতাস ঢুকল।

লণ্ঠনের আলো কমিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার নাম নিয়ে দরজা খুলে পুকুর পাড়ের দিকে তাকালেন। না, কিছুই নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা আজ বাঁচিয়ে দিয়েছেন তাঁকে।

অবশ্য এরকম অনেক ঘটনা তাঁর সাথে ঘটে। এই তো কিছুদিন আগের কথা। তাঁর বাড়িতে ঢোকার রাস্তার পাশে বিশাল এক খেজুর গাছ। ফজরের সময় মসজিদে আসার পথে দেখলেন সাদা জুব্বা পরে গাছের পাশে একজন দাঁড়িয়ে আছে। মাথা দেখা যাচ্ছে না, পাগুলোও দেখা যায়নি, তবে জুব্বাটি মাটিতে লেগে ছিল। তিনি উপর দিকে তাকাতেই দেখলেন জুব্বা খেজুর গাছ ছাড়িয়ে আরও উপরে উঠে গিয়েছে। সেদিন আজান দেওয়ার জন্য আর বের হননি।

এসব চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে তিনি মসজিদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। প্রতিদিন তিনি আশা করেন একজন হলেও আসবে যার সাথে তিনি জামায়াতে ফজর নামাজ পড়তে পারবেন। আজও তিনি আশা ধরে বসে আছে। দেখতে দেখতে অনেক সময় চলে গেল। কেউ মসজিদের পথে এলো না। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে মসজিদে ঢুকলেন। মাদুরে দাঁড়ালেন নামাজ পড়ার জন্য। ঠিক এমন সময় কেউ পিছন থেকে ডাক দিয়ে বলল, "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।"

তিনি প্রায় চমকে উঠে পিছনের দিকে তাকালেন। দরজা দিয়ে একজন সৌম্যদর্শন তরুণ প্রবেশ করল। মাথায় পাগড়ি, গায়ে পাঞ্জাবি, গায়ের রং ধবধবে সাদা, চোখ দুটি নীল। হাফেজ মিয়া এত বছরে এত সুদর্শন কোনো পুরুষ দেখেননি।

ছেলেটি মুসাফাহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আমি ইমরান। আমাকে সরফরাজ আলী ঢাকা থেকে পাঠিয়েছেন। আপনাদের এখানে নাকি ইমাম নেই, আমি ইমামতি করার জন্য এসেছি।"

হাফেজ মিয়া বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। এত সুন্দর, ভালো একজন মানুষ এই মসজিদের ইমামতি করবেন; তা যেন অবিশ্বাস্য লাগছে। তাই তিনি হতবাক হয়ে হুজুরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। হুজুর খানিকটা অস্বস্তি বোধ করলেন তাই গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "চলুন নামাজ পড়ে নিই।"

হাফেজ মিয়া বিমূঢ়তা কাটিয়ে মুসাফাহা করে বললেন, "আসুন। নামাজ পড়ে কথা হবে।"

হাফেজ মিয়া ইকামাত দিতে লাগলেন, হুজুর একটু সামনে দাঁড়ালেন। হুজুরের শরীর থেকে অদ্ভুত এক গন্ধ আসছে। এরকম গন্ধ তিনি আর পাননি। হুজুর আল্লাহু আকবার বলে নামাজ শুরু করলেন। এত মধুর সুরে তিলাওয়াত শুরু করলেন যে, হাফেজ মিয়া তাতে প্রায় হারিয়ে গেলেন।

সালাম ফিরিয়ে মোনাজাত ধরলেন হুজুর। মোনাজাত শেষ করে পিছন দিকে ফিরে বললেন, "এখানে মুসল্লি অনেক কম।"

কথাটা শুনে অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন হাফেজ মিয়া। এই গ্রামের মানুষ এখনও মসজিদে আসে না। একসময় এই মসজিদটি ভরে যেত। তখন এই মসজিদের ইমাম ছিলেন সরফরাজ আলী। তা-ও বারো বছর আগের কাহিনি। তিনি যাওয়ার পর লোকজন আস্তে আস্তে মসজিদ ছেড়ে দেয়। বাচ্চাদেরও মক্তবে পাঠানো বন্ধ করে দেয় যার ফলে হুজুরকেও তারা বেতন দিতে চাইত না।

গত বারো বছর ধরে কোনো হুজুর আসেনি। এই সংকটাপন্ন অবস্থা দেখে প্রায় দুই বছর আগে সরফরাজ আলীর কাছে হাজির হন হাফেজ মিয়া। অবশেষে

বারো বছর পর গ্রামে একজন ইমাম এসেছেন। কিন্তু তাঁর মনে খোঁচা দিচ্ছে এত রাতে ইমাম কীভাবে এলেন।

"হুজুর আপনি এত রাতে কীভাবে এলেন?"

হুজুর মুচকি হেসে বললেন, "আমি মধ্যরাতে লঞ্চে উঠেছিলাম। তারপর গঞ্জে নেমে ওখান থেকে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে এলাম।"

জবাবে আর কিছু বললেন না হাফেজ মিয়া। হুজুর দাঁড়িয়ে বললেন, "চলুন বের হই।"

হুজুর বের হয়ে ছোট একটি ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেন। হাফেজ মিয়া বের হয়ে তালা দিতে যাবেন, এমন সময় হুজুর বললেন, "মসজিদ তালা দিতে হবে না। আল্লাহ তায়ালার ঘর তালা দেওয়া ঠিক হবে না।"

হাফেজ মিয়া তালা দিলেন না, দরজা বন্ধ করে বের হয়ে এলেন। হুজুরের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলুন।"

হুজুরের থাকার কোনো আলাদা জায়গা নেই। হাফেজ মিয়ার বাড়িতে আরেকটা রুম যে খালি আছে ওটাতেই থাকবেন হুজুর। এতদিন ধরে কোনো হুজুর আসেননি, তাই গ্রামবাসীদের কাছে যেতে হয়নি হাফেজ মিয়াকে, কিন্তু এবার যেতে হবে। হুজুরের খাওয়ার আর বেতনের ব্যবস্থা করতে হবে। বাচ্চাদেরকে মক্তবে আনতে হবে। তাই অনেক কাজ করতে হবে হাফেজ মিয়াকে। হ্যাঁ, অনেক কাজ!
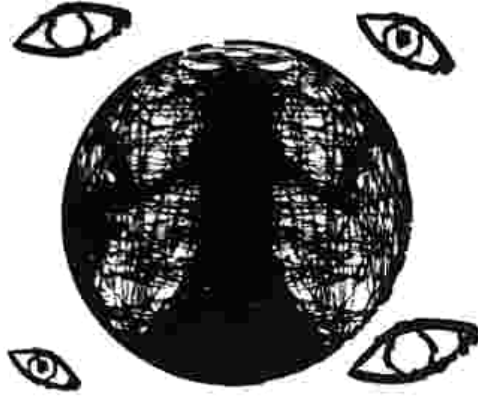
আজ মাহার জন্মদিন। বিরাট পার্টির আয়োজন করেছে সাজেদ, যদিও কেক রাতে কাটা হয়ে গিয়েছে, তবুও সবাইকে জানান দেওয়ার জন্য সাজেদ এত বড় পার্টির আয়োজন করল। অনেকেই হাজির মাহার জন্মদিনে, তারকাদের ছোটখাটো মিলনমেলা এখন সাজেদের এই বাড়ি। বেইলি রোডের বাড়িটিকে সাজানো হয়েছে লাল-নীল বাহারি রঙের বাতি দিয়ে। দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে অনেক বড় অনুষ্ঠান চলছে এই বাড়িতে। ছোট নেতা থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত কেউ আসতে বাকি থাকেনি। এসেছে প্রতিবেশী অনেকেই।

সবাই দাওয়াত পেয়েছে। গাড়িবহরের দীর্ঘসূত্রিতা বাড়ির গেট থেকে শুরু করে চলে গিয়েছে মেইন রোড অবধি। তা দেখেই কারো আন্দাজ করা বাকি রইল না যে সাজেদের বাড়িতে অনুষ্ঠান। একে একে অনেকেই পার্টিতে অ্যাটেন্ড করে চলে গিয়েছে, গুটিকয়েক রয়ে গিয়েছে, তাদের মধ্যে অনেকেই তার মাঠের সঙ্গী আর নিকটাত্মীয়।

মাহাকে নতুন স্কুলে ভর্তি করিয়েছে তারিন। হলি ফ্লাওয়ার স্কুল। দুই বছর হয়ে গেল মেয়েটি এসেছে। আসার পর থেকেই সাজেদ আর তারিনের জীবনে আবার যেন বসন্ত ফিরে এলো। তার ছোট ছোট পায়ের পদচারণায় সবসময় বাড়িটি মুখর থাকে। রান্নাঘর থেকে বেডরুম পর্যন্ত তার দখলে থাকে। সারাদিন এদিক-ওদিক পাখির মতো ছুটে বেড়ায়। তারিন মাহার পিছনে ছুটতে ছুটতে দিনশেষে ক্লান্ত হয়ে গেলেও খারাপ লাগে না তার, মনে হয় অনন্তকাল মেয়েটির পিছনে ছুটতে পারবে। মেয়েটি যখন ছুটে এসে বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এক মুহূর্তে তার সমস্ত ক্লান্তি, অবসাদ, বিষণ্নতা, আর বেদনা দূর হয়ে যায়।

অজান্তেই সাজেদও মেয়েটিকে অনেক ভালোবেসে ফেলেছে। মেয়েটিকে ছাড়া একদিনও দূরে থাকতে পারে না। সারাদিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকে সে।

প্রোগ্রাম, ব্যবসা নিয়ে ছোটাছুটি, কিন্তু এতকিছুর মধ্যেও রাতে মাহার মুখ না দেখে ঘুমাতে পারে না সে। তাই যেখানেই যায় না কেন, রাত হলে বাড়িতে ফিরে আসবেই। দিনশেষে যখন ক্লান্ত হয়ে সে বাসায় ফিরে হলরুমে সোফায় নিজেকে এলিয়ে দেয়, তখন মাহা চুপিচুপি এসে পিছন দিক থেকে সাজেদকে জড়িয়ে ধরে, সে মেয়েকে টেনে নিয়ে চুমু খায়। একদিনও মেয়েটির সাথে দুষ্টুমি না করতে পারলে অস্থির হয়ে যায় সে।

"মাহাকে নিয়ে আসব?" তারিন পাশ থেকে বলল।

তারিনের কথা শুনে চিন্তায় বাধা পড়ল সাজেদের। সে মুখ তুলে তারিনের দিকে তাকাল। একটি হাসি দিল। জবাবে তারিনও মুচকি হাসল।

সাজেদ আর তারিন হলরুমের একদম কোণায় বসে সবকিছু তদারকি করছে। অবশ্য সমস্ত ঝড় তারিনের উপর দিয়ে গিয়েছে। মেহমানদের আপ্যায়ন থেকে শুরু করে রান্নাঘর সামলানো, সব সে করেছে। দিনশেষে সে অনেক ক্লান্ত। সারাদিন এত ছোটাছুটি করেছে, কয়েক মিনিটের জন্যও বিছানায় পিঠ ঠেকিয়ে বিশ্রাম নেয়নি, এখন সাজেদের পাশে বসে নিজেকে বিশ্রাম দিচ্ছে। যদিও সাজেদ ডেকে এনে বসিয়েছে, তা না হলে এখনও হয়তো কোথাও দৌড়াদৌড়ি করত সে।

তারিনের কথা শুনে সাজেদ হাসি দিয়ে বলল, "এত ঝামেলার মধ্যে ঘুম পাড়িয়েছ কী করে?"

সাজেদের প্রশ্ন শুনে মুচকি হাসল তারিন। সাজেদ এই মুচকি হাসির মানে জানে। তার অর্থ এই যে, "আমি সব পারি।"

"কী করে আর! এক ঘণ্টা বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছে আর এক গাদা গল্প।" তারিন খানিকটা রূঢ় গলায় বলল।

সাজেদ অবশ্য এই রূঢ়তার মধ্যেও তারিনের ভালোবাসা বুঝতে পেরেছে। তাই তারিনকে খোঁচা মেরে বলল, "মেয়েকে নিয়ে তাহলে ভালোই কাটাচ্ছ।"

তারিন মুখ বাঁকা করে বলল, "তা বাবা তোমাকে কে বারণ করেছে, তুমি কাটাচ্ছ না কেন? তোমাকে মানা করছে কে?"

সাজেদ মুখে বাঁকা হাসি ফুটিয়ে জবাব দিল, "যদি তোমার কম পড়ে যায়।"

এ কথা বলে জোরে হেসে উঠল সাজেদ। তারিনও হেসে ফেলল। কতদিন পর তাদের দুজনের মুখে এরকম হাসি এলো। দুজনেই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল একে অপরের উপর।

হাসি থামিয়ে অবশেষে তারিন বলল, "আচ্ছা, আমি মাহাকে নিয়ে আসছি।"

সাজেদ চারদিকে চোখ বুলাল। পরিচিত মানুষ খুঁজছে সে। না, কাওকে পেল না। তবুও তারপর দিকে ফিরে বলল, "তুমি বসো এখানে। অন্য কাউকে আনতে বলো।"

"আমিই নিয়ে আসছি," তারিন এই বলে উঠে গেল।

শাড়ি ঠিকঠাক করে সবার দিকে একবার নজর বুলাল সে। সবাই হাসিখুশি, গল্পে মত্ত। সাজেদ অবশ্য তারিনকে পাশ থেকে দেখছিল। তারিনের সেদিকে খেয়াল নেই। সে আদর্শ গৃহিণীর মতো সমস্ত দিকেই নজর দিল। সব ঠিকঠাক আছে কি না, কার কী প্রয়োজন এসব নিয়েই তারিন ভাবছে। নিজের মেয়ের প্রথম আনুষ্ঠানিক জন্মদিন বলে কথা, ত্রুটি কি রাখা যাবে?

একদম না!

তাই সমস্ত কিছু নিজে প্ল্যান করেছে তারিন, যদিও সাজেদের কাছে জিজ্ঞেস করে নিয়েছে সবকিছু করার আগে। সাজেদ সারাদিন বাসায় ছিল না, এই তো সন্ধ্যায় ফিরেছে। ফ্রেশ হয়ে এখন মেহমানদের আপ্যায়ন করছে। সাজেদ তার সমস্ত কাজ রফিকের উপর দিয়ে যায়। তারিন যা বলে তা-ই করে রফিক, কিছু কাজ আবার আগ বাড়িয়েও করে দেয়, অবশ্য তা নিয়ে কোনো বিরক্তিবোধ নেই তারিনের মাঝে।

সাজেদের এই বাড়িটি ডুপ্লেক্স। নিচতলায় বিশাল হলরুম, রান্নাঘর, ডাইনিং আর কর্মচারীদের থাকার রুম, উপরতলায় বিশাল সাইজের চারটি মাস্টার বেডরুম সহ ছয়টি রুম। একতলা থেকে সোজা সিঁড়ি দোতলায় উঠে গিয়েছে, তারপর বারান্দা। সিঁড়ির বাঁ পাশে তিনটি রুম, ডান পাশে তিনটি। সিঁড়ির ডান পাশের রুমে থাকে সাজেদ আর তারিন, তার পরের রুমেই মাহা। প্রথম দুই বছর যদিও মাহাকে নিজেদের সাথে রেখেছে তারিন আর সাজেদ। আস্তে আস্তে বড় হওয়ার সাথে সাথে মেয়েটি নিজেই বুঝে ফেলেছে যে তার আলাদা থাকা দরকার, তারপর থেকে সে আলাদা থাকতে শুরু করেছে।

মাহা অনেক বুদ্ধিমতী মেয়ে। সাজেদ তা-ই মনে করে। কথা বলতে না পারলেও ইশারা দিয়ে সমস্ত কিছু সে বুঝিয়ে দিতে পারে। সাজেদ মাহাকে নিয়ে অনেক জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করেছে, দেশ-বিদেশ কোথাও বাকি রাখেনি, শুধু মাহার মুখে একবার 'বাবা' ডাক শুনতে নিজের সমস্ত কিছু ঢেলে দিতে রাজি সে। সেজন্য কম ডাক্তার দেখানো হয়নি, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। কোনো ডাক্তার মাহার গলার আওয়াজ ফিরিয়ে আনতে পারেনি। সেজন্য হুটহাট মন খারাপ হয় সাজেদের, অন্যমনস্ক হয়ে যায় সে।

সাজেদ এখন তারিনকে দেখছে। তারিন সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠছে। তারিন খয়েরি রঙের শাড়ি পরেছে, তার মাথায় সবসময় ঘোমটা থাকে, সেই ঘোমটার ফলে তাকে সবার থেকে আলাদা লাগে। পার্টিতে আসা কোনো মহিলা তারিনের মতো ধার্মিক না, সাজেদ তা ভালো করেই জানে, তাই তারিনের ব্যাপারে কোনো রকম সন্দেহ হয় না তার।

রাজনীতিবিদদের মেয়ে আর স্ত্রী হওয়ায় যতটুকু অহংকার থাকার কথা, তারিনের তা নেই, একদম সাদাসিধে। তবে তারিনকে একদম নির্জীব লাগে মাঝেমধ্যে, বাচ্চাটা নষ্ট হওয়ার পর তার প্রতি সাজেদের একটু অবহেলা তৈরি হয়, কিন্তু আজ তাকে অনেক সুন্দর লাগছে। কেন লাগছে তা-ই বুঝতে পারছে না সাজেদ, তার ইচ্ছে করছে তারিনকে কাছে বসিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে।

সেজন্য তারিনকে ডেকেছিল, কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, সে উঠে চলে গেল। সাজেদের ইচ্ছে হয়েছিল তারিনের হাত ধরে টান দিয়ে পাশে বসাতে, কিন্তু পারল না। তাদের মধ্যে দূরত্বের যে ঠান্ডা দেয়াল তৈরি হয়েছে তা এখনও ভাঙেনি, অবশ্য মাহা আসার পর থেকে আস্তে আস্তে তা গলতে শুরু করেছে, সাজেদ বিশ্বাস করে তাদের মধ্যে সবকিছু আবার ঠিক হয়ে যাবে।

তারিন সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, উঠতে উঠতে তার মনে পড়ে গেল গতকাল বিকেলের কথা। সে অজান্তেই হেসে ফেলল। নিজের মেয়েকে নিয়ে কেউ এমন স্বপ্ন দেখে! নিজের পাগলামির জন্য নিজের প্রতি উপহাস করতে লাগল সে।

তারিন রোজ দুপুরে রান্না করে মাহাকে খাইয়ে ঘুম পাড়ায়, তারপর গোসল করে, নামাজ পড়ে। সাজেদ দুপুরে বাসায় থাকে না, তাই সে একাই লাঞ্চ করে, মাঝেমধ্যে লাঞ্চ না করে শুধু চা খেয়ে থাকে। তারপর বিকেলের দিকে মাহাকে ঘুম থেকে তুলে নাশতা করিয়ে পড়তে পাঠায়, মাহা তখন টিউটরের কাছে ছিল।

মাহার জন্য নতুন টিচার ঠিক করা হয়েছে তিন মাস আগে। তার নাম আসলান। অত্যন্ত ভদ্র ছেলে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যানে পড়ে। মাহাকে অনেক যত্ন করে পড়ায়, নিজের আপনজনের মতো দেখে, সেজন্য মাহাও ছেলেটিকে ভীষণ পছন্দ করে। ছেলেটি ভীষণ মেধাবী, আবার কিছুটা পাগলাটেও বটে। তারিন মনে করে অতিরিক্ত মেধাবীরা পাগল হয়, তবে মেধাবী আর বুদ্ধিমান এক নয়, বুদ্ধিমানরা হয় ধূর্ত শ্রেণির। নিজের মেধা না থাকলেও আরেকজনের মেধা কাজে লাগিয়ে স্বার্থ আদায় করে, যেমনটা করে তার বাবা আর সাজেদ।

আসলান নিতান্তই সাদাসিধে, চুপ করে এসে পড়িয়ে যায়, একটা অতিরিক্ত কথাও বলে না, এমনকি চোখ উপরে তুলেও তাকায় না। মাঝেমধ্যে তাকে দেখে ভীষণ হাসি পায় তারিনের। একদিন বিকেলে সে পড়াতে এসেছিল দুই রকম দুটি জুতো পরে। সেদিন তারিন খুব হেসেছিল। মনে হয় তার কোনো প্রেমিকা নেই, প্রেমিকা থাকলে ছেলেটি এত অযত্নে থাকত না। প্রত্যেক প্রেমিকাই তার প্রেমিককে খুব যত্ন করে। ছেলেটি সম্পর্কে সে তেমন কিছুই জানে না। তারিন

ভেবে রেখেছে একদিন বিকেলে সময় করে তাকে নিয়ে বসবে। তার সম্পর্কে জানা দরকার।

আসলান যখন মাহাকে পড়ায়, তখন তারিনের কাছে কোনো কাজ থাকে না। বিকেলে আসরের নামাজ পড়ে রকিং চেয়ারে বসে বই পড়ে। সাধারণত অবসর সময়টুকু বই পড়ে কাটায় সে।

কাল বিকেলে একটি হরর গল্পের সংকলন পড়তে পড়তে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে বুঝতেই পারেনি। হঠাৎ তারিন অনুভব করল কে যেন তার কোলে বসে আছে। তার দুই পা মুহূর্তেই অনেক ভারী হয়ে গেল, ভীষণ ভারী, মনে হলো ছিঁড়ে পড়ে যাবে উরু থেকে। ঘুমের মধ্যেই কঁকিয়ে উঠল সে। স্বপ্নের মধ্যেই অনুভব করল বিশাল এক পাথর তার কোলের উপর। তা এতই ভারী যে আস্তে আস্তে তার পা অসাড় হয়ে যাচ্ছে। সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল, কিন্তু ক্রমেই মনে হচ্ছিল তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তার আত্মা শরীর ছেড়ে বের হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ করে পা দুটো হালকা হয়ে গেল।

তারিনের মনে হলো পায়ের উপর থেকে বিশাল পাথরটি সরে গিয়েছে। সে ঘুমের মধ্যেই স্বস্তি অনুভব করল, কিন্তু তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না আর; হঠাৎ করেই সে বুঝতে পারল দুটি কোমল হাত তার গলা স্পর্শ করছে। হাতে ছোট ছোট আঙুল, লোমশ, নরম বিড়ালের পায়ের আঙুলের মতো। কোনো মানুষের আঙুল নয়। পাঁচটি আঙুল নয়, অনেকগুলো। মনে হচ্ছিল পুরো হাত জুড়েই আঙুল। লকলকে নরম লোমশ আঙুল।

আঙুলগুলো ছড়িয়ে পড়ল তারিনের গলার চারপাশে। লোমশ কোমল আঙুলগুলো শক্ত হয়ে গেল, পাথরের মতো শক্ত হয়ে চেপে ধরল গলা। দম বন্ধ হয়ে আসছিল তারিনের। সে চোখ খুলে তাকাতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না, মনে হলো কোনো এক অজানা শক্তি তার চোখগুলো চেপে ধরে আছে। নিজের চোখ দুটিও তারিনের আয়ত্তে ছিল না।

তারিন মনে মনে আয়াতুল কুরসি পড়তে শুরু করল। একনাগাড়ে কিছুক্ষণ পড়ার পর হঠাৎ করে হাত দুটো তার গলা ছেড়ে দিল। সে আর দেরি করল না। চোখ খোলার চেষ্টা করল। তখন হঠাৎ করে ঘুম থেকে জেগে গেল সে। আবছা দৃষ্টি, আর মাথায় একটা চিকন ব্যথা নিয়ে চোখ খুলল।

প্রথমে একটা অবয়ব দেখল। হালকা পলক ফেলতেই ঝাপসা দৃষ্টি সরে গিয়ে সবকিছু পরিষ্কার হলো। তারিন দেখল মাহা তার কোলে বসে আছে। তারিন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। বিমূঢ়তা কাটতেই চোখের পাতা নিচে নেমে এলো আলতো করে। চোখের পলক ফেলার সাথে সাথে মুহূর্তের মধ্যেই মাহা উধাও হয়ে গেল।

তারিন ঘেমে গিয়েছিল। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছল কাঁপা কাঁপা হাতে। সে বুঝতে পারল তা স্বপ্ন ছাড়া কিছুই ছিল না। স্বপ্ন ছিল, ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন, তবে সে স্পষ্ট দেখেছে মাহা তার কোলে বসে ছিল, তাকিয়ে ছিল তার দিকে। দুঃস্বপ্নের ঘোর এখনও কাটেনি তারিনের, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এগুলোই ভাবছিল তারিন। সে উঠছে ধপধপ আওয়াজ করে। একতলায় লোক সমাগম থাকলেও দোতলা একদম খালি সে ব্যাপারে তারিন নিশ্চিত, তাই আওয়াজ করে উঠছে যাতে কেউ থাকলেও বুঝতে পারে যে সে আসছে। দোতলার একপাশে আলো জ্বালানো থাকলেও আরেকপাশ একদম অন্ধকার। মাহা আলোতে ঘুমাতে পারে না, তাই সে ঘুমানোর সময় তার রুমের আশপাশের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়।

নিচতলায় অনেক শোরগোল কিন্তু দোতলায় কেমন যেন নির্জনতা বিরাজ করছে। থমথমে ভাব, মনে হচ্ছে প্রকৃতি কোনো এক শোকে মাতম করছে। এই নির্জনতা দূর করতেই এমন আওয়াজ করে উঠছে তারিন। সে বুঝতে পারছে না তার শরীর খারাপ করছে কি না। সিঁড়ির মাঝখানে এসেই সে হাঁপিয়ে উঠল, মনে হলো আর পারবে না উঠতে, এই মাঝ সিঁড়িতে মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যাবে। তবুও সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করল। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে নিজের কপালে হাত রাখল সে। তাপমাত্রা তো স্বাভাবিক, তাহলে জ্বর আসলে যেমন লাগে তেমন লাগছে কেন তা বুঝতে পারল না।

তারিন দোতলায় এসে পড়ল। নিজের বেডরুম পার হয়ে দাঁড়াল মাহার রুমের সামনে। মাহার রুমের দরজা সবসময় আলতো করে খোলা থাকে, একদম বন্ধ থাকে না। মাহা এখনও দরজা লাগাতে পারে না, দরজার ছিটকিনি একদম উপরে, তাই দরজা খানিক ফাঁকা থাকে। যদিও মাহা আবদ্ধ রুমে থাকতে পারে না, কিন্তু আজ দরজাটা একদম আটকানো, কোনো ফাঁক নেই। তারিন খানিক অবাক হলো। সে ভাবল অন্ধকারে মেয়েকে না এনে আগে আলো জ্বালানো যাক।

আলো জ্বালানোর আগে তারিন করিডর থেকে নিচে তাকাল। সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত। সাজেদের উপর চোখ পড়ল, বিরাট একটি কেক আনা হয়েছে, সে কেকের সামনে বসে আছে। অর্থসচিব তার দিকে এগিয়ে আসছে। সে সাজেদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে চলে গেল সুইচবোর্ডের কাছে।

দেয়ালেই সুইচবোর্ড, করিডরের সব লাইটের সুইচ এই সাদা রঙের সুইচবোর্ডে। সে সুইচবোর্ডের তিন নম্বর সুইচ চাপ দিতেই করিডরের লাইট জ্বলে উঠল। মুহূর্তেই দূর হয়ে গেল অন্ধকার। হলরুম থেকে সবাই দোতলার দিকে তাকাল। তারিন সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে আবার এগোতে লাগল মাহার রুমের দিকে ।

সে মাহার দরজার সামনে গিয়ে আলতো করে ধাক্কা দিল, কিন্তু দরজা খুলল না। সে ভাবল, খুব আলতো করে ধাক্কা দেয়ার কারণে খুলছে না, তাই এবার একটু জোরেই ধাক্কা দিল। তাতে একটু আওয়াজ হলেও দরজা খুলল না। দরজাটা পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রুমের প্রবেশমুখে।

তারিন এবার আরও জোরে ধাক্কা দিল। এই ধাক্কায় বাড়ির যেকোনো দরজা খুলে যাবে, কিন্তু মাহার রুমের দরজা খুলল না। সে এবার বুঝতে পারল দরজা ভিতর থেকে লাগানো। সে ভীষণ ভয় পেল, কারণ মাহার পক্ষে দরজার ছিটকিনির নাগাল পাওয়ার কথা না। দরজার ছিটকিনি একদম উপরের দিকে। একজন বড় মানুষ ছাড়া এই ছিটকিনি আটকানো প্রায় অসম্ভব। তারিনের কপাল বেয়ে ঘাম পড়তে শুরু করল।

সে এবার দরজায় কয়েকটা ঘুষি দিয়ে বলল, "মাহা! মাহা! তুমি ভিতরে আছ মামণি?"

কোনো উত্তর আসল না। তারিন আবারও দরজায় ধাক্কা দিয়ে মাহাকে ডাক দিল। না, লাভ হলো না, এবারও ভেতর থেকে কোনো উত্তর আসল না। তারিন দেরি না করে করিডোরে এসে সাজেদকে খুঁজতে লাগল। সমস্ত হলরুমে খুঁজল, কোথাও পেল না, সে হয়তো কোথাও চলে গেছে। সে দিশেহারা হয়ে ঘামতে শুরু করল। ব্যাপারটা যদিও স্বাভাবিক, কিন্তু মেয়ের ব্যাপারে পান থেকে চুন খসলেই তারিন চিন্তিত হয়ে পড়ে। আবার দরজার কাছে গিয়ে ঘুষি দিয়ে মাহাকে ডাকল। না, এবারও কোনো উত্তর নেই।

তারিন আবার করিডোরে এসে সাজেদকে খুঁজতে লাগল, এবারও তাকে পেল না, তার মেজাজ গরম হয়ে গেল। কাজের সময় সাজেদকে পাওয়া যায় না কেন! তবে রফিককে দেখল, কিন্তু সে অন্যমনস্ক হয়ে আছে তবুও সে উপর থেকেই ডাক দিল রফিককে। তারিনের গলার আওয়াজ শুনে সবাই উপরের দিকে তাকাল। ডাক শুনে রফিক দেরি না করে দৌড়ে দোতলায় হাজির হলো।

কাছে এসেই হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "কী হয়েছে?"

তারিন তাকে দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, "দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করা। তাড়াতাড়ি খোলার ব্যবস্থা করো।"

রফিক কিছু বুঝতে না পেরে মুখ হাঁ করে তাকিয়ে রইল তারিনের দিকে।

"দেখছ কী? দরজা খোলার চেষ্টা করো," তারিন মুখ শক্ত করে বলল।

রফিক তা-ও অবাক হয়ে তাকিয়েই রইল। তারিনের মেজাজ গরম হয়ে গেছে। রফিক কিছু না কওে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে কেন?

"রফিক! দরজা খোলো!" তারিন ধমক দিয়ে বলল।

"দরজা তো খোলা!" রফিক আস্তে করে বলল।

তারিন অবাক হলো। কী বলে এসব রফিক! তারিন নিজের চোখ ফেরাল দরজার দিকে, তাকাতেই দেখল দরজা খানিকটা ফাঁক করা। সে হতভম্ব হয়ে গেল, নির্বাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল দরজার দিকে। সময়টা যেন তারিনের জন্য থমকে গিয়েছে। সময়ের মায়াজাল কাটিয়ে সে ভিতরের দিকে তাকাল।

করিডোরের লাইট দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে ভিতরটা আলোকিত করে ফেলেছে। তারিন অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল। রফিক তাকে পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকে লাইট জ্বালাল, তারপর কয়েক সেকেন্ড পর বের করে আনল মাহাকে। তারিন পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকল, নিজেকে বিশ্বাস করার শক্তিটা যেন সে আর পাচ্ছে না। কিন্তু নিজের মেয়েকে দেখে তার আত্মায় পানি আসলো, সে তার মেয়ের দিকে ছুটে যেতে চাইলো, কিন্তু পারল না। তারিনকে দেখেই মাহা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল। তার স্পর্শে চেতনা ফিরে পেল তারিন। রফিক কিছু না বলে নিচে নেমে গেল। নিজেকে সামলে নিল তারিন। মাহার মাথায় হাত রেখে লম্বা একটা দম নিল সে।

তারিন ঝুঁকে মাহাকে বলল, "মামণি তুমি ঠিক আছ? "

মাহা হ্যাঁ বোধক মাথা নাড়াল। মাহার কপালের সামনে কিছু চুল পড়ে আছে। তারিন চুলগুলো সরিয়ে মাহার কপালে চুমু খেল। তারিনের গলা জড়িয়ে ধরল মাহা। মাহার উষ্ণতায় অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠে তারিন। সে মাহাকে কোলে নিয়ে নিচে নামতে লাগল। তার শরীর প্রচণ্ড রকমের কাঁপছে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। বারবার একটা ভয় আচমকা তাকে ধাক্কা দিচ্ছে, চেপে ধরছে তার কলিজা। মোচর দিয়ে উঠছে তার পেট বারবার। কিন্তু সে কাউকে বুঝতে দিল না যে, তার ভিতরে কত বড় ঝড় বয়ে চলছে।
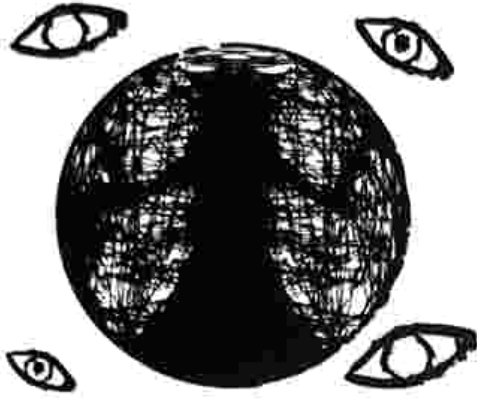
অনেকদিন পর শ্বশুরকে নিজের বাড়িতে আনতে পেরেছে সাজেদ। তার শ্বশুর খন্দকার শহিদ এবার প্রতিমন্ত্রী হয়েছে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলা যায় আগামীবার পূর্ণ মন্ত্রী হবে। মাহাকে নিয়ে একদম অখুশি ছিল শহিদ। খুশি হওয়ার কারণই বা কী? একে তো নিজের মেয়ের অনিচ্ছায় বিয়ে দিয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে মেয়েটি তার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। তার উপর আবার মেয়ের সন্তান হয় না, যা-ও একটি সন্তান হতে যাচ্ছিল, কিন্তু সে-ও পৃথিবীর আলো দেখল না।

যখন তার মেয়ে বাচ্চা দত্তক নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তখন কিছু বলেনি শহিদ। অনেকদিন সংসারে কেউ আসেনি। দীর্ঘদিন সন্তানহীন ছিল। সিদ্ধান্ত যেহেতু নিয়েছেই, দত্তক নিয়ে নিক, যে সন্তান পরবর্তীতে তার আর মেয়ের জামাইয়ের লিগ্যাসি ধরে রাখবে।

তেমন কিছুই হয়নি, বরং দত্তক নিয়েছে একটি বোবা মেয়েকে! এ কোন ধরনের কথা? তারিন না হয় ছেলেমানুষি করে কিন্তু সাজেদ তো মানা করতে পারত। বুঝেশুনে ভালো একটি ছেলে আনতে পারত। সে কী করে এই ভুল করল? তারপর থেকে মেয়ে আর মেয়ের জামাইয়ের সাথে রাগ করে কথা বলা কমিয়ে দিয়েছে। শহিদ আজও আসত না, একমাত্র তারিনের জন্য এসেছে, একজনই সন্তান তার। মেয়ের সাথে গত দুই বছর ধরে রাগ করে কথা বলেনি, কিন্তু আজ আর কথা না বলে থাকতে পারেনি।

শহিদ ঘুম থেকে উঠতে উঠতে দুপুর হয়ে যায়। কোনো প্রোগ্রাম না থাকলে দুইটার আগে ঘুম থেকে ওঠে না। আজও ব্যতিক্রম হলো না। ঘুম থেকে উঠতে উঠতে প্রায় দুইটা বেজে গেল। ঘুম থেকে উঠেই কড়া করে চা না খেলে মাথা ধরে। এক কাপ ভালো রং চা দিয়েই দিন শুরু হয় তার। যথারীতি ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় গিয়ে চাকরকে ডাক দিল চায়ের জন্য। পত্রিকা উল্টাচ্ছে এমন সময় দেখল তারিন চা নিয়ে আসছে।

তারিন পাশের টেবিলে চায়ের কাপটা রেখে শহিদের কাছে এসে দাঁড়াল। কিছু না বলে চায়ের কাপটা তুলে চুমুক দিল শহিদ । তারিন তাকিয়ে থাকল তার দিকে। সেও মাঝেমধ্যে মেয়ের দিকে আড়চোখে তাকাতে লাগল। তবে খেয়াল রাখলো তারিনের চোখে চোখ যাতে না পড়ে। তারিন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। শহিদ আর নিতে পারল না।

অবশেষে নীরবতা ভেঙে বলল, "কী চাও? এমন করে তাকাচ্ছ কেন?"

তারিন হেসে জবাব দিল, "আমি আমার বাবার দিকে তাকিয়ে আছি আর ভাবছি বাবা আসলেই দাদুর থেকে বেশি স্মার্ট না। দাদু ঠিকই বলে।"

মেয়ের কথা শুনে হাসি আর আটকাতে পারল না শহিদ। দুই বছর ধরে যে বরফের পাহাড় ছিল মুহূর্তেই তা গলে গেল। সন্ধ্যা হতেই সমস্ত কাজ সেরে হাজির হলো মেয়ের বাড়িতে। এসেই দেখে হুলুস্থুল কারবার। মন্ত্রী, আমলা, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক কেউ বাকি নেই, সবাই এসেছে। জামাইয়ের এত বড় হাত ভাবতেই পারেনি শহিদ। সবার সাথে কুশল বিনিময় করতে করতে হাঁপিয়ে উঠল সে। সবাই চলে যাওয়ার পর সে হলরুমের সোফায় বসে রেস্ট নিচ্ছিল।

চোখ বুজেছে, এমন সময় 'বাবা' ডাক শুনে সামনে তাকিয়ে দেখল তারিন দাঁড়িয়ে আছে। সাথে ফুটফুটে একটি মেয়ে। শহিদ চিনতে ভুল করল না। তার নাতনি। সেই দুই বছর আগে দেখেছিল। এখন অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। তার গায়ে গাঢ় লাল রঙের ফ্রক, মাথায় ক্লিপ লাগানো, একদম লাল পরির মতো লাগছে। তার দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে। মেয়েটি এগিয়ে আসল তার দিকে। সে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকল।

তারিনের জন্মের পর শহিদ মেয়ের দিকে এইভাবে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকত। তারিনের মেয়েটি যেন তারিনেরই প্রতিরূপ। অজান্তেই এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তার গাল বেয়ে। কেউ দেখার আগেই সে রুমাল দিয়ে চোখ মুছে ফেলল। শহিদের দিকে তাকিয়ে হাসছিল মাহা। কেউ এত সুন্দর করে কীভাবে হাসে তা শহিদের মাথায় ঢুকছিল না। সে আদর করার লোভ সামলাতে পারল না। হাসি দিয়ে মাহাকে কাছে টেনে আনল, গালে চুমু খেল, সোফায় নিজের পাশে বসিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সে।

বিকেলেই একটি লকেট নিয়ে এসেছে শহিদ। সোনালি ফ্রেমের উপর ছোট একটি ডায়মন্ড বসানো। লকেটটি একটি সোনালি চেনের সাথে আটকানো। আলো পড়লেই চকচক করে লকেটটি। এটি নিজে পছন্দ করে নিয়েছে শহিদ।

প্রায় দুই দশক পর সে মার্কেটে ঢুকেছিল আজ। মার্কেটে ঢুকে মনে হলো অচেনা এক জগতে এসেছে, যদিও আগে থেকে তার পিএস সবকিছু রেডি করে

রেখেছে। শহিদ শুধু গিয়ে দেখে পছন্দ করবে, তারপর নিয়ে আসবে। কিন্তু এই একটি লকেট পছন্দ করতে শহিদ সাতাশটি দোকান দেখেছে। সে হাঁপিয়ে উঠেছিল, কিন্তু নাতনির জন্য পছন্দের কিছুই পাচ্ছিল না, অবশেষে এই লকেটটি একটি ছোটখাটো পুরানো দোকানে দেখামাত্রই পছন্দ হয়ে যায় শহিদের।

দেরি না করে সাথে সাথে লকেটটি কিনে নিয়েছে। যদিও দোকানদারের অদ্ভুত আচরণের কারণ সে বুঝতে পারেনি। দোকানদার এই লকেটটির বদলে অন্য লকেট কিনতে শহিদকে জোর করছিল। অনেক ভালো আর দামি লকেট দেখিয়েছিল, কিন্তু শহিদের চোখ বারবার এই লকেটটির উপর আটকে যাচ্ছিল। বের হয়ে তাকে টানছে। যেন লকেটটি থেকে চুম্বকীয় শক্তি তাই অবশেষে এই লকেটটি নিয়েই সে মেয়ের বাড়িতে এসেছে।

লকেটটি প্যান্টের বাম পকেটে ছিল। পকেটে হাত দিয়ে সেটি এনে মাহাকে পরিয়ে দিতে যাবে এমন সময় তারিন বলল, "বাবা এটা কী?"

তারিন যে এতক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, তা খেয়াল ছিল না শহিদের। আনমনে সে মাহাকেই দেখে যাচ্ছিল। সে তারিনের কথাকে উপেক্ষা করে লকেটটি মাহাকে পরিয়ে দিল, পরানো মাত্রই ডায়মন্ড ঝিলিক দিয়ে উঠল। মাহার দিকে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে। মেয়েটি আসলেই মায়াবতী, একবার তাকালে চোখ ফেরানো যায় না, মেয়েটির দিকে কেউ তাকালে এভাবেই বুঝি অচেনা এক মায়ায় পড়ে যায়। শহিদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হলো না, চোখ সরাতেই পারল না, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে।

"বাবা!" তারিনের ডাক শুনে মাহার উপর থেকে চোখ সরাল শহিদ।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসি ঝুলিয়ে বলল, "মাহার জন্য লকেট নিয়ে এলাম।"

তারিন কিছু না বলে মুচকি হাসল।

"সাজেদ কোথায়? ওকে দেখছি না যে?" শহিদ তারিনকে বলল।

সাজেদের কথা বলতেই তারিন চারপাশে তাকাল, কিন্তু সাজেদের দেখা পেল না।

শহিদের দিকে তাকিয়ে তারিন বলল, "তুমি মাহাকে নিয়ে বসো। আমি দেখি ও কোথায় আছে।"

তারিন সেখান থেকে উঠে চলে আসলো। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল, এবার আর তেমন অস্বস্তি বোধ করল না। দোতলায় উঠেই সোজা চলে গেল বেডরুমের সামনে। বেডরুমের দরজা খানিকটা খোলা। কোনো রকম শব্দ না করে তারিন ভিতরে ঢুকল।

ভিতরে ঢুকেই দেখল লম্বা হয়ে শুয়ে আছে সাজেদ। তারিন কিছু বুঝতে না পেরে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সাজেদ চোখ বুজে আছে। তারিনের উপস্থিতি

এখনও টের পায়নি। সে গিয়ে তার কপালে হাত রাখতেই সাজেদ চোখ খুলল। তারিনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে আবার চোখ বন্ধ করে ফেলল সে।

সাজেদের শরীরের তাপমাত্রা ঠিক আছে, কিন্তু হঠাৎ সে এরকম সবকিছু রেখে এখানে এসে শুয়ে আছে কেন তা তারিন বুঝতে পারছিল না। তারিন তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, "কী হয়েছে?"

"হুঁ!" সাজেদ ছোট করে জবাব দিল।

"শরীর খারাপ করেছে?" তারিন আবার প্রশ্ন করল।

এবার সাজেদ আবার চোখ খুলল, তারিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "সবাই কি চলে গিয়েছে?"

তারিন ছোট করে জবাব দিল, "হ্যাঁ।"

"বাবা খেয়েছেন?"

"না, তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।"

সাজেদ উঠে বসল। তারিনের দিকে তাকিয়ে মুখে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করল, কিন্তু আসল না, আসার কথাও না, প্রচণ্ড মাথাব্যথা করছে তার।

মাহাকে ঘুম থেকে তুলতে তারিন চলে যাওয়ার পর সোফায় বসে ছিল সাজেদ। বিশাল কেক নিয়ে তখন তার শ্বশুর হাজির হলো। হুলুস্থুল কাণ্ড বেঁধে গেল আবার, যদিও মাহার জন্মদিনের কেক আগের দিনই কাটা হয়ে গিয়েছে। আজ শুধু একটি পার্টি করে মাহাকে সবার সামনে এনেছে, আবার এখন শহিদ কেক নিয়ে হাজির হয়েছে। যাইহোক, সবকিছু ভুলে গিয়ে শহিদ যে নিজের নাতনিকে এত আদর করছে তা-ই অনেক কিছু। আজ বিকেলের দিকেই মাহাকে এনে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে সাজেদ, তারপর মাহাকে নিয়ে তারিন চলে গিয়েছে, ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে।

মাহাকে ঘুম পাড়িয়ে তারিন আবার ফিরে এসে মেহমানদের আপ্যায়ন করছিল। আস্তে আস্তে রাত বাড়ার সাথে সাথে চলে যেতে লাগল সব মেহমান, গুটিকয়েক ব্যক্তি রয়ে গেল, এই গুটিকয়েক লোকই তার শ্বশুরকে দেখে মাছ বাজার বানিয়ে ফেলেছে। তাদেরকে সামলাতে সামলাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল সাজেদ, শুরু হলো প্রচণ্ড মাথাব্যথা। মাথার ডান-বাম দুই দিক থেকেই ব্যথা শুরু হলো। এরকম ব্যথা আর হয়নি তার, আজই প্রথম হলো। ব্যথা সহ্য করতে না পেরে নিজের রুমে এসে শুয়ে রইল সে।

এখন তারিনকে মাথাব্যথার কথা বলা যাবে না। বললেই শুধুশুধু চিন্তা করবে, শহিদের সাথে আর ডিনার করা হবে না। সে নতুন একটি স্টিল ফ্যাক্টরি দেবে। সেজন্য জমি লাগবে তার। জমি পেয়েছে, কিন্তু জমিটি সরকারি, সেটা

নিজের নামে করতে তার শ্বশুরের দরকার পড়বে। সেজন্য আজ সকালেই তারিনকে পাঠিয়েছিল।

শহিদের তারিন ছাড়া আর কেউ নেই। তারিনের মা মারা যায় সাজেদের বিয়ের বছরে। তখন সাজেদ আর তারিন দুজনেই শহিদকে অনুরোধ করে তাদের সাথে এসে থাকতে, কিন্তু সে রাজি হয়নি। মায়ের শোক কাটতে না কাটতেই বাচ্চাটা মারা গেল, দূরত্ব বাড়তে থাকল তাদের মধ্যে। দেখা গেল তারিন একদম সবার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে, বিশেষ করে শহিদ রাজনীতির কাজে ব্যস্ত থাকায় তারিন অভিমান করে তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিল। তারপর মাহাকে নিয়ে ঝামেলা শুরু হলো, সেই ঝামেলা কাটল আজ, সুতরাং সামান্য মাথাব্যথার কারণে এতদিনের পরিকল্পনা নষ্ট করা যায় না।

এই ভেবে বিছানা থেকে নেমে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াল সাজেদ। তারিনও পেছনে এসে দাঁড়াল। দুজন দুজনকে দেখল, কিন্তু চোখে চোখ রাখলো না। ভাবল, দেখতে দেখতে বিবাহিত জীবনের নয়টি বছর পার করে দিল তারা! সাজেদ একটু নিজেকে দেখে নিল, আর তারিন নিজের শাড়ি গুছিয়ে নিল, তারপর রুম থেকে বেরিয়ে এলো দুজনেই।

পেছনে রুমের দরজাটি আস্তে করে বন্ধ হয়ে গেল। রুমের ভিতর থেকে একটি গুনগুন করে আওয়াজ আসছে। নির্জনতার মাঝে সেই আওয়াজ ধীরেধীরে সমস্ত বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ল কিন্তু এত কোলাহলের মাঝে কারো কানে তা পৌছালো না। বিপদের নরক ঘণ্টা বেজে উঠল ঠিকই, কিন্তু সেটা শোনার জন্য কারও আর সেই শ্রবণশক্তি রইল না। সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত। বসে থাকলো না অন্ধকারের অধিপতিও।

খিচুড়ি বসিয়ে দিয়ে এসেছেন হাফেজ মিয়া। সারা দিনে কাজের কাজ কিছুই হয়নি, সারাদিন বাড়ি বাড়ি গিয়েছেন, হুজুরের আসার কথা বলেছেন, বাচ্চাদের মক্তব আর হুজুরের বেতন নিয়ে কথা বলেছেন। অধিকাংশ রাজি হয়নি, মাত্র কয়েকটা পরিবার রাজি হয়েছে। তাতেই চলবে। হুজুরকে কেউ না রাখতে পারলেও হাফেজ মিয়া একাই রাখতে পারবেন। বাবার দেওয়া তিন একর জমি আছে, একটা বিশাল পুকুর আছে। সেই জমিগুলো থেকে ভালোই পয়সা আসে। প্রতিবছর ধান বিক্রি করে দশ থেকে বারো হাজার টাকা পান। এছাড়া পুকুরের মাছ ধরে যা টাকা পান তা দিয়েই বছর চলে যায়। বাকি টাকা ভূঁইয়া সাহেবের কাছে রেখে দেন। সে হিসেবে একাই সবকিছু করতে পারবেন তিনি।

হুজুরের ঘর হুজুর নিজেই পরিষ্কার করে নিয়েছেন। কাপড় ব্যাগেই রাখছেন। দুপুরে ভূঁইয়া বাড়ি থেকে খাবার পাঠিয়েছে। রাতেও ওইখানে খেতে বলেছে কিন্তু হুজুর রাজি হননি, যদিও রাজি না হওয়ার পিছনে দায়ী হাফেজ মিয়াই। ভূঁইয়া সাহেব সুদ খায়, হাফেজ মিয়া সেটা হাসতে হাসতে বলে ফেললেন। তাতেই হুজুর বেঁকে বসলেন, বললেন খাবেন না সেখানে। কিন্তু তাতে অবশ্য ব্যাপারটা খারাপ হলো না, হুজুরের খেদমত করে সওয়াব কামানোর সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না তিনি। লণ্ঠনের আলোয় দেখলেন হুজুর লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন।

হাফেজ মিয়া বারান্দা থেকে ডাক দিলেন, "হুজুর ঘুমিয়ে গিয়েছেন নাকি?"

হুজুর মিষ্টি গলায় বললেন, "ভিতরে আসুন।"

হাফেজ মিয়া ভিতরে ঢুকলেন। লণ্ঠন মিটমিট করে জ্বলতে লাগল। হুজুর লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন, চোখ বন্ধ, চোখের উপর দুই হাত।

হুজুর আবার বললেন, "কাছে এসে বিছানায় বসুন।"

হাফেজ মিয়া হুজুরের কাছে গিয়ে বসলেন। হুজুরের শরীর থেকে খুব সুন্দর সুবাস আসছে। পায়ের কাছে বসতেই হুজুর চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে হাফেজ মিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনাদের গ্রাম সম্পর্কে একটু বলুন তো।"

হাফেজ মিয়া হাসি দিয়ে বললেন, "কী জানতে চান?"

"এই গ্রামের মানুষ কেমন? বাড়িঘর?"

"ওহ আচ্ছা সেটা! গ্রামে মানুষ খুব কম। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটা বাড়ি হবে। অধিকাংশই কৃষক। ভূঁইয়া বাড়ি হলো গ্রামের সবচেয়ে বড় বাড়ি। ভূঁইয়া বাড়ির পিছনে হলো জনু কবিরাজের বাড়ি।"

"হাকিম নাকি?"

"না, এই তাবিজ-তুমার দেয়। জিন-ভূত ছাড়ায়। এই আর কী।"

"ওহ আচ্ছা, তারপর?"

"আমার বাড়ির সামনের বাড়িটা ধন মিয়ার বাড়ি। ধন মিয়ার দুই ভাই আর তারা সবাই সেখানে থাকে। তারপর রাস্তার মাথায় করিম মিয়ার বাড়ি।"

"খেজুর খাবেন?" হাফেজ মিয়া থামতেই হুজুর প্রশ্ন করলেন।

এটা তো খেজুরের সময় না, যদি সময় হতো তাহলে পুকুরপাড়ের গাছটায় খেজুর ধরত। হাফেজ মিয়া অবাক হয়ে বললেন, "এই সময়ে খেজুর কোত্থেকে পেলেন?"

হুজুর বিছানা থেকে উঠে বসে হাসি দিয়ে বললেন, "আছে আছে।"

হুজুর খাটিয়ার নিচ থেকে ব্যাগ বের করে সেটা থেকে কাপড়ের একটা পোঁটলা বের করে নিলেন। পোঁটলাটা খুলতেই কালো কালো কী যেন বের হয়ে আসল। হুজুর সেখান থেকে কয়েকটা তুলে হাফেজ মিয়াকে দিয়ে বললেন, "এই নিন। এগুলো মদিনা থেকে আনা খেজুর।"

মদিনার নাম শুনতেই চোখে পানি এসে গেল হাফেজ মিয়ার। আহা রে! সোনার মদিনায় যাওয়ার কত ইচ্ছা হাফেজ মিয়ার। হজ্বে যাওয়ারও ইচ্ছা আছে। সেজন্যই তিনি টাকা জমাচ্ছেন। এমন খেজুর আগে দেখেননি তিনি। হুজুরের হাত থেকে একটি তুলে নিয়ে মুখে দিলেন। গুড়ের মতো মিষ্টি। সে চোখ বন্ধ করে খেজুর উপভোগ করতে লাগলেন।

"খিচুড়িটা নেড়ে আসুন। জ্বলে যাচ্ছে," হুজুরের আওয়াজ শুনে খিচুড়ির কথা মনে পড়ে গেল।

দৌড় দিয়ে চুলোর কাছে গেলেন তিনি। খিচুড়ি হয়ে গিয়েছে। এখন তেল-পেঁয়াজ ভেজে খিচুড়িতে ছেড়ে দিলেই হবে। পাশে একটি ছোট কড়াই রাখা। তিনি কড়াই চুলায় বসিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে কড়াই গরম হয়ে গেল।

কড়াইতে সরিষার তেল গরম হতে দিলেন। এই ফাঁকে দুটো পেঁয়াজ কেটে নিলেন। তেল গরম হলে সেগুলো তেলে ছেড়ে দিয়ে ভাজতে লাগলেন। কালো হয়ে গেলে কড়াই ধরে খিচুড়িতে ঢেলে দিলেন।

খুব সুন্দর একটা গন্ধ আসছে। খিচুড়ি ঘরে নিয়ে গেলেন তিনি। রাতের আয়োজন খিচুড়ি আর বেগুন ভর্তা। সেজন্য দুটি বেগুন নিয়ে আবার রওনা হলেন চুলোর দিকে। ছাই তুলে বেগুন পোড়াতে হবে। ছাই তুলে বেগুনদুটি পুড়াতে দিলেন। হঠাৎ করে মনে পড়ল যে, হুজুরকে জিজ্ঞেস করা হয়নি ভর্তায় ঝাল বেশি খাবেন, নাকি কম ঝাল খাবেন।

হুজুরের রুমে ঢুকতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। লণ্ঠন নিভানো। সবকিছু অন্ধকার হয়ে আছে। এই অন্ধকারে বিছানার উপর সাদা একটা আলো লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। ভয় না হতভম্বতা সেটা বুঝতে পারলেন না হাফেজ মিয়া। মৃদু একটা বাতাস তাঁকে পাশ কাটিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে গিয়েছে। হঠাৎ করে লণ্ঠন জ্বলে উঠল। বিছানার উপর হুজুর শুয়ে আছেন লম্বা হয়ে।

হুজুর হাফেজ মিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন,"কী হয়েছে? এভাবে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন কেন?"

হুজুরের কথা শুনে বিমূঢ়তা কাটল হাফেজ মিয়ার। আমতা আমতা করে বলল, "বিছানার উপর দেখলাম..."

"কী দেখলেন যে এত অবাক হয়ে গেলেন। আমিই তো এখানে শুয়ে আছি। আপনি মনে হয় ভুল কিছু দেখেছেন।"

হুজুরের কথা ঠিক হতে পারে। সকালের ঘটনার পর মাথা হয়তো একটু ঝামেলা করছে তাই এসব উল্টাপাল্টা দেখছেন, কিন্তু চোখের সামনে যা দেখলেন তাকেও তো আর অস্বীকার করা যায় না। মাথা চুলকাতে চুলকাতে এসব ভাবতে লাগলেন হাফেজ মিয়া।

হুজুর বিছানা থেকে নেমে বলল, "খিচুড়ি হয়েছে?"

"জি, আপনি ঝাল ভর্তা খাবেন?"

হুজুর হেসে বললেন, "যত ঝালই হোক না কেন, আমার খেতে সমস্যা নেই।"

হুজুর বের হয়ে বারান্দার দিকে যেতে লাগলেন। হাফেজ মিয়া মাথা চুলকাতে চুলকাতে হুজুরের পিছন পিছন গেলেন। সবকিছু এত অদ্ভুত লাগছে কেন? উত্তর জানা নেই তাঁর। এক অনাকাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতের বেড়াজালে যে ফাঁসতে যাচ্ছেন তিনি, তা তিনি না বুঝলেও এই প্রকৃতি বুঝে গিয়েছে, তাই তো সব গুমোট হয়ে আছে।
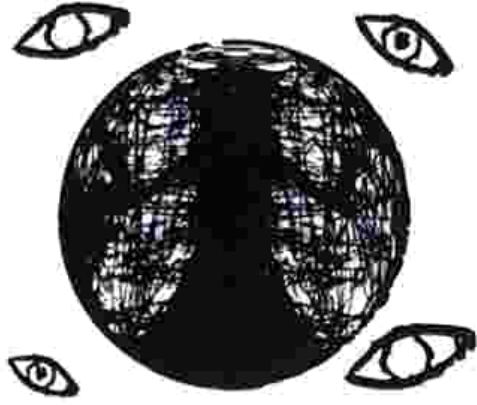
রফিকের বয়স বেশি না, এই চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে। গাট্টাগোট্টা দেহ, নাকের নিচে এক গুচ্ছ কালো গোঁফ যেন তার বাহ্যিক পরিচয়। গোঁফ পেকে গিয়েছে কিন্তু রফিক রং ব্যবহার করে কালো করে রাখে। কম বয়সেই গোঁফটা কেন পেকে গিয়েছে তা সে জানে না, জানার চেষ্টাও করেনি। গোঁফগুলো তার অনেক প্রিয়। প্রত্যেকদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই আগে গোঁফগুলোতে সরিষার তেল দেয়, তারপর শুরু হয় তার দৈনন্দিন কাজ।

সমস্ত মুখে গুটি বসন্তের দাগ। এই দাগগুলো নিয়ে তার আফসোসের শেষ নেই। কত জায়গা থেকে কিনে যে ক্রিম লাগিয়েছে, কত যে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেয়েছে – তার ইয়ত্তা নেই। সে সাজেদের হয়ে কাজ করছে আজ অনেক বছর হলো। সে সাজেদের এলাকার একটা নীরিহ, ঠুনকো মানুষ ছিল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে গ্রাম থেকে তাকে এখানে তুলে এনেছে সাজেদ।

রফিক জানে যে, সে নিজে অত্যন্ত ধুরন্ধর লোক, তবে সাজেদ যে তার চেয়েও ধুরন্ধর, সে তা-ও জানে। তাই এই চার বছরে সাজেদের সাথে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। কাজে কোনো হেরফের করলে সে নিস্তার পাবে না তা সে বেশ ভালোভাবেই বোঝে। সাজেদ যেরকম লোক তাতে তাকে ছাড় দেবে না। খুঁজে বের করে কেটে কুচিকুচি করবে, তারপর নর্দমায় ফেলে দেবে।

সাজেদের কাছে এসে রফিক কষ্টে আছে তেমনও নয়, তার কেউ নেই। বিয়ে করেছিল প্রায় এক যুগ আগে। স্ত্রী কলেরায় মারা গিয়েছে। সাজেদের পরিবারে অলিখিত কর্তা সে। ইচ্ছেমতো টাকাপয়সার লেনদেন করতে পারে। বলা যায়, এখানে অনেক সুখেই আছে সে।

রফিকের কাজ বাড়ির বাজার থেকে শুরু করে ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া পর্যন্ত সবকিছু। ফজরের আজান দেওয়া মাত্রই ঘুম থেকে উঠে পড়ে। ফ্রেশ হয়ে

বাইরে এসে গাছগুলোতে পানি দেয়, তারপর বাজারে যায়। সেখান থেকে ফিরে মাহাকে স্কুলে নিয়ে যায়, তারপর সাজেদ ঘুম থেকে উঠলে তার সাথে পার্টি অফিস, অফিস আর বিভিন্ন মিটিংয়ে যায়। সারাদিন দৌড়াদৌড়ি করে, সেই দৌড়াদৌড়ি চলে রাত অবধি।

কাল রফিকের উপর দিয়ে একটু বেশিই ধকল গিয়েছে। আজও ফজরের আজান কানে আসা মাত্রই সে ঘুম থেকে উঠে গেল। চোখে অনেক ঘুম তার, আর কিন্তু কোনো উপায় বাকি নেই। মানুষ অভ্যাসের দাস, তেমনি ফজরের আজান শুনে ঘুম থেকে ওঠা রফিকের অভ্যাস। কাল রাতে দেরিতে ঘুমাতে গিয়েছিল। ঝামেলা শেষ করতে করতে প্রায় বারোটার উপর বেজে গেল। সবকিছু গুছিয়ে উঠতে উঠতে আরও এক ঘণ্টা। সব কাজ শেষ করে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিতেই ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেল রফিক। সারারাত বেঘোরে ঘুমিয়ে রইল।

রফিক ঘুম থেকে জেগে একটু বিছানায় গড়াগড়ি করে নিল। বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না তার, তবুও নিজেকে ঠেলে তুলল। বিছানায় বসে অন্ধকারে নিজের খুঁজতে লাগল টর্চ লাইটটিকে। বালিশের নিচেই থাকে সেটি, একটু খোঁজার পর পেল, সিলভার কালারের বড় একটা টর্চ লাইট। টর্চ দিয়ে পূর্বদিকের দেয়ালের বরাবর আলো ফেলল, মুহূর্তে আলোকিত হয়ে গেল সমস্ত কিছু। দেয়ালে ইলেকট্রিক সুইচের বোর্ড দেখতে পেল। বিছানা থেকে নেমে ফ্লোরে আলো ফেলল। পাশেই স্যান্ডেলজোড়া পড়ে আছে। স্যান্ডেল পরে এগিয়ে গিয়ে লাইটের সুইচ চাপল।

মাথার উপর পঁচিশ ওয়াটের লাইটটি জ্বলে উঠল। হলরুমের উত্তর-পূর্ব কোণের রুমটি রফিকের, রুম থেকে বের হয়ে ডাইনিং রুম, তারপর বাঁ দিকে মেইন দরজা। মেইন দরজা সহ নিচতলার সব দরজার চাবি রফিকের শার্টের পকেটেই থাকে। চেয়ারের উপর থেকে শার্টটা তুলে পরে নিল, শার্টটা পরতেই চাবির ভারি গোছা টের পেল সে।

টর্চ হাতে নিয়ে রুম থেকে বের হয়ে আসল রফিক। হলরুম অন্ধকার হয়ে আছে, একদম গাঢ় অন্ধকার। শেষরাতে এত অন্ধকার থাকে না, অন্ধকার দূর হয়ে আবছা আলোকিত হয়ে থাকে হলরুম, কিন্তু আজ কোনো আলোই নেই। মাঝরাতে যেমন গভীর অন্ধকার হয়ে থাকে সবকিছু ঠিক তেমন অন্ধকার হয়ে আছে। রফিক টর্চের আলো ফেলে এগোল মেইন দরজার দিকে। মেইন দরজায় চাবি ঘুরিয়ে বের হয়ে আসল লনে। বাইরেও একেবারে অন্ধকার। সে বুঝতেই পারছে না এত অন্ধকার কেন এখনও।

ফজরের পর থেকে গভীর রাতের অন্ধকার কাটতে শুরু করে, কিন্তু আজ একদম উলটো। অন্ধকার দূর হওয়ার কোনো নামগন্ধ নেই। সে পিছনে ফিরে

দরজা লাগিয়ে নিল। বাড়িটি উত্তর-দক্ষিণমুখী। বাড়ির চারপাশে দশ ফুট উঁচু প্রাচীর। বাড়িটি একদম দক্ষিণে। সেখান থেকে সরু রাস্তা উত্তর দিকে গেট বরাবর চলে গিয়েছে। সরু রাস্তার বাঁ পাশে বিশাল ফুলের বাগান, তারিন শখ করে বিভিন্ন ধরনের ফুল গাছ এনে লাগিয়েছে, সেখানে সকাল বেলায় রফিক পানি দেয় আর সন্ধ্যায় তারিন।

বাগানের মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে আরেকটি সরু রাস্তা। সেটি শেষ হয়েছে একদম বাড়ির পূর্ব পাশে গিয়ে। সরু রাস্তার অন্যপাশে ছোট একটি ঘর, ঘরটি পূর্ব পাশের দেয়াল ঘেঁষে তোলা, এটি গুদামঘর। ঘরের ভিতর নানা রকম জিনিস রাখা হয়। তাছাড়া সেখানে একটি মোটর পাম্প বসানো আছে। মোটর পাম্পটি পুরো বাড়ির পানির উৎস। মোটর পাম্পের সাথে লম্বা হোস পাইপের সংযোগ দেওয়া, রফিক সেই পাইপ দিয়ে পানি দেয় বাইরের বাগানে।

বরাবরের মতোই আজও সে সরু রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল ছোট ঘরটির দিকে। অন্ধকারের মাঝে আন্দাজ করে হাঁটছিল। টর্চটি রফিকের বাম হাতে ধরা, সেটি নাড়াতে নাড়াতে সে এগিয়ে যাচ্ছে। ছোট এই ঘরের দরজায় সিলভার কালারের একটি তালা ঝুলছে। তালাটি রফিকই এনে লাগিয়েছে, তালার উপর টর্চ পড়তেই আলো প্রতিফলিত হলো তার চোখে, তাই সে সুইচ চেপে টর্চ বন্ধ করে দিল।

তালার চাবি রফিকের পকেটেই আছে। সে চাবি হাতে নিয়ে টর্চ লাইট আবার তালা বরাবর ধরল। চালু করার জন্য সুইচে চাপ দিতেই খচখচ করে একটি আওয়াজ আসলো তার কানে। চমকে উঠল সে। আওয়াজটি ঘরের ভেতর থেকে আসছে, ইঁদুর হবে হয়তো, ইঁদুর চলাফেরা করলে যেরকম আওয়াজ হয় ঠিক সেরকম ছিল আওয়াজটা।

তবে আওয়াজের ব্যাপারে আর মাথা না ঘামিয়ে রফিক এবার টর্চ জ্বালিয়ে নিজের বাম হাতের বগলে নিল। এবার আর কোনো আওয়াজ আসল না। এবার সে বাম হাত দিয়ে আলতো করে তালাটা উপরে তুলে ডান হাত দিয়ে চাবি ঘুরালো। তালা খুলে গেল। চাবি আবার পকেটে ভরে বগল থেকে টর্চ ডান হাতে নিয়ে নিল সে।

ধাক্কা দিতেই ক্যাঁচ করে দরজা খুলে গেল। ভিতরে ঢুকল রফিক। এই ঘরে কোনো বৈদ্যুতিক লাইট লাগানো হয়নি, বৈদ্যুতিক লাইটের প্রয়োজনও পড়ে না; ভোরে রফিক টর্চ দিয়ে কাজ সেরে নেয়, আর বিকেলের আলোয় তারিন। তাছাড়া তেমন কাজ থাকে না এই ঘরে, সেজন্য আর লাইট লাগানো হয়ে ওঠে না।

রফিক প্রত্যেকদিন ভোরে ভাবে আজ লাগাবে। এরকম করতে করতে অনেকদিন চলে গেলেও এখনও লাগানো হয়নি। সে প্রত্যেকদিন ভুলে যায়, শুধু

ভোরে এই ঘরে ঢুকলেই মনে পড়ে। আজও মনে মনে ভাবল, আলো ফুটলেই দোকান থেকে একটি লাইট এনে লাগাবে।

রফিক ঘরের ভেতর আলো ফেলল। রুমের কিছু অংশ আলোকিত। সেই আলোতে সে দেখতে পেল একটি বেতের ঝুড়ি উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ঝুড়ির নিচেই মোটর, সেখান থেকে মোটরের তার চলে গিয়েছে পিছনের দেয়ালে, দেয়ালে সুইচ বোর্ড। সে টর্চ ধরেই এগিয়ে গেল, কাছে গিয়ে ঝুড়িটা উলটাল। উল্টাতেই চোখে পড়ল মোটর আর তার সাথে সংযুক্ত পাইপ। তারিন প্রত্যেকদিন বিকেলে পানি দিয়ে পাইপ লাইনটা সাপের মত পেঁচিয়ে রাখে। এরকম করে রাখলে পাইপ বের করতে কোনো কষ্ট হয় না। সে মোটর পার হয়ে সুইচ বোর্ডের কাছে গেল, উঁচু করে টর্চ ধরল বোর্ডের দিকে, সাবধানে মোটরের সুইচ চাপল। সাথে সাথে শব্দ করে মোটর চলতে শুরু করল।

রফিক দেরি করল না। বাম হাতে টর্চ ধরে ডান হাতে ঝুঁকে পাইপের মাথাটি নিয়ে বাইরের দিকে দৌড় দিল। ঘরের বাইরে পা রাখা মাত্রই পাইপে টান লাগল। থামতে হলো তাকে। পাইপ আর সামনে এগোচ্ছে না। সে জোরে সামনের দিকে টান দিল, কোনো লাভ হলো না, মনে হচ্ছে কোনোকিছুর সাথে আটকে আছে পাইপটি। এদিকে পাইপ দিয়ে পানি বের হচ্ছে, বাগানের সরু পথ ভিজে যাচ্ছে। সে আবার পাইপ টান দিল। না, পাইপ আর আসছে না। রফিক পাইপটি হাত থেকে ফেলে ভিতরে গিয়ে মোটরের দিকে টর্চের আলো ফেলে পাইপটি দেখল।

কাছে গিয়ে ভালো করে দেখল কোথাও প্যাঁচ লাগল কি না। সে দেখল সব ঠিক আছে। ঝুঁকে আবার পাইপটি টান দিল। এবার আর কোনো সমস্যা করল না, টান দেওয়া মাত্রই সামনের দিকে এগিয়ে আসল পাইপটি। রফিক পাইপ ছেড়ে বাইরে আসল। টর্চ দিয়ে আলো ফেলতেই দেখল বাগানের অনেক জায়গা পানিতে ভেসে গিয়েছে। দেরি না করে ঝুঁকে আবার পাইপ তুলে নিল সে।

টান দিল সামনের দিকে। এবারও আসছে না, আটকে আছে। রফিকের মেজাজ গরম হতে লাগল। জোরে জোরে টান দিল সে। না, কোনো লাভ হলো না, পাইপ পূর্বের জায়গাতেই থেকে গেল। মনে হচ্ছে কোথাও আটকে আছে। একদিকে পাইপ আসছে না, অপরদিকে ভেসে যাচ্ছে সমস্ত কিছু সে আবার পাইপটা ফেলে দৌড় দিল ঘরের দিকে। ঘরের ভিতর ঢুকতেই টর্চ লাইট বন্ধ হয়ে গেল। সে সুইচ চাপেনি, সুইচের কাছে তার কোনো আঙুলও নেই যে অজান্তে চাপ লেগে লাইট বন্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু টর্চ বন্ধ হয়ে গেল। অজানা ভয়ে জমে গেল সে।

রফিকের শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা একটি স্রোত বয়ে গেল। সারা শরীর কেমন ভারী হয়ে গেল তার। সে কিছুই বুঝতে পারল না। কয়েক সেকেন্ড কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইল, তারপর নিজেকে একটি ঝাঁকি দিয়ে হুশ ফেরাল। দীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ফেলল সে। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দটা কয়েক গুণ জোরালো হয়ে আবার তার কাছেই ফিরে এলো। টর্চ লাইটের লোহার খোলসের ঠান্ডা অনুভূতি পেল সে।

হাতে থাকা টর্চটি নিয়ে ভালো করে সুইচে চাপল। না, কাজ হচ্ছে না। হাতের মধ্যে কয়েকটা বাড়ি দিল, তারপর আবার চেষ্টা করল, এবারও লাভ হলো না। নতুন টর্চ, দুদিন আগেই বাজার থেকে কেনা, এত তাড়াতাড়ি ব্যাটারি যাওয়ার কথা না। রফিকের মনে হলো টর্চ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এদিকে মোটরের আওয়াজে কান ধরে যাচ্ছে, আবার বাগান ভেসে যাচ্ছে। কোন দিকে যাবে সে ঠিক ভেবে পেল না। কয়েক সেকেন্ড ভাবল, অবশেষে সিদ্ধান্ত নিল।

মোটর বন্ধ করতে হবে।

মোটর বন্ধ করে এখন চলে যাবে। সকাল হলে পানি দেবে, সূর্যের আলো আসা অবধি আজ অপেক্ষা করবে। কিন্তু এই অন্ধকারে যেখানে নিজের হাত দেখা দায় সেখানে কী করে সুইচ বোর্ডের কাছে যাবে তা সে বুঝতে পারছে না। সে বাইরের দিকে তাকাল। বাইরেও অন্ধকার, কিন্তু অতটা নয়, বাইরে পূর্ব দিগন্তে আবছা আলো ফুটে উঠেছে। সেই আলোর কিয়দাংশ পৃথিবীতে এসে গাঢ় অন্ধকারের রাজত্বকে একটু হলেও ম্লান করেছে।

রফিক আবার টর্চের সুইচ চাপল, তেমন একটি লাভ হলো না। সে টর্চ ছুড়ে মারার জন্য হাত উপরে তুলল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার নামিয়ে নিল। খামোখা এই জড়বস্তুর উপর মেজাজ দেখিয়ে লাভ নেই। এখন এসব বাদ দিয়ে যে করেই হোক মোটর বন্ধ করতে হবে, তাড়াতাড়ি বন্ধ না করতে পারলে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে, এটা আর হতে দেওয়া যাবে না।

রফিক আন্দাজেই সামনের দিকে আস্তে আস্তে সাবধানে পা বাড়াল। একটু যাওয়ার পর ঠান্ডা কিছু তার পায়ে এসে লাগল। সে আবার চমকে উঠল, তারপর বুঝল এটা পাইপ, তার মানে মোটরের কাছাকাছি আছে সে। সেটি পার হলেই বোর্ড। এবার বড় করে পা ফেলল সে, লাভও হলো, মোটরের ওই পাশে গিয়ে তার পা পড়ল। রফিক দ্বিতীয় পা ফেলল প্রথম পায়ের মতো, সফল হলো ভালোভাবে।

তার অনুমান অনুযায়ী সে এখন সুইচ বোর্ডের খুব কাছে আছে, এখন শুধু উপরে হাত দিলেই পাবে। সে আস্তে করে হাত উপরে তুলে দেয়াল হাতড়াতে

লাগল, একটু পর বোর্ডের মাথা এসে হাতে লাগল, সে সুইচ চেপে দিল। বন্ধ হয়ে গেল মোটর। রফিক দীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ফেলল। যাক আপাতত এটা থেকে রেহাই পাওয়া গিয়েছে।

ঘুরে যেভাবে এসেছে সেভাবেই বের হয়ে আসল। বাইরে আসতেই রফিকের পা পানিতে ডুবে গেল, পায়ের পাতা পুরোটা কাদার নিচে দেবে গেল, কাদার নিচে হারিয়ে গেল জুতো। জুতোর কথা বলাই বাহুল্য, জুতো ওভাবেই রেখে দিয়ে পা তুলে ঝুঁকে পাইপ খুঁজতে লাগল। এই পানি আর অন্ধকারে কী করে যে খুঁজবে পাইপটি! এই ভেবে হয়রান হয়ে গেল সে। তারপর এত চিন্তাভাবনা বাদ দিয়ে পানির মধ্যে পাইপ খুঁজতে মনোনিবেশ করল।

একটু খোঁজার পর পাইপটি পেয়ে তুলে নিল। তুলতেই বুঝল পাইপটি অনেক নরম, হাতের মধ্যে লেপ্টে যাচ্ছে। পাইপের মধ্যে একটু উষ্ণতাও অনুভব করল রফিক। সে টের পেল, আস্তে আস্তে পাইপটি তার হাতে আপনা-আপনি পেঁচিয়ে যাচ্ছে, কবজি থেকে চারপাশ পেঁচিয়ে উপরের দিকে উঠছে পাইপটি।

রফিক তৎক্ষণাৎ বুঝে গেল সে যা হাতে নিয়েছে তা পাইপ নয়, বরং একটি জলজ্যান্ত সাপ! তা যেকোনো মুহূর্তে তার উপর মরণ ছোঁবল দিতে পারে, এসব উপলব্ধি করতেই জোরে ঝাঁকি দিয়ে সাপটা নিচে ফেলে দৌড় দিল রফিক। পিছনে আর তাকাল না, এক দৌড়ে দরজার সামনে এসে উপুড় হয়ে পড়ল। ধপাস করে আওয়াজ হলো। ফ্লোরে পড়ে হাতে প্রচণ্ড ব্যথা পেল, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সে, ঠিক তখনই কানে ভেসে এলো ফজরের আজান।

আজানের শব্দ কানে যাওয়ার সাথে সাথে থমকে গেল রফিক। চুপ হয়ে শুনল আজান। আজান শেষ হলো। আজান শোনার পর কেমন যেন হালকা হয়ে গেল তার শরীর। মনে হলো অনেক ভারী একটি বোঝা নেমে গেল তার শরীর থেকে। সে দরজার সামনে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল আর ভাবতে লাগল, তাহলে যে আজানের শব্দে রফিকের ঘুম ভাঙল তা কি আদৌ কোনো আজান ছিল, নাকি অন্য কিছু!
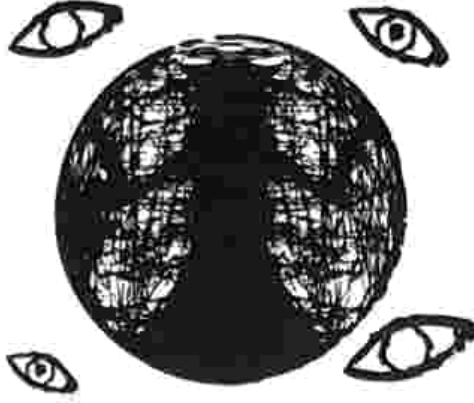
শব্দটি থেমে থেমে আসছে, কিছুক্ষণ হচ্ছে, তারপর একটু বিরতি, তারপর আবার শুরু। প্রথমে সাজেদ কোনো গুরুত্ব না দিলেও এখন না দিয়ে উপায় নেই। আস্তে আস্তে শব্দটি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে, ঘুমের মধ্যে সে শব্দটি শুনছিল, এখন আর নিতে পারছে না, এত আওয়াজের মধ্যে ঘুমানো সম্ভব নয়। সে কান খাড়া করে রাখল, কানে শব্দটি থেমে থেমে আসছে, কিছুক্ষণ পর সে বুঝতে পারল কেউ গোঙাচ্ছে। প্রচণ্ড আঘাত পেলে একটি কুকুরছানা যেভাবে গোঙায় ঠিক সেরকম শব্দ। সে চোখ খুলল, চোখের সামনে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না, তাই আবার কান খাড়া করে সেই শব্দ শোনার চেষ্টা করল সে।

এতক্ষণ সাজেদ ঘুমিয়ে ছিল। রাতে বিছানায় যাওয়ার সাথে সাথে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল সে। সারাদিন দৌড়-ঝাঁপের অন্ত ঘটে বিছানায়, তাই বিছানায় যাওয়ার পর নিজেকে আর আটকাতে পারেনি সে, যদিও আজ বিছানায় তারিনের সাথে কিছু মুহূর্ত কেটে গিয়েছিল, তারপর আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। ঘুমের কাছে বন্দি হয়ে গেল আর সেই ঘুম এখন ভাঙল হঠাৎ গোঙানির শব্দ শুনে।

সাজেদ শব্দের উৎস বের করার চেষ্টা করল, তখন ঘুমের মধ্যে কিছু ঠাহর করতে না পারলেও এখন সে খেয়াল করল গোঙানিটা তার পাশ থেকেই আসছে। তার পাশে তারিন শুয়ে আছে। গোঙানির শব্দটা শুনে যদিও তারিনের গলার স্বর মনে হচ্ছে না তবুও সাজেদের মন বলছে তারিন হবে।

তারিনের কিছু হলো নাকি!

মনের কোনে সূক্ষ্মভাবে প্রশ্নটা উঁকি দেয় সাজেদের। তারিনের কথা মনে পড়তেই সে এক ঝটকায় উঠে বসল। অন্ধকার হয়ে আছে সবকিছু, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, এরকম গভীর অন্ধকারে কারও পক্ষে কোনো কিছু বোঝা দুষ্কর। কিন্তু তারিন যে গোঙাচ্ছে তা স্পষ্ট বুঝতে পারল সে।

সাজেদ দেরি না করে বিছানা থেকে উঠে গিয়ে লাইট জ্বালাল, সমস্ত ঘর আলোকিত হয়ে গেল, প্রথমে আলো সহ্য করতে না পেরে সে চোখ বুজে ফেলল; কয়েক সেকেন্ড পর তার চোখ ধাতস্থ হলো, দৌড়ে বিছানার কাছে গিয়ে দেখল তারিন চিত হয়ে শুয়ে আছে, তার কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে।

চুলগুলো সমস্ত বালিশের উপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, দুই হাত সোজা, পা দুটোও টান হয়ে আছে। গলার রগগুলোও ফুটে উঠেছে। অনবরত কাঁপছে সে। সাজেদের মনে হলো তারিনের খিঁচুনি উঠেছে। সাজেদ দেরি করল না। বিছানার উপর গিয়ে তারিনের মাথা নিজের কোলে তুলে নিল।

তারিনের দিকে নুয়ে আস্তে আস্তে ডাক দিল, "তারিন! তারিন!"

সাজেদ ডাক দেওয়ার পর তারিন চোখ খুলল। চোখ খোলার পর সাজেদ ভয় পেয়ে গেল, সে দেখল তারিনের দুই চোখ আগুনের মতো জ্বলছে, একদম রক্তলাল। সাজেদ তার জীবদ্দশায় এরকম চোখ দেখেনি।

নিজেকে সামলিয়ে সাজেদ তারিনকে বলল, "কী হয়েছে তোমার?"

তারিন সাজেদের কথা শোনার পর কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইল। সে এক দৃষ্টিতে তারিনের দিকে তাকিয়ে রইল। তার ঠোঁট দুটি শুষ্ক হয়ে আছে, সেই বিয়ের পর থেকেই সে দেখেছে তারিনের কোনো আগ্রহ নেই সাজসজ্জার প্রতি, সাধারণ জীবনযাপন করে আসছে। অথচ তারিন কিন্তু কোনো সাধারণ মেয়ে নয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইকোনমিক্সে মাস্টার্স করেছে, পিএইচডি করার জন্য লন্ডন স্কুল অভ ইকোনমিক্স থেকে স্কলারশিপও পেয়েছিল।

কিন্তু মেয়েটি কেন যে সাজেদকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল সে তা আজও বুঝতে পারেনি। মেয়েটির নখতুল্য যোগ্যতা তার নেই, অথচ এই নয় বছরে একবারও তার কাছে কোনো অভিযোগ নিয়ে আসেনি। মাঝেমধ্যে মেয়েটির জন্য সাজেদের বুক হাহাকার করে ওঠে, তার জন্য কিছুই করা হলো না, তাকে ন্যূনতম সুখ দিতে পারেনি সে; অথচ তার সংসার সামলাতে গিয়ে মেয়েটার শুভ্র রং ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।

তারিন আবার চোখ খুলে সাজেদকে চোখ দিয়ে ইশারা করল উপর দিকে, সে বসতে চাচ্ছে, সাজেদ সেটা বুঝতে পারল। সে তারিনের মাথা ধরে তুলল, আস্তে আস্তে উঠে বসল তারিন। তারিনের চোখ লাল হয়ে আছে, কিন্তু আগের চেয়ে একটু কম। অনেকটাই স্বাভাবিক লাগছে এখন চোখদুটোকে।

তবে সে এখনও দরদর ঘামছে, জামাকাপড় সব ভিজে গিয়েছে, মনে হচ্ছে একটু আগে জমি থেকে কাজ করে উঠেছে। সাজেদের হাতও ভিজে গিয়েছে তার

ঘামে। তার ঠোঁট দুটি কাঁপছে। সাজেদ তাকে দুই বাহুতে ধরে রেখেছে। সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে।

"পানি খাবে?" সাজেদ প্রশ্ন করল।

তারিন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। সাজেদ এক হাতে তারিনকে ধরে আরেক হাতে একটি বালিশ এনে খাটের হেডবোর্ডের সাথে হেলান দিয়ে রাখল, তারপর আস্তে আস্তে তারিনকে শুইয়ে দিল বালিশটির উপরে।

সাজেদ পানির জন্য আশেপাশে একবার দেখল যে তারিন কোথাও পানি এনে রেখেছে কি না, কিন্তু কোথাও তেমন কিছু দেখতে পেল না, তাই অগত্যা বিছানা থেকে নেমে রওনা দিল। ডাইনিংয়ে যাবে। রুম থেকে বের হয়ে দেখল সমস্ত কিছু অন্ধকার, বারান্দার লাইট নিভানো, পাশাপাশি রুমগুলোরও। এই অন্ধকারে নামা মুশকিল হয়ে যাবে। লাইট জ্বালাতে হবে, কিন্তু এই অন্ধকারে সুইচ বোর্ড খুঁজে পাওয়াও মুশকিল। সে আবার রুমে ফিরে গেল। তারিন চোখ বুজে আছে। সে এগিয়ে গিয়ে সাইড টেবিল আস্তে আস্তে খুলল যাতে কোনো আওয়াজ না হয়, তারপর ড্রয়ার হাতড়ে একটি টর্চ লাইট খুঁজে পেল।

সাজেদ ড্রয়ার থেকে টর্চ তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে ড্রয়ারটা বন্ধ করে তারিনের দিকে তাকাল। তারিন এখনও চোখ বুজে জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। তার কপাল বেয়ে ঘাম ঝরা এখনও বন্ধ হয়নি। সাজেদ দেরি করল না। বাইরে করিডোরে বেরিয়ে এসে টর্চ জ্বালাল, টর্চের আলোতে সিঁড়ি দেখা গেল, আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামল সে। সিঁড়ির বাম দিকেই ডাইনিং রুম, নেমে হলরুম পার হয়ে সোজা চলে গেল কিচেনে।

কিচেনেও অনেক অন্ধকার। রান্নাঘরের লাইট জ্বালাতে হবে। সাজেদ টর্চ দিয়ে সুইচ বোর্ড খুঁজতে লাগল। তার নিজের বাড়ি, অথচ সে জানে না সুইচ বোর্ড কোথায়। আন্দাজে চারপাশে টর্চ ধরে দেখতে লাগল, কোথাও সুইচ বোর্ড খুঁজে পেল না, নিজের উপর মেজাজ গরম হতে লাগল। নিজের উপর নিজেই বিরক্ত হলো কারণ নিজের বাড়িটা নিজের কাছেই অচেনা, বাড়ি ঘুরে দেখারও সময় হয় না তার। সে তড়িঘড়ি করে এগিয়ে গেল ডাইনিংয়ের দিকে, ডাইনিং টেবিলের উপর সাদা, স্বচ্ছ কাচের জগ ভর্তি পানি দেখতে পেল, পাশেই একটি গ্লাস ছিল। সে এগিয়ে গেল টেবিলের কাছে।

জগটা ছোট একটি পিরিচ দিয়ে ঢাকা ছিল। সাজেদ টর্চটা ডান হাতে ধরে রেখেছিল, সেটা বাম হাতে নিল। সে বাঁহাতি, ডান হাতে কোনো কাজ করতে পারে না তাই ডান হাত দিয়ে গ্লাসটা ঠিক করে আবার বাম হাত থেকে ডান হাতে টর্চ নিল। তারপর জগের মুখ থেকে পিরিচ সরিয়ে পানি ঢালতে লাগল, টপটপ করে পানি পড়তে লাগল গ্লাসে, পানি পড়ার শব্দ কেমন যেন মায়াবী লাগল তার কাছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই শব্দ শুনতে লাগল সে। টপটপ করে পানি পড়ছে। আস্তে আস্তে সেই টপটপ শব্দে ডুবে গেল সাজেদ, এতটাই ডুবে গেল যে গ্লাস ভরে গিয়েছে সেদিকে তার খেয়াল নেই। গ্লাস থেকে উপচে পড়ল পানি। প্রথমে টেবিল ভেসে গেল, তারপর টেবিল থেকে গড়িয়ে ফ্লোরে পানি পড়তে লাগল, সেদিকে তার একদম খেয়াল নেই। সে পানি ঢেলেই যাচ্ছে আর মনোযোগ দিয়ে সেই শব্দ শুনছে।

কিন্তু হঠাৎ করে ধপ করে কোনোকিছু পড়ার আওয়াজে সাজেদ চমকে উঠল। তার ঘোর কেটে গেল। চেতনা ফিরে পেতেই তার হাত থেকে গ্লাসটা নিচে পড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। সে অবাক হয়ে টর্চটি ভাঙা গ্লাসের টুকরোর দিকে ধরে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ এভাবে তাকিয়ে থাকার পর তার খেয়াল হলো আওয়াজটির কথা। আওয়াজটি মূল দরজার দিক থেকেই এসেছে। সে টর্চ ধরে দ্রুত পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল।

দরজার কাছে যেতেই দেখল দরজা আংশিক খোলা। সাজেদ ভয় পেল, এই সময় তো দরজা খোলা থাকার কথা না, চোর ঢুকল নাকি! সে একটু দূর থেকে টর্চ সেই ফাঁক বরাবর ধরল, ফাঁক দিয়ে আলো বাইরে চলে গেল, সে আলোতেও সে কিছুই দেখতে পেল না। সে এবার আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল দরজার দিকে, দরজা আস্তে করে একটু ফাঁক করল, ফাঁক করতেই দেখল কে যেন দরজায় হেলান দিয়ে শুয়ে আছে।

সাজেদ ভয় পেয়ে দুই কদম পিছিয়ে এসে বলল, "কে?"

"আমি।"

রফিকের আওয়াজ শুনে নিশ্চিন্ত হলো সাজেদ। লাইট ধরে দরজা পুরোটা খুলে জিজ্ঞেস করল, "এখানে শুয়ে শুয়ে কী করছ? কী হয়েছে?"

লাইটটা রফিকের মুখের দিকে ধরে আছে সাজেদ। রফিকের চেহারা কালো হয়ে আছে, চেহারার মধ্যে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠেছে, সাজেদ তা স্পষ্ট বুঝতে পারছে। তার ভারী শ্বাস ফেলার শব্দ এত দূর থেকেও শুনতে পারছে সাজেদ।

"কী হয়েছে? কিছু বলছ না কেন?" ধমক দিয়ে বলল সাজেদ।

সাজেদের কথা শুনে এবার রফিক উঠে দেয়ালের দিকে হেলান দিয়ে বসলো। একটু দম নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি এখানে কেন?"

রফিকের কথা শোনার পর সাজেদের মনে পড়লো তারিনের কথা। দেরি করল না সে, এক দৌড়ে ডাইনিং টেবিলে গেল, আরেকটা গ্লাস নিয়ে পানি ঢালল, তারপর গ্লাসটা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত পায়ে উপরে উঠতে লাগল।

রুমে ঢুকেই দেখল তারিন চোখ বুজে আছে। সাজেদ গিয়ে টর্চ লাইটটা সাইড টেবিলে রেখে বিছানায় বসে তারিনকে ডাক দিল, "তারিন! এই তারিন!"

তারিন কোনো জবাব দিল না। সাজেদ বুঝতে পারল তারিন ঘুমিয়ে গিয়েছে। নিজেই ঢকঢক করে পানিটা শেষ করল এক টানে।

সাইড টেবিলে গ্লাসটা রাখতে যাবে এমন সময় দরজার দিকে চোখ পড়ল সাজেদের। রুমের লাইটের আলো দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে করিডোরে চলে গেল, সেই লাইটের আলোয় একটি ছায়া দেখতে পেল; একটি সরু কালো ছায়া করিডোরের ফ্লোরে আলোর উপর স্পষ্ট ভেসে উঠল। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল ছায়াটির দিকে।

বিস্ময় কেটে উঠতেই সে ভয় পেল, ভয়ে চোখ বুজে ফেলল। শরীর জুড়ে কেমন একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। এটা কী ভয় পাওয়ার অনুভূতি? সাজেদ জানে না! তবে তার মনে হচ্ছে যা দেখেছে সেটা মোটেও বিভ্রম ছিল না। কেউ ছিল সেখানে। কিন্তু কে!

কয়েক সেকেন্ড চোখ বুজে থাকল, তারপর আবার দেখল করিডোরে। না, কেউ নেই তো। তাহলে এই ছায়া কীভাবে পড়ল। রফিক নাকি? কিন্তু রফিক তো নিচে। রফিক যদি পিছন পিছন আসত তাহলে তো সাজেদ বুঝতে পারত, তাছাড়া রফিকের ছায়া এমন নয়, তাহলে এটি কার ছায়া! নিশ্চয়ই সে চোখে ভুল দেখছে। মস্তিষ্ক আগের যুক্তিটাকে ফেলে দিয়ে নতুন যুক্তি দিচ্ছে। ছায়াটি কেবল সাজেদের চোখের ভুল, বিভ্রম।

তবুও সাজেদের মন মানল না। সে আবার দরজার দিকে তাকাল, এবার কিছুই দেখতে পেল না, সে চোখ বন্ধ করল। বড় বড় দম নিল। শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে প্রতিটা রক্তবিন্দুতে অক্সিজেন পৌঁছিয়ে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল।

কিছুক্ষণ আগেই আজানের শব্দ শুনেছে সাজেদ। সে কোনোদিন তারিনকে নামাজ বাদ দিতে দেখেনি, শত ব্যস্ততার মাঝেও তারিন নামাজের জন্য সময় বের করে নিত। এমনকি বিয়ের প্রথম বছর তারিনের পাশাপাশি সাজেদও নামাজ পড়ত, কিন্তু আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়েছে। এমনকি জুমুয়ার নামাজও পড়া হয় না তার। তারিন এই নিয়ে অনেক রাগ করত কিন্তু আস্তে আস্তে সে কেমন যেন মিইয়ে গেল। সাজেদের সাথে আর আগের মতো কথা বলে না, সময় পার করে না, খুনসুটি করে না, একটু আদরও দেখায় না। সবকিছু কেমন বদলে গিয়েছে।

সাজেদ ভাবছিল তারিনকে ডাক দেবে কি না। তারিনের কী হলো সে বুঝতে পারছিল না, বোঝার আগেই সে ঘুমিয়ে গেল। বাইরে রফিকের সাথে কী ঘটল তা-ও সে বুঝতে পারল না। হঠাৎ করে কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে সমস্ত

কিছু। ভোরের আলো জানালা দিয়ে আসা শুরু করেছে। সে কাঁথাটি তারিনের উপর দিয়ে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। মনের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসল, আবেগ আর ভালোবাসা মিশ্রিত দীর্ঘশ্বাস। মুচকি হেসে রুম থেকে বের হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে হলরুমে চলে আসল।
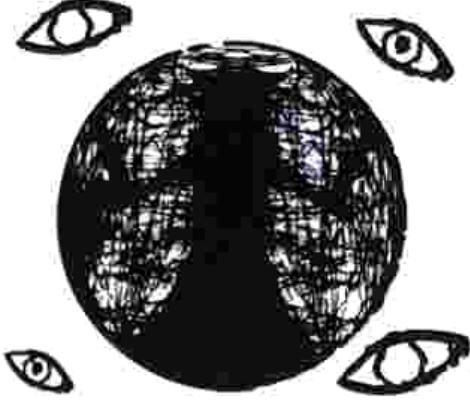
হাফেজ মিয়া গতকাল বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে এসেছিলেন যে হুজুর এসেছে। কিন্তু লাভ হয়নি, আজও কেউ নামাজ পড়তে আসেনি, মাত্র দুজনেই ফজর নামাজ পড়েছেন। হুজুর মসজিদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দূরে ধানখেতের দিকে তাকিয়ে আছেন। হাফেজ মিয়া যে এসেছেন তা হুজুর টের পাননি।

হাফেজ মিয়া গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "হুজুর কোনোকিছু নিয়ে চিন্তিত নাকি?'

হুজুর তেপান্তরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার দুনিয়াটা কত বড় আর এই বড় দুনিয়ার আমরা কত ক্ষুদ্র। দুনিয়ার বিশালতা হিসেবে মাপলে আমরা একটুখানি বালুর সমান। যিনি এই বিশাল দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন তাঁর ডাকে আমাদের সাড়া দিতে ইচ্ছে হয় না। আমরা এতই ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে আমরা ভুলে যাই আমরা একদিন মারা যাব। আমাদের ধুলোয় মিশতে হবে, হাশরের ময়দানে দাঁড়াতে হবে, আমলনামা নিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার সামনে যেতে হবে।"

হাফেজ মিয়া কিছু বললেন না। তাঁর ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসল। হুজুর হাফেজ মিয়ার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "জানেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা অধিকাংশ মানুষ আর জিনকে সৃষ্টি করেছেন জাহান্নামের জন্য। ঈসায়ী, ইহুদি কিংবা অন্য ধর্মের মানুষ যারা আল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালাকে মেনে নেয়নি তারা বিনা হিসেবে জাহান্নামী। তাদের দ্বারা জাহান্নামের পাঁচটা স্তর পরিপূর্ণ করা হবে। কিন্তু জানেন, বাকি দুই জাহান্নাম কাদের জন্য আর এর মধ্যে কোন দল বিনা হিসেবে জাহান্নামী?"

হাফেজ মিয়া জানেন না তাই মাথা নেড়ে না করলেন। হুজুর আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "জাহান্নামের সবচেয়ে নিচু স্তর আর সবচেয়ে বড় এবং কঠিন

জাহান্নাম হলো হাবিয়া। এটি শুধু মুনাফিকের জন্য সংরক্ষিত। আমরা জানি মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি। যাকগে সে কথা বাদ। ইচ্ছা করে নামাজ ছাড়া কুফরীর সমতূল্য। আর পরপর তিনটি জুম্মুয়া ছাড়লে মুনাফিক। চিন্তা করুন এই গ্রামে তিনশো মানুষ আর নামাজ পড়ে মাত্র একজন। বাকি দুইশো নিরানব্বই জন মানুষ জাহান্নামী। অধিকাংশ মুসলমান জাহান্নামে যাবে শুধু নামাজ ছাড়ার কারণে।"

হাফেজ মিয়ার ভিতরটা কেঁপে উঠল কারণ তিনিও জানতেন না যে বেনামাজীর শাস্তি এত ভয়াবহ। মিনমিন করে হুজুরকে জিজ্ঞেস করলেন, "বাকি একটি জাহান্নাম কাদের জন্য?"

"আপনার আর আমার মতো মুসলমানদের জন্য, যারা নামাজ পড়ে আবার পাপও করে। তারা থাকবে জাহান্নামের প্রথম স্তরে। জানেন জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমাদের সবচেয়ে বড় যোগ্যতা কী হবে?"

হাফেজ মিয়া জবাব দিলেন, "নামাজ পড়া, হালাল-হারাম মেনে চলা।"

"আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও তো নিয়মিত রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে নামাজ পড়ত, হালাল-হারাম মেনে চলত। সে ছিল একটা নিকৃষ্ট মুনাফিক।" হুজুর কিছুক্ষণ থেমে আবার বললেন, "আমাদের সবচেয়ে বড় যোগ্যতা হলো হাশরের ময়দানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার কাছে আমলনামা পেশ করার যোগ্যতা। সেদিন সবার জন্য দুর্দিন, সবাই অসহায় থাকবে। জাহান্নামের ফেরেশতারা শিকল দিয়ে বেঁধে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। জাহান্নামের উত্তপ্ত লেলিহান শিখা সবাইকে গ্রাস করবে। সেদিন কিছু সংখ্যক হবেন ভাগ্যবান যাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা ডাক দেবেন নিজের কাছে।পর্দার আড়ালে নিয়ে বলবেন, 'হে আমার বান্দা! তুমি বলো সারা জীবন তুমি কী করেছ?' সেদিন যদি নিজের দুচোখের পানি ফেলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার কুদরতী পায়ে পড়ে বলতে পারি, সারা জীবন যা করেছি ভুল করেছি, আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিন। সেদিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা আমাদের মাফ করে দেবেন কারণ তিনি রহমান, তিনি রহীম। সেদিন কোটি কোটি মানুষ শুধু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার ক্ষমা পেয়ে জান্নাতে চলে যাবেন।"

হুজুরের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে তা দেখে নিজের চোখের পানিও আটকাতে পারলেন না হাফেজ মিয়া। হুজুর চোখের পানি মুছে বললেন, "চলুন একটু গ্রাম ঘুরে আসি।"

হুজুর সামনের দিকে পা বাড়ালে হাফেজ মিয়াও চোখের পানি মুছে হুজুরের পিছন পিছন রওনা হলেন। মসজিদের পাশ দিয়ে সরু রাস্তা চলে গিয়েছে সোজা

ভূঁইয়া বাড়ির দিকে। হুজুর সে দিকেই পা বাড়াচ্ছেন। ভূঁইয়া বাড়িতে অনেক লোক কাজ করে। ভূঁইয়া সাহেব বললে কেউ না মেনে থাকতে পারবে না।

ভূঁইয়া বাড়ির সামনে যেতেই দেখলেন ভূঁইয়া সাহেব একটা লাঠিতে ভর করে হাঁটছে। পরনে একটা লুঙ্গি, উর্ধ্বাঙ্গ খালি, মাথায় টুপি। হুজুর গিয়ে লম্বা করে সালাম দিলেন, "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।"

ভূঁইয়া সাহেব মুখে হাসি ফুটিয়ে জবাব দিল, "হুজুর আসাতে আমি বেশ খুশি হয়েছি। আমিই ভাবছিলাম কাউকে পাঠাব আপনাকে নিয়ে আসতে। আপনি এসে পড়েছেন ভালো হয়েছে।"

হুজুর হেসে বললেন, "কেমন আছেন আপনি?"

"ভালো নেই হুজুর। সারা শরীর জ্বালাপোড়া করে। কিছু গায়ে লাগাতে পারি না। এই দেখছেন না খালি গায়ে ঘুরছি।" জবাব দিয়ে উঠোনের দিকে হাঁটতে লাগল।

উঠোনে কয়েকটা বেতের চেয়ার রাখা। একটাতে গিয়ে বসে পড়ল ভূঁইয়া সাহেব। হুজুর কাছে আসতেই হুজুরকে ইশারা করল বসতে। হুজুর বসার পর ভূঁইয়া সাহেব এবার হাফেজ মিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমাকে না গতকাল রাতে বললাম হুজুরকে নিয়ে এসে খেতে?"

ভূঁইয়া সাহেবের প্রশ্ন শুনে অস্বস্তিতে পড়ে গেল হাফেজ মিয়া। কী জবাব দেবে ভেবে পাচ্ছিল না ঠিক এমন সময় হুজুর বলল, "আসলে রাতে আমি মানা করেছি। একটু ক্লান্ত বোধ করছিলাম।"

"আহা! তা আগে বলবেন তো। আমার বাড়িতে কি কামলা মানুষের অভাব আছে নাকি! বললে তো কাউকে না কাউকে দিয়ে খাবার পাঠিয়ে দিতাম।"

"তেমন সমস্যা হয়নি। মুয়াজ্জিন সাহেব ভালোই খিচুড়ি রান্না করতে পারেন।"

ভূঁইয়া সাহেব কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, "ঠিক আছে। আমি লোক দিয়ে খাবার পাঠাব। এখন এসেছেন যেহেতু, নাশতা করে যান।"

হুজুর হেসে সম্মতি জানালেন। হুজুরের সম্মতিতে অবাক হলেন হাফেজ মিয়া।

"এই জনু, এদিকে এসো," রাস্তার দিকে হাত তুলে হাঁক দিল ভূঁইয়া সাহেব।

হাফেজ মিয়া সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন জনু কবিরাজ আসছে। গ্রামে ভূঁইয়া সাহেবের পর সবচেয়ে প্রতাপশালী জনু কবিরাজ। এখানেই বাড়ি ছিল কিন্তু দীর্ঘ

বারো বছর নিখোঁজ ছিল। বারো বছর পর হঠাৎ করেই হাজির হলো। সে বারো বছর বনেবাদাড়ে কাটিয়েছে, জিন বশ করেছে। তার কবিরাজির প্রসার দিনের পর দিন ছড়াতে লাগল। এখনও অনেক প্রসার। বয়স পঁয়তাল্লিশের গোড়ায়, উজ্জ্বল শ্যামলা গায়ের রং, উচ্চতা বেশি হবে না। লুঙ্গি নাভির নিচে পরে আছে তাই পেটটা সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে আছে। পেটটাকে একটা ঢোলের মতো লাগে। সামনের চুলগুলো পড়ে গিয়েছে, মুখের সামনের দুটো দাঁতও পড়ে গিয়েছে তাই কথা বলার সময় থুতু বের হয়ে আসে।

জনু কবিরাজ কাছে এসে বলল, "কাকা ঝামেলায় আছি, কী বলবেন বলুন।"

"এত দৌড়ের মধ্যে থাকলে হবে? গ্রামে নতুন হুজুর এসেছেন, পরিচিত হবে না?" ভূঁইয়া সাহেব হুজুরের দিকে ইশারা করে বলল, "এই হলেন নতুন ইমাম।"

কবিরাজ হুজুরের মুখোমুখি হলো। দুজন দুজনের দিকে অপার্থিবভাবে তাকিয়ে রইল। পরিবেশটা যেন ভারি হয়ে গেল। হাফেজ মিয়া কিছুই বুঝতে পারলেন না। অবশেষে জনু কবিরাজ হুজুরের থেকে চোখ সরিয়ে বলল, "হুজুরের নাম কী?"

হুজুর মুখ কঠিন করে জবাব দিলেন, "ইমরান।"

কবিরাজ আর কিছু বলল না। হুজুর হুট করে দাঁড়িয়ে বললেন, "ভূঁইয়া সাহেব, আমার একটু কাজ আছে। আপনি খাবারটা পাঠিয়ে দিয়েন।"

ভূঁইয়া সাহেব কিছু বলার আগেই হুজুর সালাম দিয়ে প্রস্থান করলেন। হাফেজও পিছু নিলেন। শুধু হতভম্বের মতো চেয়ে রইল ভূঁইয়া সাহেব। কবিরাজের ঠোঁটের কোণে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল।

ভূইয়া সাহেব কবিরাজকে বলল, "এত ছোটাছুটি কেন করছ?"

কবিরাজ ভূঁইয়া সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার একটা জিন কাল থেকে নিখোঁজ। তাকে পাচ্ছি না।"

ভূঁইয়া সাহেব বুঝতে পারল ব্যাপারটা। জনু কবিরাজ প্রায়শই ভয় দেখাতে এমন বলে। তবে ভূঁইয়া সাহেব জনু কবিরাজের ক্ষমতা সম্পর্কে জানে। জনু কবিরাজের একটি দোচালা টিনের ঘর। প্রতিদিন মাগরিবের পর জনু কবিরাজ সেই ঘরে ভোগ দেয়। ওই সময়টুকুতে জনু কবিরাজ ভূঁইয়া বাড়িতেই থাকে। এশার আজান কানে এলে সে তার বাড়িতে যায়। বান মারা, তাবিজ করা থেকে শুরু করে বশীকরণে জনু কবিরাজ ওস্তাদ।

"জনু, তোমাকে না বললাম আমার শরীর জ্বলে। সেজন্য কোনো পানি পড়া, তেল পড়া থাকলে দিও।"

"আজকে আসার সময় নিয়ে আসব। এখন আমি যাই। লোকজন বসে আছে।"

ভূঁইয়া সাহেব মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিল। জনু চলে গেল, ভূঁইয়া সাহেব জোরে নিঃশ্বাস ফেলল। জনু যখন আসে তখন কোনো এক অজানা কারণে বাতাস ভারী হয়ে থাকে। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। জনু চলে গেলেই সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যায়। ভয়ে জনুকে কিছু বলতেও পারে না ভূঁইয়া সাহেব।
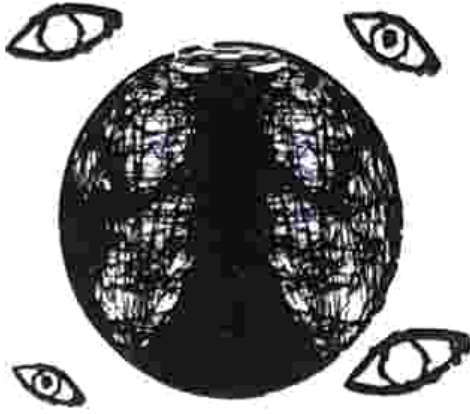
মৃদু বাতাসে জানালার পর্দাগুলো উড়ছে। দুপাশে কাশ্মীরি সিল্কের সাদা রঙের পাতলা পর্দা, সেগুলো ভেদ করে সকালের সূর্যালোক বল্লমের মতো ঘরের ভিতর প্রবেশ করছে। সেই আলোর খানিক ঝলকানি এসে তারিনের মুখে লাগতেই সে চোখ খুলল। একটু আগে জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে আসা মৃদু বাতাস এসে তাকে জানান দিয়েছিল যে সকাল হয়েছে, তবুও তারিন বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে ছিল, কারণ তার বিছানা ছেড়ে উঠতে ভালো লাগছে না।

আজ একদিনের জন্য সংসারের সমস্ত কাজ থেকে নিজেকে ছুটি দিতে ইচ্ছে হলো তার। ভারি ক্লান্তি লাগছে, সেই অর্ধপ্রহর আগে ঘুম ভাঙার পরও বিছানায় মুখে গুঁজে ছিল। না, আর থাকা যাবে না, সমস্ত কাজ থেকে ছুটি নেওয়া গেলেও মাহার দায়িত্ব থেকে নেওয়া যাবে না।

বাড়িতে একটি লোকও নেই মাহার দেখাশোনা করার জন্য। সাজেদ সকালে চলে যায় আর রাতে ফেরে। রফিক সকালে মাহাকে স্কুলে দিয়ে আসে, তারপর সেই সন্ধ্যায় সাজেদের সাথে বাসায় ফেরে, সারাদিন তারিন একাই বাসায় থাকে। মাহা ফিরলে মাহাকে নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এভাবে চক্রাকারে তারিনের দিনগুলো কেটে যাচ্ছে।

বিছানা থেকে উঠতেই প্রচণ্ড মাথাব্যথা অনুভব করল তারিন। মাথার দুই পাশ থেকে ব্যথা উঠে মাঝ বরাবর এসে শেষ হয়। একবার এরকম হওয়ার পর আবার শুরু হয়, আবার থেমে যায়, বারবার এমন হচ্ছে। সে ব্যথা সহ্য করতে না পেরে চোখ বন্ধ করে ফেলল। তার কোনো কালেই এমন মাথাব্যথা ছিল না, হঠাৎ করে এরকম ব্যথার কারণ সে বুঝতে পারল না। সে তার ডান হাত কপালের উপর রাখল, তাপমাত্রা ঠিক আছে, জ্বর আসেনি।

তাহলে মাথা এত ব্যথা করছে কেন? তারিন পায়ের আওয়াজ পেয়ে চোখ খুলল। দেখল মাহা এসে তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে মাহাকে দেখে

জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে ওড়না দিয়ে মুখের ঘাম মুছল। নিজের মেয়ে তাকে এই অবস্থায় দেখে ভয়ে দূরে চলে যাক তা সে কখনো চায় না।

মাহাকে ইশারা দিয়ে কাছে ডাকল। মাহা এসে তারিনের বিছানায় বসল। মাহাকে দেখা মাত্রই ব্যথা কমে গেল, সে বেশ অবাক হলো। একটু আগে মাথা ব্যথায় চোখ খোলা রাখতে পারছিল না, আর এখন কোন ব্যথাই নেই। সন্তান মায়ের সব অসুখের ওষুধ।

মাহাকে টেনে নিয়ে চুমু খেল সে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। কপালের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে মেয়ের দিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মাহার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল সে। মাহাও হেসে তার পাশ ঘেঁষে বসল।

তারিন মাহাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বলল, "আম্মু, কয়টা বাজে?"

মাহা হাত দিয়ে ইশারা করে বুঝিয়ে দিল নয়টা বাজে।

তারিন মাহাকে সরিয়ে উঠে বলল, "তোমার স্কুলের সময় চলে গেল, স্কুলে যাওনি কেন? রফিক চাচ্চু নিয়ে যায়নি?"

তারিনের কথা শুনে মাহা আবার মুচকি হাসি দিল। তারিন একটু চোখ সরু করে তাকিয়ে থাকল মাহার দিকে, মাহা এখনও হেসে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে কোনো মজার কাণ্ড ঘটেছে।

মাহাকে হাসতে দেখে তারিন চোখ বড় করে বলল, "হাসছ কেন?"

মাহা আবার হাত দিয়ে ইশারা করে বলল, "আজ শুক্রবার। স্কুল বন্ধ।"

তারিন ঠান্ডা হলো, না হয় মেয়ের উপর রেগে গিয়ে বকাঝকা করত। আজ যে শুক্রবার তা-ই ভুলে গিয়েছে সে। বিছানা থেকে কাঁথাটা তুলে গোছাতে লাগল। মাহা তারিনকে দেখছে, একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

মাহার দিকে তাকিয়ে তারিন জিজ্ঞেস করল, "তুমি এভাবে দেখছ কেন?"

মাহা ইশারা করে বলল, আয়নায় তারিনের মুখ দেখতে। মাহার এরকম কথায় তারিন ভ্যাবাচ্যাকা খেল। মাহা আবার বলল।

তারিন কিছু বুঝতে না পেরে বলল, "কেন?"

মাহা আবার আয়নার দিকে ইশারা করল। কাঁথাটা আধ গোছানো রেখেই আয়নার সামনে গেল তারিন। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজেকে দেখে সে অবাক হলো। নিজেকেই চিনতে পারল না। তার চোখের নিচে গাঢ় কালো দাগ পড়ে গিয়েছে। অনেকদিন না ঘুমালে যেরকম হয় ঠিক সেরকম। ঠোঁট দুটি ফুলে গিয়েছে, ঝুলে গিয়েছে আর কপালে চিকন ভাঁজ পড়ে গিয়েছে, মুখ অনেক ভারী দেখাচ্ছে।

তারিন দুই হাত দিয়ে মুখে হাত বুলাল। খানিক হাত বুলানোর পর আবার আয়নার দিকে তাকাল, আগে যেরকম ছিল সেরকমই, কোনো পরিবর্তন হয়নি। সে প্রচণ্ড রকমের ভয় পেল। নিজের বয়স যেন প্রায় এক যুগ বেড়ে গিয়েছে এক রাতের মধ্যে। নিজেকে আয়নায় দেখে চিনতে পারল না সে। আয়নায় দেখছে শেষ বয়সে পা দেওয়া কোনো এক মহিলাকে, যুবতির বদলে এক প্রৌঢ়া। তারিন আর সহ্য করতে পারল না। ভয় পেয়ে আয়নার সামনে থেকে বিছানার সামনে এলো। তার হৃৎপিণ্ডের গতি কয়েকগুণ বেড়ে গেল, শব্দ করে লাফাতে লাগল।

তারিন নিজের বাম হাত বুকের উপর রাখল। হাতের ছোঁয়া পেয়ে আস্তে আস্তে গতি কমল হৃৎপিণ্ডের। কাল রাতেও তো সব স্বাভাবিক ছিল। টানা গাল, প্রসারিত শুষ্ক কপাল, চিকন ঠোঁট। কিন্তু হঠাৎ এক রাতের মধ্যে এত দ্রুত এতকিছু কী করে ঘটল? সে ভাবল, নিশ্চয়ই সে ভুল দেখেছে, তবে আরেকবার আয়নার সামনে গিয়ে নিজের বীভৎস চেহারা দেখার সাহসও হলো না তার। কপালে হাত দিয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ।

সমস্ত চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মাহার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "নাশতা করেছ?"

মাহা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়াল। তারিন অবাক হলো কারণ বাড়িতে কোন কাজের বুয়া নেই যে নাশতা বানিয়ে দেবে। সে একাই রান্নাবান্না করে। মাহা বাইরের খাবার পছন্দ করে না, রফিক বাইরে থেকে খাবার এনে দিলেও খুব অপারগ না হলে খায় না। তাহলে কে বানিয়ে দিয়েছে?

"কে বানিয়েছে?" তারিন প্রশ্ন করল।

মাহা কিছু বলল না, মুচকি হাসল। মাহার ভাবভঙ্গি দেখে তারিন বিরক্ত হয়ে বলল, "বলো! কে বানিয়ে দিয়েছে সকালের নাশতা?"

মাহা কিছু না বলে এগিয়ে এসে তারিনের ডান হাত ধরল, বিছানা থেকে নেমে বাইরের দিকে যেতে লাগল। তারিনও মাহাকে অনুসরণ করল। মাহা রেলিংয়ের কাছে এসে আঙুল তুলে ইশারা করল হলরুমের দিকে। সে মাহার আঙুল অনুসরণ করে সামনে তাকিয়ে দেখল সাজেদ হলরুমে বসে মাথা নিচু করে পত্রিকা পড়ছে। তারিনের বুঝতে বাকি রইল না নাশতা কে তৈরি করে দিয়েছে।

তবুও তারিন মাহাকে প্রশ্ন করল, "বাবা বানিয়ে দিয়েছে?"

মাহা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়াল। কিছু না বলে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগল তারিন। ওড়নাটা ভালো করে মাথায় পেঁচিয়ে নিল সে। সে জানে না সাজেদের কী প্রতিক্রিয়া হবে তাকে দেখে। মাহাও পিছন পিছন নামতে লাগল। নিচে নেমেই দেখল সাজেদ ঝুঁকে এখনও খুব মনোযোগ দিয়ে পত্রিকা পড়ছে। দুজন যে

এসেছে সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। সাজেদকে কখনো নয়টার পর বাসায় পাওয়া যায় না, ছুটির দিনেও নয়, আজ তাকে বাসায় দেখে অবাক না হয়ে পারল না তারিন। তার উপর আবার মাহাকে নাশতা বানিয়ে খাইয়েছে। অনেকটা অবিশ্বাস্য লাগল তারিনের কাছে। এই সাংসারিক বছরগুলোতে এরকম সাজেদকে দেখেনি সে।

"গুড মর্নিং!" তারিন গলা খাঁকারি দিয়ে বলল।

সাজেদ পত্রিকা থেকে চোখ সরিয়ে বলল, "গুড মর্নিং!"

সাজেদ তারিনের দিকে তাকিয়ে একবার আবার পত্রিকায় মনোযোগ দিল। সে অবাক হলো, তার দিকে সাজেদের যেরকম দৃষ্টি দেওয়ার কথা সাজেদ সেরকমভাবে তাকায়নি, বরং এমনভাবে তাকিয়েছে যেন সব স্বাভাবিক। অথচ সাজেদের তার এই বীভৎস মুখ দেখে কিছু না কিছু বলার কথা। সে মাহার দিকে তাকিয়ে ইশারা করে প্রশ্ন করল, মুখ কি সকালের মতো, নাকি ঠিক হয়েছে। মাহা ইশারা করে জবাব দিল, আগের মতোই। সে কিছু না বলে সোফায় বসে পড়ল।

সাজেদ পত্রিকা থেকে চোখ তুলে তারিনের দিকে তাকাল। তারিনও চোখে চোখ রাখল, চোখাচোখি হলো ঠিকই কিন্তু কেউ কিছু বলল না। দুজনেই নীরব। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দুজনের দিকে। নিজেদের মধ্যে লুকানো একে অপরের জন্য ভালোবাসা খুঁজছিল দুজন, যা অনেক আগে হারিয়ে গিয়েছে, তবুও দুজন জানে মনের কোন গহিন কোণে এখনও সেই ভালোবাসা বেঁচে আছে।

দুজন কতক্ষণ এভাবে তাকিয়ে ছিল খেয়াল নেই। মাহার পায়ের শব্দে দুজন চোখ ফিরিয়ে নিল। তারিনকে রফিকের ব্যাপারটা বলবে কি না তা-ই ভাবছে সাজেদ। রাতে তারিনের সাথে যা ঘটেছে তা নিয়ে হয়তো তারিনের কোনো ধারণা নেই, থাকলে সে নিচে নেমেই এ ব্যাপারে বলত, তাই এ ব্যাপারে তারিনকে কিছু জিজ্ঞেস না করার সিদ্ধান্ত নিল সে। ঘুমের মধ্যে হয়তো কোনো দুঃস্বপ্ন দেখে এমন করেছিল সে। জানালে মেয়েটি শুধু দুশ্চিন্তা করবে। তবে রফিকের ব্যাপারটিও একটি অস্বাভাবিক এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা।

রফিকের মুখে তার সাথে ঘটে যাওয়া রাতের ঘটনা শুনে অবাক না হয়ে পারল না সাজেদ। সকালে জিজ্ঞেস করেছিল কী হয়েছিল। রফিক সমস্ত ঘটনা বলল। সে রফিকের কথা শুনে বাগানে গেল। বাগান প্রায় ভেসে গিয়েছে পানিতে, মাটি কাদা হয়ে গিয়েছে। বাগানের এপাশ থেকেই দেখে চলে আসে সে, সামনে আর যায়নি। সকাল হলে মাটি শুকালে যাবে ভেবেছিল তখন, কিন্তু এখন অবধি আর যাওয়া হয়নি। রফিককে পাঠিয়ে দিয়েছে মেকানিক আনতে। মোটর নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কার্বলিক এসিডও আনতে বলেছে। অনেকটা আষাঢ়ে গল্প বলেছে

রফিক। দাম দেয়নি সাজেদ। উল্টো একটি ধমক দিয়ে বলেছে, এ কথা যেন অন্য কারো কাছে না বলে।

যাইহোক, তারিনকে ডাক্তার দেখানো দরকার, সেজন্য এখন সাজেদের ইচ্ছে করছে তারিনের মুখ থেকে পুরো ব্যাপারটি জানতে কিন্তু সাজেদ চুপ হয়ে মাথা নিচু করে বসে আছে তার সামনে। একটা অস্বস্তি, তার সাথে জুড়েছে খানিক আড়ষ্টতা; দুটো মিলে সাজেদকে চুপ করে দিয়েছে।

সে হালকা পা নাচিয়ে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করল। তারিনের দিকে মুখ তুলে তাকাল। নীরবতা ভেঙে তারিনকে বলল, "কেমন বোধ করছ?"

তারিন অবাক হয়ে সাজেদের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাল। হঠাৎ এরকম প্রশ্ন কেন করল সাজেদ? তার শরীর খারাপ ছিল নাকি? সে তো সুস্থ ছিল গতকাল! তাহলে হঠাৎ এমন প্রশ্ন কেন করছে সাজেদ?

তারিন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "হঠাৎ এমন প্রশ্ন?"

এমন ধাক্কা খাবে সেটা কখনো ভাবেনি সাজেদ। রাতে যা ঘটেছে তা তো ভোলার মতো নয়। তারিনের স্মৃতিশক্তি বেশ ভালো। ছোট ছোট ঘটনা সে অনেকদিন ধরে মনে রাখতে পারে। আর সে নাকি কাল রাতের ঘটনা ভুলে আছে। মুখ হাঁ করে সাজেদ তারিনের দিকে তাকিয়ে রইল।

"কী হলো?" তারিন গভীর গলায় জিজ্ঞেস করল।

তারিনে কথা শুনে সাজেদ চোখ সরু করে বলল, "কাল রাতে তো তুমি অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলে।"

তারিন চমকে উঠে উত্তেজিত হয়ে বলল, "অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলাম? কখন? কী হয়েছিল আমার?"

সাজেদ তারিনের কথা শুনে মুখ হাঁ করে তারিনের দিকে তাকিয়ে রইল। আসলেই কিছুই মনে নেই মেয়েটির। কপাল কুঞ্চিত করে তারিনের দিকে তাকিয়ে রইল।

তারিন বিরক্ত হয়ে বলল, "কী হয়েছে? কিছু বলছ না যে?"

সাজেদ তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, "তোমার কিছু মনে নেই?"

তারিন উত্তেজিত হয়ে জবাব দিল, "না, কী হয়েছে তা তো বলবে!"

সাজেদ হতভম্ব হয়ে গেল তারিনের কথা শুনে। কাল রাতে এত কিছু ঘটে গেল অথচ তার কিছুই মনে নেই, তারিনের মতো মেয়ের এরকম কিছু ভুলে যাওয়ার মানে হয় না। সে কি তাহলে ঘুমের মধ্যে এসব করেছিল? হতে পারে। তাহলে তারিনকে না বলাই ভালো ছিল। কেন যে জানতে গেল! জিজ্ঞেস না

করলে এত তালগোল পাকিয়ে যেত না। যাইহোক, আর বেশি বললে শুধু শুধু চিন্তা করবে।

যথাসম্ভব স্বাভাবিক হয়ে সাজেদ বলল, "নাশতা বানাবে না?"

প্রসঙ্গ বদলানোর জন্য সাজেদ এ কথা বলল। তারিন কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। যার দরুন তারিনের মুখে বিরক্তির ছাপটা সরে সাধারণ ভাব ফুটে উঠল। তারিন হেসে বলল, "কী খাবে?"

সাজেদ বলল, "যা দাও তাই খাব।"

তারিন সাজেদের কথা শুনে উঠে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। সাজেদ চোখ নামাবে এমন সময় দেখল মাহা সিঁড়িতে বসে আছে। মাহার চোখে চোখ পড়তেই মাহা মুচকি হাসল। সেও মুচকি হেসে আবার পত্রিকার দিকে চোখ দিল। সব দ্বিধা ফেলে দিয়ে পত্রিকা পড়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করতে লাগল।
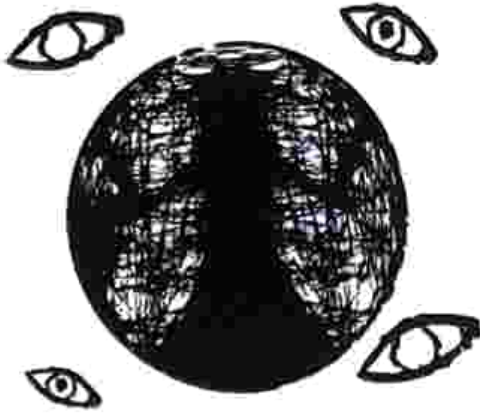
ভেজা লুঙ্গিটা শুকানোর জন্য বাঁশের উপর দিতে দিতে হাফেজ মিয়া হুজুরকে আড়চোখে দেখছেন। হুজুর বারান্দায় একটা মাদুরে বসে কুরআন মজিদ নিয়ে সেই সকাল থেকে একটানা পড়ে যাচ্ছেন। সকালে ভূঁইয়া বাড়ি থেকে একজন খাবার দিয়ে গিয়েছে, হুজুর তা ছুঁয়েও দেখেননি এখন পর্যন্ত। হাফেজ মিয়া বুঝতে পারছেন না হুজুরের জন্য রান্না করবেন কি না।

লুঙ্গিটা নেড়ে দিয়ে ঘরে ঢুকতে যাবে ঠিক এমন সময় হুজুর বললেন, "আমি রান্না করে রেখেছি। রান্নার চিন্তা করতে হবে না আপনাকে।"

হাফেজ মিয়া হতভম্ব হয়ে গেলেন। পুকুরে গিয়েছে বড়জোর বিশ মিনিট হবে। বিশ মিনিটের মধ্যে হুজুর কী রান্না করলেন! হাফেজ মিয়া মুখে একরাশ বিস্ময় নিয়ে হুজুরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। হুজুর কুরআন মজিদ বন্ধ করে মাদুর ভাঁজ করে নিলেন।

তারপর হাফেজ মিয়ার কাছে এসে বললেন, "আপনার এখানে যে ডিম ছিল তা-ই রান্না করেছি আর আমি বাজার থেকে মুরগি কিনে নিয়ে এসেছি সাথে এক সের মিষ্টি।"

দ্বিতীয় দফা অবাক হলেন হাফেজ মিয়া। এখান থেকে হাট প্রায় চার ক্রোশ দূরে। হাটে যেতে লাগে এক ঘণ্টার মতো। সেখান থেকে বাজার করে ফিরতে যে কারও ন্যূনতম এক ঘণ্টার উপর লাগবে। কিন্তু এত দ্রুত সময়ে হুজুর বাজার করে কী করে এলেন!

তিনি মুখ হাঁ করে জিজ্ঞেস করলেন, "হাটে গেলেন কখন?"

"আপনি যখন পুকুরে গেলেন তখন।"

"হাট তো মেলা দূর। আমি গোসল করে আসার মধ্যে আপনি সব নিয়ে এসে রান্না করলেন কীভাবে?"

হুজুর কিছু বললেন না। মুচকি হেসে ভিতরে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে মাদুরটা দরজার কাছে রেখে গেলেন। ভিতরে গিয়ে দুটো সানকি আর একটি জগ নিয়ে এসে বললেন, "মাদুর বিছান। খেয়ে নামাজ পড়তে যাব।"

হাফেজ মিয়া হুজুরের কথামতো কাজ করলেন। হুজুর মাদুরে জগ আর সানকিগুলো রেখে আবার ভিতরে ঢুকলেন। এবার দুটো পাতিল নিয়ে এলেন। একটি ভাতের পাতিল, আরেকটি কীসের তা বোঝা গেল না। আবার ভিতরে গিয়ে একটি কড়াই নিয়ে এলেন।

হুজুর মাদুরে বসে ইশারা করলেন বসতে। হাফেজ মিয়া বসে পড়লেন। হুজুর পাতিলগুলোর মুখ থেকে ঢাকনা সরিয়ে দিলেন। একটাতে ভাত, একটাতে মিষ্টি দেখা গেল। সানকি নিয়ে ভাত দিলেন হাফেজ মিয়াকে। কড়াইটা এগিয়ে দিতেই হাফেজ মিয়া দেখলেন কড়াইয়ে মুরগি আর ডিম একসাথে রান্না করা।

হুজুর নিজের সানকিতে ভাত নিতে নিতে বললেন, "খান, এই রান্না আমি শিখেছি মাদরাসা থেকে।"

হাফেজ মিয়া এক টুকরো মুরগি নিলেন। ভাত দিয়ে মেখে একটু মুরগি মুখে দিতেই কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গেল। এত সুস্বাদু তরকারি এই জীবনে আর খাননি তিনি। চামচ দিয়ে কয়েক টুকরো মুরগি তুলে নিয়ে খেতে লাগলেন। হুজুরও খেলেন। দুজনেই ভরপেট খেলেন।

হুজুর মিষ্টি এগিয়ে দিয়ে বলল, "রসগোল্লা আমার ভালো লাগে না তাই মিষ্টি নিয়ে এলাম।"

হাফেজ মিয়া দুটি মিষ্টি বের করে সানকিতে রাখলেন। হুজুর হাঁড়ি উপুড় করে সানকিতে মিষ্টি ঢাললেন। হাফেজ মিয়া একটা মুখে দিতেই যেন তার পেট ভরে গেল। অপরদিকে হুজুর একের পর এক মিষ্টি টপাটপ মুখের মধ্যে চালান করে দিলেন। তিনি অবাক হয়ে হুজুরের মিষ্টি খাওয়া দেখতে লাগলেন।

হুজুর খাবার শেষ করে সানকি চাটতে চাটতে বললেন, "রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীসের কথা মনে পড়ে গেল।"

হাফেজ মিয়া হাত ধুতে ধুতে বললেন, "কোন হাদীস?"

হুজুর সানকি নামিয়ে বলল, "একবার এক কাফির রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তার ভীষণ ক্ষুধা পেল। সে ক্ষুধায় অস্থির হয়ে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেল। সে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে খাবার চাইতেই রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে একটি বকরির দুধ দুইয়ে তাকে দিলেন। তা শেষ করে সে বলল তার ক্ষুধা মেটেনি। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরেকটি বকরির

দুধ দিলেন। তারপরও তার ক্ষুধা মিটল না। এভাবে পরপর সাতটি বকরির দুধ পান করে সে সন্তুষ্ট হয় এবং রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তিনি আবার কিছুদিন পর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসেন। তখন রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একটি বকরির দুধ খেতে দেন। তিনি এক পেয়ালা দুধও পুরোটা খেতে পারলেন না। তখন রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হেসে বললেন, 'মুশরিক খায় সাত পেটে আর মুমিন খায় এক পেটে।"

হাফেজ মিয়া হাদীসের কথা শুনে একটু ভয় পেলেন। বেশি আহার মুমিনের লক্ষণ নয় তাহলে। হুজুর হাফেজ মিয়ার মনের ভাব টের পেয়ে হেসে বললেন, "ভয় পাবেন না। উপরোক্ত হাদীস দিয়ে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমিনদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকাকে নির্দেশ করেছেন। মুমিনের অন্তর এবং শরীর সবসময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার রহমত দিয়ে পূর্ণ থাকে যার ফলে সে অল্পতেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার প্রতি সন্তুষ্ট হয়।"

হাদীস শুনে যেন হাফেজ মিয়ার চোখে পানি এসে গেল। আহারে! গ্রামের মানুষগুলো এখনও বোঝে না। বুকে বড় আক্ষেপ নিয়ে হাফেজ মিয়া বললেন, "আল্লাহ! এই গ্রামের মানুষগুলোকে হিদায়াত দিন।"

"গ্রামে কোনো শয়তানি কাজকারবার থাকলে তাকে ঠিক করুন, দেখবেন এমনিই ঝামেলা মিটে গিয়েছে।"

হাফেজ মিয়া কিছু বলার আগেই হুজুর উঠে চলে গেলেন। হাফেজ মিয়া এরকম আরেকজন হুজুরের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলেন। যার সান্নিধ্যে এসে জীবনের সব উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছেড়ে রবের কাছে সমর্পণের সিদ্ধান্ত নেন। সেই মানুষটা ছিলেন সরফরাজ আলী। বিক্রমপুর মাদরাসার হুজুর। তার যোগ্য ছাত্রই এই হুজুর, তাই তো কম বয়সে কত জ্ঞানগর্ভ কথা বলছেন।
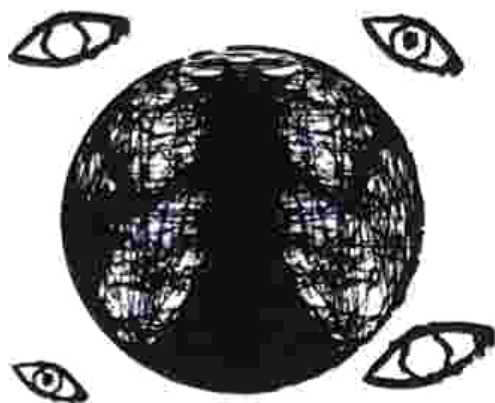
সন্ধ্যা হতে বেশি দেরি নেই। তারিনের আজ সারাদিনের নামাজ পড়া হয়নি, ব্যস্ততায় ডুবে ছিল সারাদিন। ফজরের সময় ঘুম থেকে উঠতে পারেনি, দুপুরে কাজে ব্যস্ত থাকায় যোহর পড়তে পারেনি আর এখন এই শেষবেলায় আছর পড়ছে। চোখে ঘুম জড়িয়ে চোখ দুটো টেনে রাখতে কষ্ট হচ্ছে তার। সারাদিন আর আয়নার সামনে যায়নি। নিজের বীভৎস মুখ দ্বিতীয়বার দেখার সাহস হয়নি, কিন্তু তার কাছে সবচেয়ে অদ্ভুত যা লাগল তা হলো সারাদিনে সাজেদ কিংবা রফিক একবারও তারিনের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলেনি। অথচ মাহা প্রত্যেকবার ইশারা দিয়ে তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে।

সাজেদ আজ অনেকদিন পর দুপুরে বাসায় খেয়েছে। সকালেই বলে দিয়েছিল দুপুরে এখানে খাবে, তারিন সেজন্য অনেক কিছু রেঁধেছে, তাই অন্যান্য দিন থেকে আজকে একটু বেশিই ব্যস্ত ছিল। চ্যাপা শুঁটকি ভুনা, বেগুন ও শুঁটকি, মুরগি, গরুর কালাভুনা আর ঝাল ফ্রাই, চিংড়ি-সবজি রেঁধেছিল। সবই সাজেদের প্রিয় খাবার।

সাজেদ দুপুরে খেয়ে বের হয়ে গেল রফিককে নিয়ে। এখন সমস্ত বাড়িতে শুধু তারিন একা। সাধারণত একা সময় সে বই পড়ে পার করে, কিন্তু সকালে মাথাব্যথার কথা মনে পড়তেই মাথা থেকে বই পড়ার চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দেয়। দুপুরে সব কাজ শেষ করে মাহাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে আসল। ভেবেছিল বিকেলে নিজে একটু ঘুমাবে তাই বিছানায় অনেকক্ষণ গড়াগড়ি করল ঠিকই কিন্তু চোখে ঘুম আসল না। মন বারবার বিক্ষিপ্ত চিন্তায় ডুবে গেল।

তারিন বিছানা ছেড়ে ছাদে চলে আসল। অনেকদিন, প্রায় দুই-তিন মাস পর ছাদে এলো সে। ছাদে তেমন ওঠা হয় না, শেষ কবে বাইরে ঘুরতে বের হয়েছিল তা-ই তারিনের মনে নেই। এই বাড়িটিই সব। সে এখানেই নিজেকে বন্দি করে

নিয়েছে। ছাদে তেমন একটা কাজ পড়ে না তারিনের। আজ বিকেলে বিছানায় আর সময় কাটছিল না তাই ছাদে চলে এসেছে।

ছাদে উঠে তারিনের প্রথমে চোখে পড়ল মাটির খালি টবগুলোর দিকে। ভাঙা, পুরানো লাল রঙের মাটির টব ছড়িয়ে আছে ছাদে। কিছু কিছু টবের গা বেয়ে গড়ে উঠেছে ছোট ছোট ঘাস, কিছু মস। টবের মধ্যে থাকা মাটিগুলো হয়তো বৃষ্টিতে ধুয়ে গিয়েছে, কিন্তু একসময় এই টবে বড় হওয়া প্রাণগুলোকে একদম নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেনি। টবের আশেপাশে ছোট ছোট ঘাসগুলো যেন তার প্রমাণ। এই টবগুলোর সাথে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে তারিনের।

তারিনের বিয়ের প্রথম বছরে সে এগুলো কিনে নিয়ে এসেছিল। সাজেদ এই সময় তার দল নিয়ে ব্যস্ত থাকত, সময় থাকত না তার জন্য। সে সারা বাড়িতে একাই হেঁটে বেড়াত, অনেক বিরক্তি লাগত তার, সময় পার করার জন্য একদিন ধরে বসে সাজেদকে। সাজেদ বুদ্ধি দিল টবে গাছ লাগাতে, তারপর পরিচর্যা করতে, তাহলে আর বিরক্ত বোধ করবে না। সাজেদের কথা শুনল সে, দুজনেই চলে গেল নিউমার্কেটে, সেখান থেকে টব কিনে নিয়ে আসল। তারপর গ্রিনরোড থেকে বনসাই কিনে এনে লাগাল সে।

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নামাজ পড়ে তারিন ছাদে আসত, গাছগুলোকে দেখত, পরিচর্যা করত। আবার আছর নামাজ পড়ে চলে আসত ছাদে, গাছগুলোর যত্ন নিতে নিতে সন্ধে হয়ে যেত তার।

দিনের শুরু হতো গাছে পানি দিয়ে, তারপর সকালের নাশতা বানাত। নাশতা খেয়ে বাইরে চলে যেত সাজেদ। বিয়ের প্রথম কয়েক বছর সে বাসায় খেত। যেখানেই থাকত, তারিনের সাথে এসে খেত। কিন্তু সবকিছু হঠাৎ করে বদলে যায়। একটি মৃত্যু তারিনের জীবনকে ১৮০ ডিগ্রি পালটে দেয়।

বিয়ের কয়েক মাস পর তারিন জানতে পারে সে মা হতে চলেছে। সাজেদকে যখন জানায়, সাজেদ খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়ে। সমস্ত কাজ রেখে সারাদিন বাসায় তার সাথে থাকত, তার যত্ন করত, এমনকি তার বাবাও সময় পেলে তার কাছে কাছে থাকত। স্বামী আর বাবার অতিরিক্ত ভালোবাসায় প্রায় বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল সে, কিন্তু হঠাৎ করে কেমন যেন সবকিছু বদলে গেল, কালো এক ছায়া নেমে আসল তার জীবনে।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে তারিন দেখতে পেল বিছানা ভিজে আছে। সে নিজের ডান হাত বিছানার চাদরের উপর রাখল। ভেজা ভেজা লাগছিল তার হাত। সে বিছানা থেকে হাতটা তুলে এনে নিজের চোখের সামনে ধরল। দেখতে পেল হাত পুরোটা লাল।

একটু পর বুঝতে পারল সমস্ত বিছানা রক্তে ভিজে আছে। ভীষণ ভয় পেল সে। কলিজা মোচড় দিয়ে উঠল তার। চিৎকার করে সাজেদকে ঘুম থেকে তুলল। তারপর সে নিজের তলপেটের দিকে তাকাতেই অজ্ঞান হয়ে গেল। যখন জ্ঞান ফিরল তখন নিজেকে হাসপাতালে আবিষ্কার করল সে। তারিন জানতে পারল তার মিসক্যারিজ হয়েছে। কী কারণে হয়েছে তা ডাক্তার বলতে পারেনি। সে ঘটনার পর থেকে সব বদলে গেল। মুহূর্তেই জাহান্নাম হয়ে গেল তার জীবন।

সাজেদ দূরে সরে গেল। দুজন দুজন থেকে এতটাই দূরে সরে গেল যে, এখন চাইলেও দুজন কাছে আসতে পারবে না। সারাদিন সাজেদ ব্যস্ত থাকল নিজের পার্টি নিয়ে, তারপর সে নির্বাচনে জয়ী হলো, এমপি নির্বাচিত হলো যার ফলশ্রুতিতে আরও দূরে চলে গেল। এখন সে মন্ত্রিসভায় শ্বশুরের ছায়া হয়ে থাকে। অবসর সময়ে ছুটাছুটি করে ব্যবসা নিয়ে।

সমস্ত কিছু তারিন থেকে সরে গেল, নিজেকে চার দেওয়ালের মধ্যে গুটিয়ে নিল সে। এছাড়া আর তেমন উপায় ও ছিলো না। সারাদিন বসে বসে বই পড়ত, পুরানো কিছু চিঠি ছিল সেগুলো দেখত, সময় করে ছাদে এসে বস্তির মানুষগুলোকে দেখত। দীর্ঘশ্বাস আর চাপা কষ্ট ছিলো তার জীবনজুড়ে।

তারপর মাহা আসল তারিনের জীবনে। আবার সবকিছু বদলে গেল। তার শূন্য অন্ধকার জগতের একমাত্র আলো মাহা। তাকে আঁকড়ে ধরে সে বেঁচে আছে, মাহা যদি না থাকত তাহলে তার কী হতো সেটা সে কল্পনাও করতে পারে না। হয়ত সুইসাইড করতো বা তার জায়গা হতো গারদে।

ছাদে আসতেই তারিনের শরীরে একটি দমকা বাতাস এসে লাগল। বাতাস এত জোরে এসে লাগল যে তার মাথার ওড়নাটা উড়ে কয়েক হাত দূরে গিয়ে পড়ল। অবাক হলো সে। হঠাৎ করে এত দমকা হাওয়া আসল যে সে নিজেকে সামলাতে পারল না। তবে যে বাতাস বইছিল তা মৃদু বাতাস, ওড়না উড়িয়ে নেওয়ার মতো শক্তিশালী না। সে আর ওড়নাটা তুলল না। ওড়নাটা পড়ে রইল জীর্ণশীর্ণ আধভাঙা একটি টবের উপর।

তারিন কিছুক্ষণ ওড়নাটার দিকে তাকিয়ে থেকে চুলের বাঁধন ছেড়ে ছাদের রেলিংয়ের পাশে এসে দাঁড়াল। রেলিং থেকে বাড়ির পিছনটা দেখা যায়। সেখানে ছোটখাটো একটি বস্তি, অনেক নোংরা, দুর্গন্ধ ভেসে আসছে সেখান থেকে। লাইন ধরে ছোট ছোট কাপড়ের তাঁবু, তাঁবুর মুখে আবার কাপড় দিয়ে বন্ধ করা। তারিন রেলিংয়ে নিজের দুহাত দিয়ে শক্ত করে ধরে নিজের দেহটাকে একটু এলিয়ে দিল বাইরের দিকে।

সে অনেকগুলো ছোট ছেলেমেয়েকে দেখতে পেল। তারা তাঁবুর সামনে খোলা জায়গায় খেলাধুলা করছে। কারো পরনে আবার কাপড় নেই, একদম

উলঙ্গ, তারা এই অবস্থায় ছোটাছুটি করছে। এদের ছোটাছুটিতে ধুলোবালি উড়ছে, যার ফলে সবকিছু ঠিকভাবে দেখা যাচ্ছে না। তারিনের অনেক হাসি পেল। জোরে শব্দ করে একা একা হাসতে লাগল সে। বাচ্চাগুলোর পাশে কিছু মহিলা গোল হয়ে বসে ছিল।

তারিনের চোখ পড়ল ওই মহিলাদের উপর। গায়ে ছেঁড়া শাড়ি, উশকোখুশকো চুল যেন তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়ে আছে। মনে হচ্ছে গল্পগুজব করছে। মাঝেমধ্যে হেসে একজন আরেকজনের উপর লুটিয়ে পড়ছে। তারিন ওদের দিকেই তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। এই প্রাসাদসম বাড়িতে থেকেও, সকল সুযোগ-সুবিধা পেয়েও তারিন থেকে তাদের বেশি সুখী মনে হচ্ছে। মনের গহিন কোণে একটু ঈর্ষা উঁকি দিল তার।

পশ্চিম আকাশের সূর্যের আভা এসে তারিনের চোখে লাগল। সে মুখ ফেরাল সূর্যের দিকে। সূর্য লাল হয়ে আছে, কতদিন এই লাল সূর্য দেখা হয়নি তার। শেষ দেখেছিল প্রায় দশ বছর আগে। তার সবচেয়ে প্রিয় মানুষটির হাত ধরে সেন্ট্রাল লাইব্রেরির ছাদ থেকে। স্মৃতি দৌড়ে দশ বছর আগে যেতে চাচ্ছিল কিন্তু তারিন স্মৃতিকে সেদিকে যেতে দিল না। কষ্ট করে আটকে রাখল।

সে চায় না অতীতে হারিয়ে যেতে। সেই স্মৃতিগুলোতে ফিরে যেতে চায় না, যে স্মৃতিতে আটকে আছে আরেক তারিন। এত বছর হয়ে গেল, মানুষটা কেমন আছে তা জানে না সে, জানতে ইচ্ছেও করে না। জানতে গেলে হয়তো নিজের মন আবার ক্ষতবিক্ষত হবে। তাকে ভুলতে চায় সে, একেবারে ভুলতে চায়।

অথচ এমন এক সময় ছিল যখন মানুষটিকে একদিন না দেখে থাকতে পারত না তারিন। একদিন না দেখলে পরের দিন হলের সামনে গিয়ে বসে থাকত। দিনের পর দিন নিখোঁজ থাকত মানুষটা। তার অভিমান জমত। অভিমান জমতে জমতে পাহাড় হয়ে যেত কিন্তু মানুষটা যখন মুখে হাসি নিয়ে তার সামনে আসত, তার সমস্ত অভিমান বরফের মতো গলে যেত। অথচ সেই মানুষটাকে ভুলে আছে তারিন। মানুষের মন কী অদ্ভুত! যার জন্য একসময় এই মন হু হু করে কেঁদে উঠত আর আজ সময়ের ব্যবধানে এই মন একটি বারও সেই মানুষটাকে মনে করতে চাচ্ছে না।

"মা!" হঠাৎ করে এই আওয়াজ শুনে চমকে উঠল তারিন।

ছাদ থেকে নিচে পড়েই যাচ্ছিল, কোনোমতে রেলিং ধরে নিজেকে সামলে নিল। ভয় পেয়ে হৃৎপিণ্ড টেনিস বলের মতো লাফাতে লাগল। পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছে! তারিন নিজেকে সামলিয়ে সাথে সাথে পিছন ফিরে তাকাল। কেউ নেই। তার চোখের সামনে শূন্য ছাদ ফুটে উঠল। ভাঙা টবগুলো আর নিজের হলুদ রঙের ওড়নাটি ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না সে।

তাহলে কে ডাক দিল 'মা' বলে?

গলার স্বর কত সুন্দর! তারিন এরকম চিকন মিহি গলার শব্দ আর শোনেনি। স্বরটার মধ্যে কেমন যেন মাদকতা আছে, সেই মাদকতায় উতলা হয়ে গেল তার মন। সে তন্নতন্ন করে ছাদের সমস্ত কোণা খুঁজল। তার চোখ ছুটে গেল ছাদের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে, কেউ নেই, কোথাও কেউ নেই। পুরো ছাদ জুড়ে একমাত্র মানুষ শুধুই সে। সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল। না, সিঁড়িতেও কেউ নেই। তার মন হঠাৎ করে চঞ্চল হয়ে উঠল।

দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামল তারিন। দোতলায় বারান্দায় এসে দেখল। এপাশ-ওপাশ ঘাড় ফেরাল কয়েকবার। কেউ নেই। করিডর একদম ফাঁকা। তারপর হলরুমে তাকাল, সেখানেও কেউ নেই, তাহলে কে 'মা' বলে ডাক দিয়েছে? কে তারিনের জ্বলতে থাকা মন শান্ত করে দিয়েছে? মাহা! না, সে কী করে ডাক দেবে? সে তো কথা বলতে পারে না। মাহার কথা মনে পড়তেই সে দৌড়ে গেল মাহার রুমের দিকে।

মাহার রুমের দরজা বরাবরের মতো আংশিক খোলা। তারিন দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। মাহার রুমের জানালায় পর্দা টাঙানো, পর্দা ঠেলে বেশি আলো প্রবেশ করতে পারে না রুমে, তবে দিনের বেলায় যেটুকু আলো প্রবেশ করে তাতে সমস্ত কিছু স্পষ্ট বোঝা যায়। সে দেখল মাহা শুয়ে আছে বিছানায়। হাতদুটো বুকের উপর নিয়ে ঘুমিয়ে আছে মেয়েটি। কী মায়াবী লাগছে মাহাকে! তারিন লোভ সামলাতে পারল না, কাছে গিয়ে কপালে চুমু খেল, চুমু খেয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে মেয়ের পাশে শুয়ে থাকল।

আজ মাহার ঘুমানোর কথা নয়। যেদিন মাহার শিক্ষক মাহাকে পড়াতে আসে না সেদিন মাহা তারিনের সাথে খেলে। মাঝেমধ্যে সে মাহাকে নিয়ে বাইরে বের হয়, লনে গিয়ে একটু ছোটাছুটি করে, বাগানের গাছগুলোতে পানি দেয়। কিন্তু আজ বিকেলে, মাহাকে নিয়ে শুতেই মাহা ঘুমিয়ে পড়ল। মেয়েকে আর ডেকে তোলার ইচ্ছে হলো না তার। শুধু মনে এখন খোঁচা দিয়ে উঠছে 'মা' শব্দটি।

কে ডাক দিল এত সুন্দর করে?

শব্দটি যেন এখনও তারিনের কানে বাজছে। সে নিশ্চয়ই ভুল শুনেছে। তার মন সবসময় মাহার মুখে একবার 'মা' ডাক শোনার জন্য ছটফট করে। সেই ছটফটানির জন্য হয়তো সে ভুল শুনতে পেয়েছে। সে সমস্ত চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মাহাকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। দূর থেকে আজানের শব্দ ভেসে আসল ঠিকই কিন্তু তারিন নামাজ পড়তে উঠল না। তলিয়ে রইল ঘুমে।
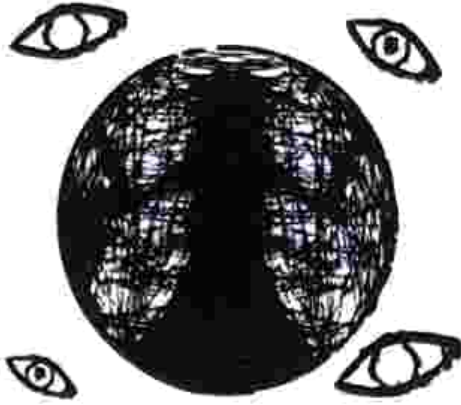
সারাদিন ব্যস্ত ছিল সাজেদ। অনেক বড় ধকল গিয়েছে তার উপর দিয়ে, সরকার চাচ্ছে চীনের সাথে ভালো সম্পর্ক স্থাপন করতে, তাই কিছু পলিসি তৈরি করতে হয়েছে। প্রেসিডেন্টের হত্যাকাণ্ডের প্রায় অনেক বছর পার হয়ে গিয়েছে। প্রেসিডেন্ট মোটামুটি এখন স্থিতিশীল অবস্থায় আছে তবুও কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপের উৎপাত দেখা যাচ্ছে, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সাজেদ নিজেও জানে এখানে বাম সংগঠনগুলো কত শক্তিশালী, সাথে তো মূল ধারার কিছু দল আছেই, এই ছাত্র সংগঠনগুলো ভেজাল করছে। বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে যখন-তখন।

প্রেসিডেন্ট গোয়েন্দা নিয়োগ দিয়েছে ক্যাম্পাসে। তাতে তেমন লাভ হবে না। এরা ছাত্র সংগঠন। পাকিস্তানের বাঘা বাঘা গোয়েন্দাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে যারা কাজকর্ম চালিয়ে গিয়েছে তাদের কাছে তো বাঙালি পাঁতি গোয়েন্দারা তো নস্যি। গোয়েন্দা দিয়ে তথ্য আনলে কী হবে! পুলিশ তো ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারবে না। তা প্রায় অসম্ভব, কারণ সেখানে ঢুকলেই রক্তপাত ঘটবে। এসব ঝামেলা আজকে হট টপিক ছিল মিটিংয়ের। সাজেদকে পরিস্থিতি সামলানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

গাড়ি অন্ধকারের মধ্যে বাসার গেটের সামনে এসে থামল। গাড়িটি সাজেদের শ্বশুরের। তার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে এখনও গাড়ি কেনেনি। শ্বশুরের গাড়িতে করেই সে প্রতিদিন সংসদ ভবন থেকে বাড়ি পর্যন্ত আসে। তার পাশে রফিক বসে আছে। রফিককে সকালের ব্যাপারে আর কিছু জিজ্ঞেস করা হয়নি। তাছাড়া সে নিজে গিয়েও দেখতে পারেনি আসলে কী হয়েছে। ব্যাপারটি স্বচক্ষে দেখা দরকার। রফিকের কথায় এক বিন্দুও বিশ্বাস হয় না তার। সকালে দেখবে দেখবে করেও দেখা হলো না, আর এখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে, দেখা সম্ভব না।

ড্রাইভার এসে দরজা খুলতেই নেমে পড়ল সাজেদ। সে নামার পর রফিকও নামল। বাড়ির গেট খোলা থাকে, সবাই জানে এটি এমপির বাড়ি, তাই কেউ এখানে কিছু করতে সাহস করে না। সে চাইলে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারে। পুলিশ কেন, আর্মিকে দিয়ে পাহারা দিতে পারে নিজের বাড়ি। কিন্তু তারিন চায় না, সে কাজের বুয়া পর্যন্ত রাখেনি, সেখানে কোনো পাহারার ব্যবস্থা করলে রাগে ফেটে পড়বে তারিন। সেই ভয়ে এত দিন পর্যন্ত কোনো পাহারার ব্যবস্থা করেনি সে।

রফিক টর্চ ধরে সামনে এগোচ্ছে, পিছন পিছন সাজেদ। রফিক গেট পার হয়ে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করল। সাজেদ গেট পার হয়ে নিজের ডান পা সামনে রাখবে, ঠিক এমন সময় আচমকা এক দমকা বাতাস এসে তার উপর দিয়ে বয়ে গেল। সে এক পা মাটিতে রেখে, আরেক পা শূন্যে তুলে স্থির হয়ে রইল। কী হলো কিছুই বুঝতে পারল না। নিজের দ্বিতীয় পা আর বাড়ির ভিতর নিতে সাহস হলো না। বাতাসটি ছিল গরম, আগুনের ঝাপটার মতো এসে তার গায়ে লেগেছে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করল সে। তেমন বাতাস বইছে না কোনো দিক থেকে। তাহলে হঠাৎ দমকা বাতাস কোত্থেকে এলো?

কিন্তু হঠাৎ এখন ঠান্ডা লাগছে, এত ঠান্ডা লাগারও কথা নয়। শরৎ চলছে। সবে বর্ষা শেষ হলো। বর্ষার পর ঠান্ডা লাগে কিন্তু এত ঠান্ডা লাগবে সেটা কখনো ভাবতে পারেনি সাজেদ। সে রীতিমতো কাঁপছে। নিজের দুই হাত জড়িয়ে নিল নিজের বুকে। রফিক টর্চ নিয়ে অনেক দূরে, প্রায় বাসার দরজার সামনে চলে গিয়েছে। তার সামনে সবকিছু অন্ধকার, দূরে শুধু টর্চের আলো দেখতে পারছে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। নিজের বাড়ি হলেও সে এখন ঠাহর করতে পারছে না কোন দিকে যাবে।

নিশ্চয়ই অমাবস্যা চলছে। তা না হলে এত অন্ধকার হওয়ার কথা নয়। অন্ধকার এত গভীর যে পোর্চের আলোও এই অন্ধকার পেরিয়ে সাজেদের কাছে আসতে পারছে না। দূরে শুধু মিটমিট করা আলো দেখতে পাচ্ছে সে, রাস্তার কিছুই দেখতে পারছে না।

সাজেদ তাই হাঁক দিল, "এই রফিক!"

রফিক কিছু না বলে সাজেদের দিকে টর্চ মারল। একদম চোখের বরাবর টর্চ মারল সে। সাজেদ চোখ বুজে রইল কয়েক সেকেন্ডের জন্য। কয়েক সেকেন্ড পর টর্চ বন্ধ করে দিল রফিক। সমস্ত কিছু আবার অন্ধকার হয়ে গেল। রফিক এদিকে এগিয়ে আসছে, নাকি আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, কিছুই বুঝতে পারছে না সে। নিস্তব্ধ হয়ে আছে সমস্ত কিছু।

সাজেদ আবার হাঁক দিল, "রফিক!"

কোনো জবাব এলো না, সবকিছু যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেল, শুধু নিস্তব্ধতায় যোগ হলো সাজেদের নিজের গলার স্বর। সে বিরক্ত হয়ে গেল, বিরক্ত হওয়ারই কথা। এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে আর এদিকে রফিকের কোনো খবর নেই।

সাজেদ এবার কর্কশ গলায় ডাক দিল, "এই রফিক! কী হয়েছে?"

সাজেদের ডাক দেওয়ার কিছুক্ষণ পর রফিক টর্চ জ্বালাল। এবার তার চোখ বরাবর ধরল না, নিচে মাটির দিকে ধরল। লনের মাঝখান দিয়ে যাওয়া সরু রাস্তাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল বেশ। মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে রফিকের সামনে আসল সে। সামনে আসতেই রফিক আবার টর্চ বন্ধ করে দিল।

সাজেদ এবার রাগী স্বরে বলল, "কী হয়েছে তোমার? এরকম করছ কেন?"

রফিক ঠান্ডা স্বরে জবাব দিল, "আগে ভিতরে চলো।"

রফিকের গলার স্বর শুনে চমকে উঠল সাজেদ। রফিকের গলা কোনোদিন এমন ছিল না। রফিকের এত ঠান্ডা আওয়াজ কোনোদিন শোনেনি সে, বরাবর রফিক বড় গলায় কথা বলতে পছন্দ করে। নিশ্চয়ই কোনো কিছু হয়েছে। এত শান্ত আর গম্ভীর কখনো শোনা যায়নি রফিকের গলা, অথচ আজ গাড়িতে যখন কথা বলছিল তখনও স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে রফিকের গলার স্বর এত বদলে গেল কেন? সে কিছু বলল না।

রফিক দরজা খুলতেই সাজেদ ভিতরে ঢুকল। একটু পর রফিক ঢুকেই দড়াম করে দরজাটা লাগিয়ে দিল। সাজেদ দরজা লাগানোর আওয়াজে পিছন ফিরে দেখল রফিককে। রফিক থরথর করে কাঁপছে, তার চোখ বড় হয়ে আছে, মনে হচ্ছে এই বুঝি চোখগুলো কোটর থেকে বেরিয়ে আসবে।

রফিককে সাজেদ শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

রফিক এবার এক দৌড়ে সাজেদের কাছে এসে পড়ল। সাজেদ ঘটনার আকস্মিকতায় থতমত খেয়ে কয়েক কদম পিছিয়ে গিয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

রফিক চোখ বড় বড় করে বলল, "ভূত!"

রফিকের কথা শুনে সাজেদের প্রচণ্ড হাসি পেল। সকালে এক কাণ্ড ঘটিয়েছে আর এখন আরেক কাণ্ড। সে হাসি আটকে রাখতে পারল না। দুলে দুলে হাসতে লাগল রফিকের সামনে। রফিক কিছু না বলে নিজের ঘরের দিকে রওনা দিল।

রফিক চলে যাওয়ার পর সাজেদ হাসি থামাল। সে ভাবল রফিকের কথা শোনা যেত, আরেকটু মজা পাওয়া যেত, কিন্তু বেচারার কথা না শুনেই রাগিয়ে

দিল সে। ঘটনাটা শেয়ার করা যাবে তারিনের সাথে। তারিন নিশ্চয়ই মজা পাবে এসব শুনে। সে হাসতে হাসতে দোতলায় উঠল। রাত কম হবে না, দশটা তো বাজেই। সাধারণত সাজেদ এমন সময় তারিনকে ঘুমন্ত অবস্থায় পায়। মাহাও ঘুমিয়ে যায়। ফ্রেশ হয়ে ডাইনিংয়ে এসে রফিকের সাথে খাবার খেয়ে নেয় সে।

দোতলায় উঠতেই মাহার রুমের দিকে একবার নজর দিল সাজেদ। রুমের দরজা বরাবরের মতো আংশিক খোলা। ভিতরে আর তাকিয়ে দেখল না। মাহা ঘুমাচ্ছে নিশ্চয়ই। সে নিজের বেডরুমের দিকে গেল। বেডরুমের দরজাও কিছুটা খোলা, ভিতরে লাইট জ্বলছে, তারিন তাহলে লাইট জ্বালিয়ে রেখেছে। তার মানে জেগে আছে।

সাজেদ দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। ভিতরে ঢুকেই নজর পড়ল বিছানার দিকে। কেউ নেই, তারিন নেই। হয়তো নিচে আছে। কিন্তু নিচে থাকলে তো তারিনের সাথে দেখা হতো। সে এতকিছু না ভেবে পাঞ্জাবি খুলে বিছানার উপর ছুড়ে দিয়ে বিছানার নিচ থেকে স্যান্ডেল বের করে নিল। হ্যাঙারে তোয়ালে ঝুলছে, সেটি নামিয়ে নিয়ে গলায় ঝুলিয়ে বাথরুমের দিকে রওনা হলো সে।

বেডরুমের সাথে অ্যাটাচড বাথরুম। বাথরুমের দরজার কাছেই সুইচ। দরজার কাছে যেতেই দেখল বাথরুমের দরজাও একটু খোলা। বাথরুম আবার কে খোলা রাখল! আরেকটু মনোযোগ দিতেই সাজেদের কানে আসল পানি পড়ার শব্দ। টপটপ করে কল থেকে পানি পড়ছে। তারিন কি কল ছেড়ে রেখে গেল নাকি? সে দরজাটি একটু ভিতরের দিকে ধাক্কা দিল। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেল না। তার ডান পা দরজার ভিতরে আর ডান হাত বৈদ্যুতিক সুইচে।

সাজেদ সুইচ চাপতেই বাথরুম আলোকিত হয়ে গেল। সেই আলোয় সে দেখল তারিন উলঙ্গ হয়ে বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর বেসিনের কল থেকে টপটপ করে পানি পড়ছে। ঘটনার আকস্মিকতায় থ হয়ে গেল সাজেদ। মুখ হাঁ করে তারিনের দিকে তাকিয়ে রইল।

তারিন মাথা ঘুরিয়ে সাজেদের দিকে তাকাল। তারিনের চুলগুলো তার গলা ঢেকে দিয়েছে। মুখ প্রচণ্ড লাল হয়ে আছে তারিনের, দেখে মনে হচ্ছে স্বচ্ছ সাদা মুখের চামড়ার নিচে লাল রক্তকণিকারা যেন বাসা বেঁধেছে। আর চোখ! চোখ ছিল রক্ত লাল, সেদিন রাতের মতো।

তারিন চিৎকার করে বলল, "অসভ্য কোথাকার! ভাগ এখান থেকে। দেখছিস না আমি গোসল করছি?"

একদম বোকা বনে গেল সাজেদ, নড়তে পারছিল না, দরজার নব ধরে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকল। সে বিশ্বাস করতে পারল না তারিন এমন ব্যবহার

করছে তার সাথে। চোখ দুটো হেডলাইটের মতো বড় বড় করে সে কেবল রাগী তারিনের দিকে তাকিয়ে থাকল। নড়াচড়া করারও কোনো শক্তি পাচ্ছিল না।

তারিন আবার ধমক দিয়ে বলল, "যাবি! না কষিয়ে থাপ্পড় দেব? লুচ্চা কোথাকার! ভাগ এখান থেকে।"

সাজেদের হুঁশ ফিরল। সাথে সাথে চোখ নিচের দিকে নামিয়ে নিল সে। নিচে চোখ পড়তেই দেখল ফ্লোর ভেসে যাচ্ছে পানিতে। টেপ থেকে অনেকক্ষণ যাবৎ পানি পড়ছে, তারিন বন্ধ করছে না। সাজেদ কিছু বলল না। তারিনের মুখ থেকে এরকম কথা শোনার পর আর দাঁড়িয়ে থাকার সাহস হলো না। দরজাটা আস্তে করে বন্ধ করে দিয়ে বিছানার উপর থেকে পাঞ্জাবি তুলে নিয়ে বের হয়ে আসল বেডরুম থেকে।

রুম থেকেই বের হয়ে দেয়ালে ডান হাত দিয়ে ভর করে দাঁড়াল। পাঞ্জাবিটা বাম হাত থেকে খসে নিচে পড়ে গেছে। দ্রুত লম্বা লম্বা শ্বাস নিল। তার দম নেওয়া দেখে মনে হচ্ছে সে তারিনের অগ্নিমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে দম নিতে ভুলে গিয়েছিল প্রায়। তাই হৃৎপিণ্ড অক্সিজেনের অভাব পূরণ করতে এখন উপর্যুপরি দম নিচ্ছে আর ছাড়ছে। তার বিমূঢ়তা কাটতেই মাথায় দুশ্চিন্তা উদয় হলো। দুশ্চিন্তার সাথি হয়ে সংশয় আসতেও কোনো ভুল করল না।

মাহার কথা মাথায় আসতেই এসব চিন্তা দূরে রাখার চেষ্টা করল। কী হচ্ছে, তা কিছুই সে বুঝতে পারছে না। ঠান্ডা মাথায় ভাবা দরকার। সারাদিন অনেক ছোটাছুটি করেছে। ক্লান্ত বললে ভুল হবে, সে এখন অসুস্থ বোধ করছে। মাহার জন্য দুশ্চিন্তা হতে লাগল। শক্ত হওয়ার চেষ্টা করলো সে।

তারিনের এরকম ব্যবহার কম চিন্তায় ফেলেনি সাজেদকে। সে মাহার রুমের দরজা একটু ফাঁক করে ভিতরে ঢুকল, লাইট জ্বালাবে কি না ভাবল, অবশেষে লাইট না জ্বালানোর সিদ্ধান্ত নিল। তারিন কোনো একটি কারণে রেগে আছে, হয়তো সে কোনো কারণে বিভ্রান্ত। এখন তার কাছে যাওয়া মোটেও উচিত হবে না। তারিন থাকুক নিজের মতো।

মাহা ঘুম থেকে উঠলে সমস্যা বেড়ে যাবে। তারিন যদি কোনো খারাপ ব্যবহার করে মাহার সামনে, তা মাহা নিতে পারবে না। ভয় পাবে। মায়ের প্রতি খারাপ মনোভাব তৈরি হবে। এই বয়সের বাচ্চারা বেশ সেনসিটিভ হয়। খুব সহজেই তাদের মন পরিবর্তন হয়। বিশেষ করে বাহ্যিক কোনো কারণে তাদের এরকম হলে সেটা দীর্ঘকাল পর্যন্ত থাকে। মাহা ঘুমাক, তাই মাহা আর সাজেদের জন্য ভালো হবে। সে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে হলরুমে বসল, ঠিক এমন সময় রফিকও সেখানে আসল।

রফিককে দেখে সাজেদ বলল, "একজন মানুষের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে?"

রফিক ভারী গলায় পালটা প্রশ্ন করল, "কীসের মানুষ?"

"কাজের মানুষ। মহিলা হতে হবে। মেয়ে হলেও চলবে।"

রফিক বলল, "পারব। সেঁজুতির মায়ের কথা মনে আছে?"

রফিকের প্রশ্নে সাজেদ ভ্রু কুঁচকে জবাব দিল, "হ্যাঁ।"

রফিক উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "তাহলে আমি দেশে গিয়ে সেঁজুতির মাকে নিয়ে আসি।"

সাজেদ ভ্রু কুঁচকে রফিকের দিকে তাকিয়ে বলল, "হঠাৎ করে দেশে যেতে চাচ্ছ যে?"

"তোমার কাছে হয়তো সবকিছু ঠিক লাগছে, কিন্তু আমার কাছে সেরকম ঠেকছে না। অনেকদিন দেশে যাই না। পীর-আউলিয়ার দোয়া নিই না। তাই একটু গিয়ে দোয়া নিতে চাই।"

সাজেদ কিছু বলল না, মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ বসে থাকল। তারপর ভাবনার জগৎ থেকে প্রত্যাবর্তন করে মাথা তুলে রফিককে বলল, "আমি আজ বাসায় থাকব না। খেয়াল রেখো সবকিছু।"

রফিক প্রত্যুত্তরে শুধু মাথা নাড়াল। সাজেদ চলে গেল, রফিক এগিয়ে গিয়ে লাগিয়ে দিল দরজাটা। সকালের ঘটনার পর এখনও রফিক ভয় পাচ্ছে। দেশে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে, এই সুযোগে পীর সাহেব থেকে তেল পড়া নিয়ে আসবে এবং তা গায়ে মাখবে ভয় কাটানোর জন্য। একটি তাবিজ আনবে জিন-ভূত দূরে রাখার জন্য। আজ সারারাত লাইট জ্বালিয়ে ঘুমাবে, যদি বিদ্যুৎ চলে যায় তাহলে মোমবাতি, যে করেই হোক অন্ধকার থেকে বাঁচতে হবে। তাই সে আসার আগে এক টাকা খরচ করে দুটি মোমবাতি নিয়ে এসেছে। আজ অন্ধকারে রাত পার করা উচিত হবে না।

প্রচণ্ড ব্যথায় কুঁকড়ে গেল তারিন। তলপেটে ভীষণ ব্যথা করছে। সাধারণ ব্যথা নয়, প্রচণ্ড ব্যথা। ব্যথায় তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। নাভির নিচে ব্যথাটা শুরু হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে দুদিকে। এতটাই ব্যথা করছে যে ঘুম থেকে উঠে গেল সে। সেই সন্ধ্যায় যে ঘুমিয়েছে মাহার সাথে আর ওঠেনি, এখন ব্যথার তীব্রতায় উঠে গেল ঘুম থেকে। বিছানায় বসে দুহাত দিয়ে পেট চেপে ধরল। ব্যথা সামনের দিকে করছে না, পিছনের দিকে করছে। ব্যাক পেইন, কোমরের চারপাশে ব্যথা। ছেড়ে ছেড়ে করছে। ব্যথার চোটে কোঁকাচ্ছে তারিন। মাহার কথা মনে পড়তেই নিজেকেই সামলাল সে। ঘর ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে আছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তারিনের কষ্ট এরকম গাঢ় অন্ধকারেই হারিয়ে যাচ্ছে।

তারিন এখন লাইট জ্বালাতে পারবে না। তাছাড়া বিদ্যুৎ আছে কি না তা-ও জানে না। প্রত্যেকদিন বিকেলে মোমবাতি এনে রাখে সে, কিন্তু আজ কিছুই করা হয়নি। হতবুদ্ধি হয়ে গেল সে। একে তো ব্যথা তার উপর অন্ধকার। কী করবে বুঝতে পারল না। বিছানায় বসে বসে কোঁকাতে লাগল। এই ব্যথা সহ্য করার মতো নয়, সহ্য করার মতো হলে তারিন করতে পারত, তার সহ্য ক্ষমতা অনেক।

কিন্তু এই সহ্যক্ষমতার দেয়াল আজ ভেঙে দিল এই কোমর ব্যথা। ব্যথা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত পেটে। নিচের দিক থেকে আস্তে আস্তে পায়ের গোড়ালির দিকে যাচ্ছে আর উপরে বুকের দিকে উঠছে। ব্যথাটি যদি কোন প্রাণী হতো তাহলে তার তিনটি মাথা হতো। যার একটি মাথা কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে তারিনের কোমর, আরেকটি আস্তে আস্তে দখল করছে কোমরের উপরিভাগ, আরেকটি নিচেরভাগ। ব্যথায় প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে সে। পেট দুহাত দিয়ে চেপে ধরে আছে।

"এদিকে আয়।" ফিসফিসিয়ে কে যেন বলল।

চমকে উঠল তারিন, সাথে ভয়ও পেল। ভয়ে শরীরের সমস্ত লোম দাঁড়িয়ে গেল তার। বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড এত দ্রুতবেগে লাফাচ্ছে যে নিজেই নিজের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। পেট ছেড়ে এবার নিজের বুকে হাত রাখল। বুকে হাত রাখতেই নিজের লাফানো হৃৎপিণ্ডকে বুঝতে পারল সে। বুক চেপে ধরে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করল। সাহস সঞ্চয় করার চেষ্টা করল নিজের মনে। আওয়াজটা কেমন ছিল তা ভুলে গিয়েছিল সে কিন্তু এখন মনে পড়ল। তারিন মস্তিষ্ক জানান দিল কী শুনেছিল সে কিছুক্ষণ আগে।

আওয়াজটা ছিল তারিনের। তার নিজের কণ্ঠ। নিজের আওয়াজ চিনতে কেউ ভুল করে না। যে আওয়াজের সাথে তারিনের এত বছর ধরে বসবাস সে আওয়াজ সে কী করে ভুলবে। চিকন, সরু, ঝংকারহীন একটি গলার আওয়াজ। সে কি নিজেকে নিজে ডাকল? তা কী করে সম্ভব? নিজের আওয়াজ চিনতে ভুল হয়নি তার।

কিন্তু তারিন তো কোনো শব্দ করেনি, ব্যথায় কোঁকাচ্ছিল, তাহলে কে ডাক দিল? যদি নিজেকে নিজে ডাকতে হয় তাহলে কেনই বা এভাবে ডাকবে? ডাকারই বা প্রয়োজন কী? কেউ কি নিজেকে নিজে ডাকে? মুহূর্তে হাজার প্রশ্ন উঁকি দিতে লাগল তার মনে। ব্যথার দখলদারিত্ব দূর হয়ে সেখানে শুরু হলো প্রশ্নের খেলা।

বিকেলেও একবার একটি ডাক শুনেছিল। ভুল শুনেছিল ভেবে সেবার উড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু এবার! এবার স্পষ্ট শুনল ডাকটি। বিকেলের ডাকটি ছিল অনেক চিকন স্বরের, বাচ্চাদের মতো গলা কিন্তু এবারেরটা ছিল একটু কর্কশ। ডাক বললে ভুল হবে, ঠিক যেন ফিসফিসানি। ফিসফিসিয়ে কেউ যেন ডাকল তারিনকে। সে বাম হাত দিয়ে বিছানায় মাহাকে খুঁজল, মাহা তার বাম পাশেই শুয়েছিল, খানিক পর মাহার পা লাগল হাতে। তারিন স্বস্তি পেল।

ব্যথা কমে গিয়েছে। বিছানা থেকে নামল তারিন। কোনো সাত-পাঁচ না ভেবে অন্ধকারেই নামল। পা ফ্লোরে পড়তেই ঠাণ্ডা অনুভব করতে লাগল সে। নিজের পায়ের গোড়ালি অবধি সবকিছু কেমন যেন ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। এত ঠান্ডা লাগছে কেন? সে দুই হাত দিয়ে গাল স্পর্শ করল। উষ্ণ লাগল। কিন্তু পায়ে এত ঠান্ডা লাগছে কেন? স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে না থেকে সামনে পা বাড়াল। সামনে একটি আলো উদ্দেশ্য করে হাঁটতে লাগল। চিকন, আড়াআড়ি একটি আলো। সে বুঝতে পারল তা বারান্দার আলো।

দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে থেকে আলো এসে ছুরির মতো ভিতরে প্রবেশ করছে। তারিন দরজা খুলে বাইরে আসল। তার পায়ে আর ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে না, উষ্ণ হয়ে উঠেছে গোড়ালি পর্যন্ত। এবার সব ঠিকঠাক। সে আর মাহার রুমের

দরজা বন্ধ করল না, দরজা খোলা রেখে নিজের রুমের দিকে যেতে লাগল। এই দিকে দরজাটি আস্তে আস্তে করে বন্ধ হয়ে গেল, একটুও শব্দ হলো না।

তারিন রুমে আসতেই আবার ব্যথা অনুভব করতে লাগল। কোমর থেকে উপর দিকে উঠছে, এবারও সহ্য করতে পারছে না। সে পা ঝুলিয়ে বিছানায় বসে দুহাত দিয়ে কোমর চেপে ধরল, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। ব্যথা কমার কোন লক্ষণ নেই। এভাবে বসে থাকলে হবে না, আজ ব্যথা সহ্য করে কাল সকালে না হয় ডাক্তারের কাছে যাওয়া যাবে, এখন গিয়ে কিছু খেয়ে ফ্রেশ হয়ে ঘুমানো যাক।

ঘুমালে ব্যথা ভুলে থাকা যাবে। জেগে থাকলে ক্রমে ক্রমে ব্যথার কষ্টে শেষ হয়ে যাবে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল নয়টা পঁয়তাল্লিশ। বিছানা থেকে উঠে বাথরুমের দিকে গেল। দরজা খুলতেই আবার অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে পড়ল। ভুলে বাথরুমের লাইটের সুইচ দেয়নি, সুইচ পাশেই, ডান হাত দিয়ে সুইচ চেপে দিল তারিন।

বাথরুমে ঢুকে বেসিনের সামনে গিয়ে কল ছাড়ল। কল থেকে পানি পড়তে লাগল গলগল করে। তারিন আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে দেখল। ছাড়া চুল, চোখের নিচে কালি, ফোলা ঠোঁট, ঝুলন্ত গাল, কোঁচকানো কপাল— এ সবকিছু তার সামনে ফুটে উঠল।

এসব তারিনের চোখকে কখনো ফাঁকি দিতে পারবে না। নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারেনি সে। প্রথমে ভেবেছে ঘুমিয়ে ছিল বলে এমন মনে হয়েছে, তাই কল থেকে পানি নিয়ে মুখে ছিটাতে লাগল, কয়েকবার ছিটানোর পর আবার আয়নার দিকে তাকাল। সব আগের মতোই, কোনো কিছু বদলায়নি, কিন্তু কালও স্বাভাবিক ছিল তারিন। এমনকি কাল রাত পর্যন্ত নিজেকে দেখেছে আয়নাতে, তখন এসব কিছুই চোখে পড়েনি। হঠাৎ করে এসব হলো কেন তা তারিন বুঝতে পারল না, বোঝার কথাও নয়, তার পিছনে যে অন্ধকার ষড়যন্ত্র করছে।

সন্ধ্যায় গেল মাহার সাথে ঘুমাতে, তারপর প্রচণ্ড কোমর ব্যথায় ঘুম ভাঙল তার। সকালে ছিল মাথাব্যথা আর সন্ধ্যায় কোমর ব্যথা। যেনতেন ব্যথা নয়, প্রচণ্ড ব্যথা। তারপর এখন আয়নায় এসে নিজেকে এরকম দেখছে। তারিনের মনে হচ্ছে তাকে কেউ মুখে জোরে জোরে থাপ্পড় মেরেছে, অনেক পিটিয়েছে। না হয় তার মুখের সাথে কোনো কিছুর প্রচণ্ড রকমের সংঘর্ষ হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে মুখের প্রত্যেকটি পেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নয়তো শুধুশুধু এমন হয় নাকি!

তারিনের হঠাৎ করে ইচ্ছে হলো গোসল করার। তার মনে হলো গোসল করলে সমস্ত ব্যথা দূরে চলে যাবে, পানিতে ভেসে যাবে সব কষ্ট। সে ঝর্ণার নিচে

গিয়ে দাঁড়িয়ে পানি ছেড়ে দিল। আস্তে আস্তে পানি সমস্ত শরীর ভিজিয়ে দিল তার। সে উপভোগ করতে লাগল, কিন্তু তা স্থায়ী হলো না। কোমর ব্যথাকে উপেক্ষা করে তার ডান চোখ প্রচণ্ড ব্যথা করতে লাগল। চোখের সাথে সমস্ত মাথাজুড়ে শুরু হলো প্রচণ্ড ব্যথা। তারিনের ইচ্ছে করছে এক্ষুণি নিজের মাথা দেয়ালে ঠুকে দিতে, মাথায় আঘাত করতে করতে শেষ করে দিতে, তাহলে হয়তো মুক্তি পাওয়া যাবে এই অসহ্য ব্যথা থেকে।

তারিন সহ্য করতে না পেরে ঝর্ণা থেকে সরে দাঁড়াল। বাম হাত দিয়ে চেপে ধরল চোখ। কিন্তু লাভ হলো না। ব্যথা করেই চলেছে। নিজের সাথে একটু পরপর কী ঘটছে সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। সে আয়নার সামনে গিয়ে চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিল। আস্তে আস্তে চোখ খুলল, চোখ খোলা রাখলেও ব্যথা করছে, আবার বন্ধ করলেও করছে।

সে আস্তে আস্তে মাথা আয়নার আরও কাছে নিয়ে গেল, দুহাত দিয়ে চোখের দুদিক টেনে ধরে দেখতে লাগল কিছু হয়েছে কি না। কিছুক্ষণ চোখের মণি ঘুরিয়ে, এদিক-সেদিক করে দেখল। না, কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। চোখ স্বাভাবিক। কিন্তু সব স্বাভাবিক থাকার পরও অসহ্য ব্যথা করছে।

তারিন আবার ঝর্ণার নিচে চলে গেল, পানি এসে আবার ভিজিয়ে দিতে লাগল তাকে। দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছে না, এই বাথরুমের ফ্লোরে ঘুমিয়ে থাকতে প্রচণ্ড ইচ্ছে হলো তার। ঠান্ডা পানির নিচে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে মন চাইল। ঝর্ণা বন্ধ করে দিয়ে নিচে ফ্লোরের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। পানিতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখল। নিজের ডান পা উপরে তুলে আবার আলতো করে রাখল ফ্লোরে।

আঘাতের ফলে ফ্লোরে জমে থাকা পানি ছড়িয়ে গেল চারদিকে, সাথে তার প্রতিবিম্বও ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। পানির সাথে পাল্লা দিয়ে প্রতিবিম্ব হারিয়ে গেল চারপাশে। আস্তে আস্তে নিচে শুয়ে পড়ল। একটি দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসল তার মুখ থেকে। চিত হয়ে শুয়ে পড়ল সে, শুতেই তার এক অদ্ভুত অনুভূতি হলো যা তার ভীষণ ভালো লাগতে শুরু করল।

উপরে ঝুলন্ত লাইটের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তারিনের দুই চোখ জড়ো হয়ে আসতে লাগল। যেন সমস্ত ব্যথা ভুলে যেতে লাগল সে। ক্রমে তার দুই চোখে অন্ধকার নেমে আসল। গাঢ় আর নিস্তব্ধ অন্ধকার। তারিন কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে গেল। অপার্থিব, মায়াবী এক অন্ধকার জগতে।

বাইরে এসে সিগারেট ধরাল সাজেদ। গভীর টান দিয়ে একের পর এক সিগারেট শেষ করছে, ইতোমধ্যে আধা প্যাকেট সিগারেট জ্বালিয়েছে, আজ একটু বেশিই টানছে। নিজের শরীর থেকে আসা সিগারেটের গন্ধ মাঝেমধ্যে তার নাক কুঁচকানোর কারণ হয়ে গিয়েছে। পোর্চে অন্ধকারে বসে আছে সে। আসার সময় পোর্চে লাগানো লাইট বন্ধ করে এসেছিল। অন্ধকারে থাকতেই ভালো লাগছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার সব। দূর থেকে ভেসে আসছে মোটরযানের শব্দ। মাঝেমধ্যে রিকশার বেলের টুন টুন করে আসা আওয়াজ কানে এসে বাজছে। সে চোখ বন্ধ করে সেই আওয়াজ উপভোগ করছে।

বাড়ির ভিতর সিগারেট ধরানো নিষেধ। মাহা আসার পর তারিন বাড়ির ভিতর সিগারেট খেতে মানা করে দেয়। এমনিতে সিগারেট কম খায় সাজেদ। বাড়ির ভিতর তারিনের সামনে একদম খাওয়াই হতো না। মাঝেমধ্যে অতিরিক্ত টেনশনে পড়লে রিডিং রুমে একটু আধটু সিগারেট খেত, কিন্তু তারিন সেটাও করতে মানা করে দিয়েছে মাহা আসার পর। গত দুই বছর ধরে সিগারেট খেতে ইচ্ছে হলে পোর্চে বসেই সেরে নেয়।

প্রচণ্ড টেনশনে না পড়লে সাধারণত সিগারেট খায় না সাজেদ। এখন তার মন বিক্ষিপ্ত, মাথায় চিন্তা ছোটাছুটি করছে, তারিনকে নিয়ে ভাবছে। তাই একের পর এক সিগারেট টেনে যাচ্ছে সে। সেদিন মাহার জন্মদিনের পর থেকে তারিনকে স্বাভাবিক লাগছে না, মনে হচ্ছে তারিনের সাথে কোনো কিছু ঘটেছে। হয়তো সংসার নিয়ে ছোটাছুটি করতে করতে অতিরিক্ত স্ট্রেসের কারণে তারিনের এরকম হয়েছে, সেজন্য সাজেদ আজ রফিককে একটি কাজের মানুষের ব্যবস্থা করে দিতে বলল। এবার আর এ ব্যাপারে তারিনের কোনো মানা শুনবে না সে, কাউকে রাখতে হবে, তারিনকে সাংসারিক ঝামেলা থেকে একটু মুক্ত করতে হবে।

সিগারেট শেষ করে ফিল্টারটি ছুড়ে মারল বাগানের দিকে। তারপর পিছন ফিরে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। হলরুমে এসেই রফিককে ডাক দিয়ে দোতলার দিকে তাকাল সে। রফিক ডাক শুনে ছুটে আসল। পরনে ধূসর রঙের লুঙ্গি আর উপরে কিছু নেই, উন্মুক্ত শরীর।

রফিক এসে সাজেদের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "ভাত খাবে?"

সাজেদ জবাব দিল, "একটু যাও তো। ডাক্তার নিয়ে এসো।"

সাজেদের কথায় প্রায় আকাশ থেকে পড়ল রফিক। হঠাৎ করে ডাক্তার আনতে হবে কেন? কার কী হলো? তাছাড়া এই অন্ধকার রাতে একা একা ডাক্তার আনতে কোথায় যাবে? এসব প্রশ্ন উঁকি দিল তার মাথায়।

"কী হয়েছে?" ভাঙা ভাঙা স্বরে জানতে চাইল রফিক।

"ডাক্তার আনতে বলছি। যাও," সাজেদ কর্কশ স্বরে বলল।

সাজেদের এমন জবাব শোনার পর দেরি করল না রফিক। সোজা নিজের রুমে ঢুকল, তারপর একটি শার্ট আর টর্চ লাইটটি নিয়ে সাজেদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকল। কোথায় যাবে বলেনি সাজেদ, তাই এরকম ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, তাহলে সাজেদ বলবে কী করতে হবে।

সাজেদের বিরক্তি ধরে গেল। মাথা তুলে বলল, "কী হয়েছে?"

রফিক আমতা আমতা করে জবাব দিল, "কার কাছে যাব? কোথায় যাব?"

সাজেদ আবার কর্কশ সুরে বলল, "নাসির সাহেবের ওখানে যাও। তাঁকে না পেলে তাঁর ভাগ্নেকে নিয়ে এসো। যাও।"

সাজেদের কথা শুনে স্বস্তি পেল রফিক। এখান থেকে পাঁচ মিনিট হাঁটলেই নাসির ডাক্তারের বাড়ি, বেশি দূরে নয়, প্রায়শই নাসির ডাক্তার এই বাড়িতে ঘুরতে আসেন। তিনি বিপত্নীক, তাঁর ভাগ্নেও বিয়ে থা করেনি, অবশ্য তাঁর ভাগ্নে সম্পর্কে সে বেশি কিছু জানে না। তবে এটা শুনেছে যে, ও বাড়িতে নারীর পা পড়েনি প্রায় এক দশক হয়ে গেল।

অথচ দুজনেই বড় ডাক্তার। নামধাম কম নয়। কয়দিন পরপর নাসির ডাক্তার বিদেশ যান, যাওয়ার আগে সাজেদের সাথে দেখা করে বিদায় নিতে আসেন। মানুষটা অনেক ধার্মিক, মুখে সাদা দাড়ি, কপালে কালো চিহ্ন। সবসময় একটি হাসি ঝুলিয়ে রাখেন নিজের ঠোঁটে। রফিক তাঁকে আনতে বের হয়ে গেল।

রফিক যাওয়ার পর সাজেদ বসা থেকে উঠে পড়ল। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল দোতলায়। তারিনকে সামলাতে হবে, কী হয়েছে তা বুঝতে হবে। এরকম অদ্ভুত ব্যবহার কেন করছে তা বুঝতে পারছে না সে। অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে তারিনের সাথে। তা বের করতে হবে।

মেয়েটিকে এরকম অবস্থায় একা ফেলে ছুটে আসা সাজেদের উচিত হয়নি। অপেক্ষা করতে পারত, নিজেকে সামলাতে পারত, তারপর তারিনকে জোর করে বেডরুমে এনে শোয়ানো যেত। কিন্তু তেমন কিছুই করতে পারল না। সে তখন করবেই বা কী! একদম হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল তারিনের ব্যবহারে। এরকম বিতিকিচ্ছিরি ঘটনার মুখোমুখি কোনোদিন হয়নি, বিশেষ করে তারিনের কাছ থেকে এমন কিছু একদম অপ্রত্যাশিত ছিল, তাই ঘটনাটা এখনও হজম করতে পারছে না।

সাজেদ দোতলায় পৌঁছে আস্তে করে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। ঘর যেমন আছে তেমনি। সে অবাক হয়ে গেল, তার মানে তারিন এখনও ফেরেনি বাথরুম থেকে, যদি ফিরতো তাহলে তারিনকে রুমেই পাওয়া যেত। এতক্ষণ যাবৎ সে বাথরুমে কী করছে?

হতবুদ্ধি হয়ে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে সাজেদ এক দৌড়ে চলে গেল বাথরুমের সামনে। দেরি না করে লাথি দিয়ে দরজা খুলল। দরজা খুলতেই তারিনের দেহ ফ্লোরে পড়ে থাকতে দেখল সে। চিত হয়ে পড়ে আছে তারিন, তার শরীর সাদা হয়ে গিয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে কেউ সব রক্ত শুষে নিয়েছে তারিনের শরীর থেকে। শরীরের নিচে পানি জমে আছে। তারিনের এরকম অবস্থা দেখে ভয় পেল। দৌড় দিয়ে বাথরুমের ভিতরে গেল।

বাথরুমে প্রবেশ করেই তারিনের মাথাটা তুলে নিল নিজের হাতের উপরে। তারিনের শরীরে স্পর্শ পেল সাজেদ। ঠান্ডা, ভীষণ ঠান্ডা তারিনের শরীর। একটুকরো বরফ হাতে তুললে যেরকম মনে হয় ঠিক সেরকম মনে হচ্ছে তারিনের স্পর্শ পেয়ে। মৃত মানুষের শরীরের মতো। বুক ধক করে উঠল সাজেদের।

মাথাটা হাতে নিয়ে ডাক দিল, "তারিন! তারিন! কী হয়েছে তোমার?"

কোনো জবাব নেই। সাজেদ আবার তারিনের মাথাটা ফ্লোরে রাখল। তারিনের ডান হাত তুলে নিল। পালস চেক করল, কিন্তু কোনো পালস পেল না। ভেঙে পড়ল সাজেদ। বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল তার। তারিনকে কোলে তুলে নিল। তারিনের বরফের মতো শরীরটা নিজের দুহাতের উপর তুলে আরও ভয় পেল সে। তাকে কোলে নিয়ে বের হয়ে বিছানায় শোয়াল।

তারিন উলঙ্গ। সাজেদ দেরি না করে কাঁথা এনে দিয়ে দিল তারিনের শরীরের উপর। সাজেদের ব্লাড কত জোরে পাম্প হচ্ছে তা সে নিজেও জানে না, কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না, হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

কিছুক্ষণ পর সাজেদের মাথায় এলো তারিনের মাথা মুছতে হবে। সে খাটের স্ট্যান্ড থেকে তোয়ালে নামিয়ে তারিনের মাথার কাছে এসে আলতো করে মাথাটা মুছতে লাগল। মাথা মুছে আবার কয়েকবার ডাক দিল তারিনকে।

"তারিন! তারিন! "

কোনো জবাব নেই। তারিনের পালস আবার চেক করল, কোন পালসও নেই, গলার পালস চেক করল, সেখানেও নেই। ভিতরে ভিতরে কোঁকিয়ে উঠল সাজেদ কিন্তু ভেঙে পড়ল না, ঠান্ডা মাথায় ভাবতে লাগল কী করবে। অ্যাম্বুলেন্স ডেকে হাসপাতালে নিতে হবে। সে এক দৌড়ে নিচে নেমে এসে হলরুমে রাখা টেলিফোন তুলে নিল। ডায়াল করল তারিনের বাবার কাছে। একটু পর খন্দকার শহিদ হোসেন ফোন ধরল।

সাজেদ তাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বলল, "বাবা, তাড়াতাড়ি গাড়ি পাঠান এখানে। তারিন অনেক অসুস্থ হয়ে গিয়েছে।"

এটুকু বলেই ফোন রেখে দিল, ঠিক তখনি পিছনে থপথপ আওয়াজ শুনল সে। সেদিকে ফিরে দেখে রফিক আর নাসির ডাক্তার। সাজেদ নাসির ডাক্তারকে দেখেই বলল, "তাড়াতাড়ি আসুন।"

নাসির ডাক্তার লুঙ্গি আর হাফহাতা শার্ট পরে আছেন। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। সাজেদের কাছে এসে বললেন, "কী হয়েছে তা বলো আগে।"

সাজেদ জবাব না দিয়ে উলটো বলল, "আগে আসুন। তারপর বলছি।"

সাজেদ ধপধপ করে পা ফেলে উপরে উঠল। সাজেদের পিছন পিছন রফিক আর নাসির ডাক্তারও উঠতে লাগলেন। সাজেদ রুমের সামনে আসতেই হাসির আওয়াজ শুনল। থমকে গেল সাজেদ। কে হাসছে বেডরুম থেকে? সাজেদ থমকে গিয়ে হাসিটা শোনার চেষ্টা করল, হাসিটা আস্তে আস্তে পরিচিত হতে লাগল তার কাছে, হাসিটা আর কারও নয়, তারিনের।

কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছে না। একটু আগে তারিনের নিথর দেহ বিছানায় ফেলে আসল সাজেদ। আর এখন তারিনের খিলখিল হাসির শব্দ ভেসে আসছে।

পিছন থেকে নাসির ডাক্তার বলে উঠলেন, "কী হয়েছে?"

সাজেদ কিছু বলল না, আস্তে করে পা ফেলে ভিতরে ঢুকতেই দেখল মাহা বসে আছে বিছানার উপর। সাজেদ ধীরপায়ে এগিয়ে গেল। বিছানার সামনে যেতেই দেখল তারিন চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। মাহা তারিনের মাথার কাছে বসে আছে। সাজেদের চোখ কপালে উঠে গেল। একটু আগে তারিনকে কী

অবস্থায় দেখল আর এখন কী অবস্থায় দেখছে। সে ভেবেছিল তারিনের বুঝি ভয়াবহ কিছু হয়েছে অথচ এখন তারিন মাহার সাথে হেসে হেসে কথা বলছে।

সাজেদকে বিছানার পাশে দেখতেই তারিন বলল, "এত দেরি হলো কেন তোমার ফিরতে?"

এরকম প্রশ্ন শুনে চমকে উঠল সাজেদ। একদম বোকার মতো তাকিয়ে থাকল তারিনের দিকে। মাথার মধ্যে যেন ভীষণ বিস্ফোরণ হলো। কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল সে। পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে তারিনের দিকে। একটু আগে যেখানে তার সাথে তারিন দুর্ব্যবহার করল সেখানে এখন কত ভালোভাবে কথা বলছে! তাকে শাসিয়ে বের করে দিল একটু আগে আর এখন! সব ভুলে গিয়েছে তারিন! হ্যাঁ, সব ভুলে গিয়েছে। সেদিন রাতে তারিনের খিঁচুনি হওয়ার ব্যাপারটিও তারিন অস্বীকার করে বসল আর আজ এটি! সে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

পিছন থেকে নাসির ডাক্তার সাজেদের কাঁধে হাত রেখে বললেন, "কী হয়েছে?"

সাজেদ নাসির ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বলল, "দয়া করে একটু বাইরে চলুন।"

সাজেদের সাথে নাসির ডাক্তার বের হয়ে গেলেন, রফিকও তারিনকে একনজর দেখে বের হয়ে গেল। সাজেদ রফিকের দিকে ইশারা করতেই রফিক থেমে গেল, দাঁড়িয়ে থাকল বাইরের দরজার সামনে। সে নাসির ডাক্তারকে নিয়ে হলরুমে বসল।
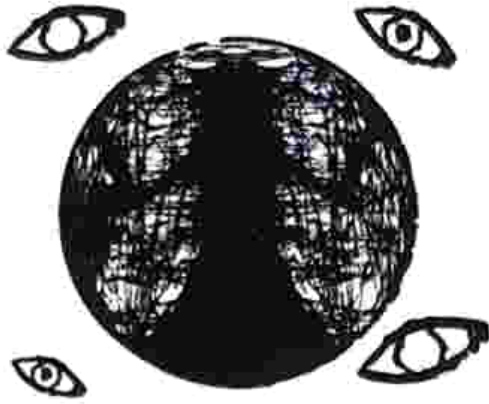
হঠাৎ করেই চোখ খুলে গেল হাফেজ মিয়ার। অন্ধকারে কিছুক্ষণ চোখ খোলা রেখে আবার বন্ধ করে ফেললেন। না, ঘুম আসছে না। চোখের ভিতর যেন অদ্ভুত এক জ্বালাপোড়া করছে, সম্ভবত হঠাৎ ঘুম ভাঙার ফলে এমন হচ্ছে, তাই তিনি চোখ বুজে পড়ে রইলেন। কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ গড়াগড়ি করলেন ঠিকই, কিন্তু ঘুম তাঁর চোখে ধরা দিল না। ঘুম না আসার কারণে যে বিরক্তিটা হয়, তা ভীষণ খারাপ লাগে।

গড়াগড়ি করে অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলেন উঠে তাহাজ্জুদ পড়বেন। অনেক দিন তাহাজ্জুদ পড়া হয় না। হুজুর যেহেতু এসেছেন, তাঁকে নিয়ে তাহাজ্জুদ পড়া যাক। ঠান্ডা মাটিতে পা রাখতেই কেমন আলসে বোধ করলেন। না, আলসেমিকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। খাটিয়ার নিচ থেকে লণ্ঠন বের করে সলতে বাড়িয়ে নিয়ে বাইরে বের হয়ে এলেন।

আকাশের দিকে তাকাতেই বুঝলেন মধ্যরাত। বারোটা থেকে একটার মাঝামাঝি হবে। আকাশে পূর্ণ চাঁদ দেখা যাচ্ছে। বাড়ির আশেপাশে সবকিছুই দেখা যাচ্ছে। কোনোটা আবছা, কোনোটা বা একদম পরিষ্কার। চাঁদের আলোয় হারিকেনের দরকার হবে না, তবে পুকুরে যেতে হলে লণ্ঠনের দরকার হবে কারণ গাছের আড়ালে চাঁদ ঢাকা পড়ে যায়।

ঘর থেকে এক গাদা আলস্য নিয়ে বারান্দা থেকে নিচে পা ফেললেন। সাথে সাথে ঠান্ডা বাতাস এসে গায়ে লাগল। হঠাৎ করে এরকম বাতাসের অনুভূতি পেয়ে কেঁপে উঠলেন হাফেজ মিয়া। এদিক-ওদিক তাকালেন। গাছগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে অপার্থিব কোনো এক অবয়ব হাত মেলে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। ঝিঁঝি পোকার ডাক যেন এই পরিবেশকে আরও ভারী করে দিয়েছে। তার মনে হচ্ছে আশেপাশে কোনো কিছু ঘুরছে। সেটি দেখতে পাচ্ছেন না ঠিকই কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব ঠিকই টের পাচ্ছে।

সেদিন ফজরের কথা মনে পড়ে গেল। গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল হাফেজ মিয়ার। অদ্ভুত, অজানা, অপার্থিব এক ভয় ঘিরে ধরল তাঁকে। তিনি ঘরের বারান্দায় উঠে পড়লেন। বারান্দায় আসতেই যেন ভয় আস্তে আস্তে কাটতে শুরু করল। নিজের ঘরের ক্ষমতাই এমন। মানুষ অদ্ভুত এক সাহস পায় নিজের গৃহে বা নিজের পরিচিত জায়গায় ফিরলে।

হুজুরকে নিয়ে অজু করতে যেতে হবে যদিও হুজুর কিছু মনে করতে পারেন, তবে হুজুরকে তাহাজ্জুদের কথা বললে হুজুর নিশ্চয়ই অখুশি হবেন না। হুজুরের ঘরের দিকে তাকাতেই দেখলেন দরজা একটু খোলা। অবাক হলেন হাফেজ মিয়া। দরজা দেখে মনে হচ্ছে কেউ বের হয়েছে অথবা ঢুকেছে। চোর নয় তো?

তিনি লণ্ঠনের সলতে নামিয়ে পা টিপে টিপে হুজুরের ঘরের দিকে গেলেন। দরজার কাছে এসে শ্বাস নিয়ে হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে ফেললেন। এদিক-ওদিক তাকালেন। কেউ নেই। এমনকি হুজুরও বিছানায় নেই। বুকটা ধক করে উঠল হাফেজ মিয়ার। হুজুর কোথায় যেতে পারেন এই রাতে? নামাজ পড়তে বের হননি তো?

তাহলে হুজুর নিশ্চয়ই পুকুরপাড়ে আছেন। সাহস পেয়ে লণ্ঠন নিয়ে পুকুরের দিকে রওনা হলেন হাফেজ মিয়া। বাড়ির পিছনেই পুকুর। বড় বড় পা ফেলে পুকুরে গেলেন। এ কী! হুজুর তো এখানেও নেই। চাঁদ গাছের আড়ালে চলে গিয়েছে তাই চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। লণ্ঠনের সলতে বাড়িয়ে দিয়ে হুজুরকে খুঁজতে লাগলেন। না, পুকুরপাড় শূন্য। তাহলে হুজুর গেলেন কোথায়?

টয়লেটে যাননি তো? তা-ও হতে পারে। লণ্ঠন নামিয়ে হাফেজ মিয়া অজু সেরে নিলেন। ওজু করে ঘরে ফিরে দেখলেন দরজা এখনও খোলা। লণ্ঠন নিয়ে হুজুরের ঘরে উঁকি দিলেন, কেউ নেই। ভিতরে ঢুকতেই হুজুরের নিভানো লণ্ঠন চোখে পড়ল। খাটিয়ার নিচেই আছে। একটু আগে কম আলোয় দেখতে পায়নি, এবার ঠিকই চোখে পড়েছে। তাজ্জব বনে গেলেন হাফেজ মিয়া।

হুজুর লণ্ঠন রেখে এই অন্ধকারে কোথায় যাবেন? হাফেজ মিয়া কী করবেন ভেবে পেলেন না। হুজুরের বিছানায় গিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। এখন চোখে ঘুম আছে। ঘুমে চোখ খুলে রাখা দায় হয়ে পড়ছে। নিজেকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে বারান্দায় চলে এলেন।

কিছুক্ষণ নিগূঢ় অন্ধকারে ছমছমে প্রকৃতিকে বোঝার ব্যর্থ চেষ্টা করে নিজের রুমে গিয়ে তালা নিয়ে এলেন। হুজুর ফিরলে এতক্ষণে ফিরতেন। যেখানেই যান না কেন, হুজুর সকালের আগে ফিরবেন না। কিন্তু গেলেন কোথায়? নাকি হুজুরের

কিছু হলো? প্রশ্ন দুটো মাথায় আসতেই চিন্তায় মাথা ধরে গেল হাফেজ মিয়ার। এখন কিছু করা সম্ভব নয়, যা করার সকালেই করতে হবে।

তালা দিয়ে এসে নিজের খাটিয়ায় শুয়ে পড়লেন তিনি। বিছানায় পিঠ লাগতেই চোখে ঘুম চলে আসল। ঠান্ডা লাগছে হালকা। পায়ের কাছে একটা কাথা পড়ে আছে। তিনি তা টেনে নিজের গলা পর্যন্ত ঢাকলেন। কিছুক্ষণ পর নাক থেকে গড়গড় শব্দও বের হতে লাগল। গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন।

হঠাৎ করেই দরজায় ঠকঠক করে কে যেন টোকা দিয়ে হাফেজ মিয়াকে ডাকল। কানে শব্দ আসল, কিন্তু তিনি উঠলেন না। ঘুম ভাঙাতে হালকা বিরক্ত তিনি, কিন্তু তাঁর নিজের প্রতি আস্থা আছে যে, এখন আবার চাইলে তিনি গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতে পারবেন।

কিন্তু ওদিকের ব্যক্তিও নাছোড়বান্দা। দরজায় ঠকঠক করে ডেকে যাচ্ছে। গলাটা কার বুঝতে পারছেন না। তাই হাফেজ মিয়া উঠে ঘুম ঘুম চোখে বললেন, "কে?"

"আমি ইমাম। ফজরের সময় হয়ে গিয়েছে। নামাজে যাবেন না?" হুজুরের গলার শব্দ দরজার ওপাশ থেকে ভেসে আসল।

রাতের কথা মনে পড়ে গেল হাফেজ মিয়ার। সূর্য পেলে কুয়াশা যেভাবে পালায়, তাঁর ঘুম সেভাবে পালিয়ে গেল। এক ঝটকায় বিছানা থেকে নেমে হুজুরের ঘরের দরজা খুলে বললেন, "রাতে কোথায় ছিলেন?"

হাফেজ মিয়ার কথা শুনে যেন হুজুর ভ্যাবাচ্যাকা খেলেন। মুখে একরাশ বিস্ময় নিয়ে বললেন, "কোথায় ছিলাম মানে? আমি তো নিজের বিছানায় ছিলাম।"

এটা শোনার পর যেন এক ধাক্কা খেলেন হাফেজ মিয়া। হুজুরের ঘরের দরজার দিকে তাকাতেই দেখলেন দরজা খোলা। ভিতরে লণ্ঠন জ্বলছে। তিনি হতবাক হয়ে হুজুরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"কী হলো? আজান দেবেন না?"

হুজুরের গলা শুনে বিস্ময় কেটে গেল হাফেজ মিয়ার। যন্ত্রের মতো নিজের ঘরে গেলেন। লণ্ঠন তুলে নিতে চোখ গেল হাঁড়ির দিকে। হাঁড়ির উপর তালা-চাবি রাখা। এটা দেখে আরও অবাক হলেন।

পিছন থেকে হুজুর হাঁক দিলেন, "কী হলো? আসছেন না কেন? সময় চলে যাচ্ছে।"

হাফেজ মিয়া ঘর থেকে বের হয়ে বললেন, "আমি রাতে আপনাকে বিছানায় দেখিনি। পরে আপনার ঘর তালা দিলাম এই ভয়ে যাতে চুরি না হয়। এখন দেখি আমার তালা-চাবি জায়গামতো আছে।"

হুজুর মুচকি হেসে বললেন, "নিশ্চয় স্বপ্ন দেখেছেন। স্বপ্ন এমনি। বাস্তবের মতো লাগে মাঝে মাঝে।"

হাফেজ মিয়াও যেন হুজুরের কথা শুনে নিজের মনকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। লণ্ঠন হাতে নিয়ে সামনে সামনে হাঁটতে লাগলেন, আর হুজুর পিছনে পিছনে। হুজুরের ঠোঁটের কোণে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল যা এই অন্ধকার প্রকৃতিরও চোখ এড়াল না।
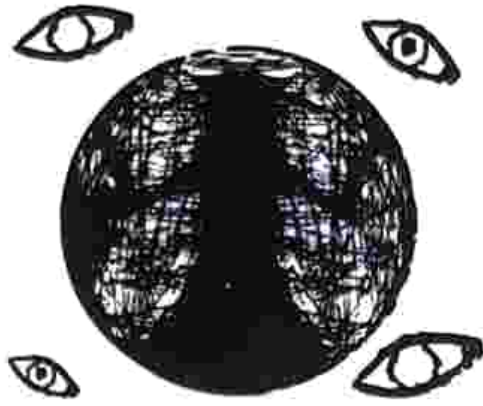
শেষ কবে রাত জেগেছিল খেয়াল নেই রফিকের। আজ সারারাত জেগে আছে, কেন জেগে আছে তা সে জানে না, ঘুম আসছে না। ঘুমাতে গেলেই এক অদ্ভুত অস্থিরতা ভর করে। জীবনের প্রথমবার এমন ঘটছে তার সাথে। ঘুম কখনো তার চোখ ফাঁকি দিয়ে বাঁচতে পারে না, ধরা পড়েই। রাতে বিছানায় গা এলিয়ে দিতে দেরি হলেও চোখে ঘুম আসতে দেরি হয় না। সেই যুদ্ধের সময় যেখানে সবাই ছোটাছুটি করত, রাতের আঁধারে ঘুমে হারিয়ে না গিয়ে সকলে চিতাবাঘের মতো সতর্ক থাকত সেখানে রফিক নাক ঢেকে ঘুমাত।

কিন্তু আজ! আজ একেবারেই ঘুম আসছে না রফিকের চোখে। বিছানায় সেই কখন থেকে গড়াগড়ি করছে কিন্তু ঘুমের দেখা নেই। এপাশ থেকে ওপাশ তার শরীরটা সাপের মতো গড়াগড়ি দিচ্ছে কিন্তু তেমন লাভ হচ্ছে না। বিছানার চাদরটা এক জায়গায় জমে যাচ্ছে। অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে রফিক, ঘুম না আসার অস্থিরতা, এর চেয়ে বড় অস্থিরতা আর নেই।

রফিক সকাল হওয়ার অপেক্ষায় আছে। সকাল হলেই কমলাপুর চলে যাবে, সেখান থেকে ট্রেনে করে সোজা নোয়াখালীতে, গিয়েই পড়বে পীর সাহেবের ওখানে। সেখান থেকে ঝাড়ফুঁক নিয়ে তারপর যাবে গ্রামে। শুয়ে থাকতে থাকতে এসব চিন্তা করছে সে। কাল রাতে কী ঘটেছে তার কিছুই জানে না সে, কিন্তু সেদিন সাজেদ তার কথা না শুনেই হাসা শুরু করেছিল। রফিকের গায়ে সেদিন স্পষ্ট এক গরম বাতাস লেগেছে। রফিক সেটার স্পর্শ পাওয়া মাত্রই বুঝতে পেরেছিল তা কী।

আলগা বাতাস!

এই বাতাস গায়ে লাগলে কিছু না কিছু হয়। রফিক সেটা জানে। আলগা বাতাস লাগলে জ্বর হয়ে অনেকেই মারা পড়ে। জিনের বাতাস এটা, এত সহজেই কী রক্ষা পাওয়া যায়! ঝাড়ফুঁক করতে হয়, তাবিজ পরতে হয়, সরষে পড়া খেতে

হয়, তেল পড়া লাগাতে হয়, মাজারে-মসজিদে শিন্নি দিতে হয়; তবেই এই আলগা বাতাস থেকে মুক্তি মিলবে।

এসব ভাবতে ভাবতে রফিকের রাত পার হয়ে যাচ্ছে, ক্ষুধাও লেগেছে তার। রাতের ঘটনা নিয়ে অনেক কৌতূহলী কিন্তু তাকে সাজেদ কিছুই বলেনি। বরাবর সাজেদ তার থেকে বিষয়টা চেপে গিয়েছে। সরল মনের মানুষ খারাপ মানুষকে না চিনে বিশ্বাস করে, বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, কিন্তু এক শয়তান আরেক শয়তানকে কখনো বিশ্বাস করে না। সে জানে শয়তানকে বিশ্বাস করার পরিণতি কী সাজেদ তাই আজও তাকে বিশ্বাস করতে পারে না।

রাতে সাজেদ ডাক্তার আনতে বলার পর দৌড়ে বের হয় রফিক। নাসির ডাক্তারের বাড়ি তার পরিচিত, গলির শেষ মাথায় নাসির ডাক্তারের বাড়ি, অনেক পুরানো একটি একতলা বাড়ি। এদিকে এত পুরানো বাড়ি দেখেনি রফিক, হলুদ রং করা বাড়িটি দেখলে মনে হয় খেলাঘর। তবে অনেক জায়গায় রং সরে ধূসর রং ফুটে উঠেছে। বাড়ির চারপাশে কোনো সীমানাপ্রাচীর নেই, খোলামেলা বাড়ি, এত খোলামেলা বাড়িও সে আর দেখেনি ঢাকা শহরে।

এই বাড়িতে কোনো মহিলা নেই, শুধু ডাক্তার সাহেব আর তাঁর ভাগ্নে থাকেন এখানে। যদিও ভাগ্নেকে এখনও ঠিক করে দেখেনি সে। কোনো কাজের বুয়াকেও দেখেনি রফিক। দুজন থাকেন এত বড় বাড়িতে। রান্নাবান্না নিজেরাই করেন। সে এসব ভাবতে ভাবতে নাসির ডাক্তারের বাড়ির সামনে এসে গেল। বাড়ির দরজায় বিশাল বড় লোহার কড়া লাগানো নক করার জন্য।

কয়েকবার নক করল রফিক। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দরজা ক্যাঁচক্যাঁচ করে খুলে গেল। দরজা খুলতেই ভিতর থেকে একটি সুগন্ধ এসে নাকে লাগল তার। এরকম সুগন্ধ আর পায়নি সে, পীর সাহেবেরও এমন সুগন্ধি নেই। সে সুগন্ধ উপভোগ করতে লাগল।

হঠাৎ ভিতর থেকে মোটা, ঝাঁঝালো সুরে একজন বলল, "কী চাই?"

রফিক চমকে উঠল কণ্ঠস্বরটি শোনার পর। নাসির সাহেবের গলা নয় এটি, অন্যজনের স্বর।

রফিক জবাব দিল, "ডাক্তার সাহেব আছেন?"

ভিতর থেকে জবাব এলো, "কোন ডাক্তার?"

রফিক জবাব দিল, "নাসির ডাক্তার।"

কণ্ঠটি এবার বলল, "ভিতরে আসবেন না আপনি। এখন বাসায় গিয়ে অজু করে নেবেন।"

চমকে উঠল রফিক। অজু করার কথা কেন বলল লোকটি? সে এরকম আচরণই বা করল কেন? প্রশ্নগুলো খেলে গেল তার মাথায়। দরজা অল্প করে খোলা, তার ইচ্ছে হলো উঁকি দিয়ে দেখতে আসলে লোকটি কে, কিন্তু সাহসে কুলাল না। তবুও সিদ্ধান্ত নিল ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখবে। কৌতূহল একেবারেই দমন করতে পারে না রফিক।

রফিক উঁকি দেবে ঠিক এমন সময় সেই অচেনা লোকটি বলল, "উঁকি দেবেন না। দাঁড়িয়ে থাকুন।"

এবার চমকে উঠল রফিক। সে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে আর লোকটি ভিতরে, তাহলে লোকটি কী করে বুঝল রফিক উঁকি দেবে? সে থতমত খেয়ে বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর দরজা ঠেলে নাসির ডাক্তার বের হয়ে এলেন।

ডাক্তার এসেই রফিককে দেখে বললেন, "কী মিয়া? কী হয়েছে যে এত রাতে আসতে হয়েছে?"

রফিক কী জবাব দেবে বুঝতে পারল না। ওই অপরিচিত কণ্ঠস্বর এখনও তার মাথায় ঘুরছে। রফিক সংবিৎ ফিরে পেল ডাক্তারের জুতোর আওয়াজ শুনে। সে ছোট করে জবাব দিল, "সাজেদ আপনাকে তাড়াতাড়ি আমার সাথে যেতে বলেছে।"

রফিকের কথা শুনে ডাক্তার কিছুক্ষণ রফিকের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকল।

রফিক আবার ডাকল, "ডাক্তার সাহেব!"

রফিকের কথায় সংবিৎ ফিরে পেলেন নাসির ডাক্তার। নাক সরু করে বললেন, "কেউ অসুস্থ হয়েছে?"

রফিক জবাব দিল "হ্যাঁ।"

নাসির ডাক্তার ঘরের ভিতরে চলে গেলেন, কিছুক্ষণ পর আবার বের হয়ে এলেন। এখনও রফিকের মাথায় ওই অপরিচিত মানুষের কথাটি ঘুরছে। তাকে অজু করার কথা কেন বলল? সে টর্চ ধরে পিছনে হাঁটছে। নাসির ডাক্তার তার সামনে সামনে হাঁটছেন।

রফিক ভাবল নাসির ডাক্তারকে লোকটির কথা জিজ্ঞেস করবে কি না! অবশেষে প্রশ্ন করেই ফেলল, "আচ্ছা, দরজা কে খুলেছে? লোকটি কে? আগে তো দেখিনি।"

রফিকের কথা শুনে ডাক্তার ছোট করে জবাব দিলেন, "জাফর। তোমাকে ভয় দেখিয়েছে নাকি?"

নাসির সাহেবের ভাগ্যে! তার গলা চিনতে পারল না রফিক! অবশ্য চেনার কথাও না, কয়েক বছর আগে শেষবার তাকে আড়াল থেকে দেখেছে। তবে যাইহোক, তার কথায় রফিক ঠিকই ভয় পেয়েছে, কিন্তু নাসির ডাক্তারকে কিছু বলল না। চুপচাপ হেঁটে বাড়িতে চলে আসল। নাসির ডাক্তার ভিতরে গিয়ে তারিনকে দেখলেন। নাসির ডাক্তারকে আবার যখন বাড়িতে পৌঁছে দিতে গেল তখন আবার ওই 'জাফর' নামের লোকটি দরজা খুলল, রফিক এবারও লোকটিকে দেখতে পেল না।

ভিতর থেকে আবার ঠান্ডা গলায় বলল, "অজু করতে বললাম, করেননি কেন? যান গিয়ে অজু করে শুয়ে পড়ুন।"

লোকটির কথা শুনে দেরি করল না রফিক। দৌড়ে পা চালিয়ে বাইরে বের হয়ে এলো। বাড়িতে ঢুকেই অজু করে নিল, কেন করল জানে না, কিন্তু অজু করে নিল। ভয় পেয়ে করল, না কৌতূহলী হয়ে করল তা রফিক জানে না। করতে ইচ্ছে হলো তাই করল। অজু করে সোজা এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল সে। ছোট একটি হারিকেন জ্বলছে সেই সন্ধ্যা থেকে। বিদ্যুৎ নেই, বিদ্যুৎ খুব কম থাকে। সারারাত জেগে ছিল, এখন চোখ খুলে শুয়ে আছে বিছানায়। রাতে খাওয়া হয়নি, তাই পেট গুড়গুড় করছে। সবদিক থেকে নাজেহাল অবস্থা তার।

সাজেদ এক মুঠ ভাত খেয়েছে, কিন্তু সে খায়নি, পানি খেয়ে আছে। ফজরের আজান কানে আসল। সে রাতেই প্যান্ট পরেছিল। প্যান্ট সাজেদ বানিয়ে দেয়, কালো রঙের লিনেন কাপড়ের প্যান্ট। একটি নয়, দুটি প্যান্ট। শার্টও সাজেদ দেয়। রুমের কোণায় আড়াআড়ি করে বাঁধা একটি দড়ির উপর শার্ট ঝুলছে। রফিকের সব কাপড় এই দড়ির উপর ঝোলে।

কাল কিছু কাপড় রফিক একটি পুঁটলিতে বেঁধে নিয়েছিল। সাজেদ রাতে টাকা দেয়নি, হয়তো ভুলে গিয়েছে, তবে তার কাছে টাকা আছে। তিনশ টাকা জমিয়ে রেখেছিল। তার কেউ নেই, দেশে একটি ভাঙাচোরা বাড়ি আছে শুধু। আত্মীয়স্বজন কেউ নেই বিধায় টাকা খরচ করার দরকারও পড়ে না। যাওয়ার পথে পীর সাহেবের জন্য সন্দেশ কিনে নিয়ে যাবে।

পুঁটলি নিয়ে বের হলো রফিক। হলরুমে আসতেই অন্ধকারের মুখোমুখি হলো। হলরুমের লাইটের সুইচ সিঁড়ির পাশের দেয়ালে। অন্ধকারে যাওয়ার সাহস হলো না। তাই দেয়ালে সুইচবোর্ডের ডান পাশের সুইচটা চেপে নিল। হলরুমের সুইচ এটা। এবার চলল হলরুমের দিকে। হলরুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর দোতলার দিকে তাকাতেই দেখল তারিন দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির মাথায়। চমকে লাফ দিয়ে দুই পা পিছিয়ে গেল রফিক। এই শেষ রাতে

ভূতের মতো কেউ দাঁড়িয়ে আছে সেটা দেখা মোটেও সুখকর নয়, বিশেষ করে এমন মানুষকে দেখা যে ভুলেও এরকম কাজ করে না।

তারিন একটি সালোয়ার-কামিজ পরে আছে। কামিজ উলটো করে পরে আছে যেটা আরও ভয়ংকর করে তুলেছে তারিনকে। তার চোখ আধ-খোলা, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। সে সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নামতে লাগল। রফিক অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, নড়াচড়ার শক্তি যেন হারিয়ে ফেলল সে। তারিন নিচে নামল। রফিক ভেবেছিল হয়তো তাকে কিছু বলবে, কিন্তু তারিন তাকে কিছু না বলে তাকে পার হয়ে সামনের দিকে যেতে গেল। ব্যাপারটি রফিকের কাছে অস্বাভাবিক মনে হলো।

রফিক ডাক দিল, "তারিন! এই তারিন!"

তারিনের মধ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটল না। যেভাবে যাচ্ছিল সেভাবেই দরজার দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করল। রফিক তার হাতের পুঁটলিটি নিচে রেখে দৌড়ে গেল তারিনের সামনে। পথ আটকিয়ে তারিনকে আবার ডাক দিল, "তারিন! কোথায় যাচ্ছ?"

তারিন নিরুত্তর। রোবটের মতো রফিকের দিকে এগিয়ে আসছে। তার মনে হলো তারিন তাকে ধাক্কা দিয়ে চলে যাবে। তারিন তার কাছে আসতেই রফিক তারিনের দুই বাহু ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "তারিন!"

এত জোরে ডাক দিল যে তা বাড়ির দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে রফিকের কানে ফিরে এলো। তারিন ঝাঁকুনি খেয়ে তার দিকে তাকাল, চোখের পলক ফেলল। সে নিজের দুই হাত ছেড়ে দিল। তারিন অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

রফিক তারিনকে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে তোমার?"

তারিন শুধু জিজ্ঞেস করল, "আমি এখানে কেন?"

থতমত খেয়ে গেল রফিক। তারিন নিজেই হেঁটে বের হয়ে যাচ্ছে, আর সে এখন বলছে, সে এখানে কেন। মাথা কাজ করছে না রফিকের।

"রফিক!"

তারিনের গলা শুনে রফিকের বিমূঢ়তা কাটল। সে বুঝতে পারছে এই বাড়িতে নজর পড়েছে। মানুষের না, জিনের নজর। সে তারিনের বাহু ধরে নিয়ে সোফায় বসাল। ডাইনিংয়ে চলে গেল পানি আনতে। পানি এনে দেখল সাজেদও সিঁড়ি বেয়ে নামছে। সেও হতভম্ব হয়ে আছে, সিঁড়ির মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তারিনের দিকে তাকিয়ে থাকল।

রফিক সাজেদকে আসতে দেখে বলল, "আমি বাড়ি যাচ্ছি। পীর সাহেবকে নিয়ে আসব। তুমি কিছুদিন বাড়ি থাকো। কোথাও যেও না।"

রফিকের গলায় আদেশের সুর শোনা গেল। এটুকু বলেই সে ঝড়ের বেগে বের হয়ে গেল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পীর সাহেবকে আনতে হবে এখানে। তিনিই পারবেন এই সমস্যার সমাধান করতে। কত জিন-পেত্নি তাড়িয়েছেন পীর সাহেব! তাঁর চড়-থাপ্পড় খেয়ে অনেক জিন-পরী বধির হয়ে গিয়েছে। তাঁর জুতার আওয়াজ শুনেই তারা পালায়। আর এটি তো সাধারণ মামলা। তাঁর বাম হাতের কাজ। এখন যত দ্রুত সম্ভব দরকার বাড়িতে যাওয়া। পীর সাহেবকে নিয়ে আসা। রফিক বিসমিল্লাহ বলে রওনা হলো নোয়াখালীর উদ্দেশ্যে।
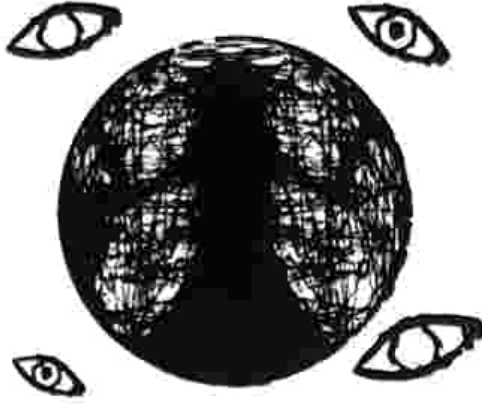
আলোটা বেশি নয়, আবছা আলো, মোমবাতির আলো যেমন হয় ঠিক তেমন। কোনো তীব্রতা বা প্রখরতা নেই সেই আলোতে। এটি যেন দূর থেকে আসা একটি মৃদু আলো। আলোর উৎস কী তা বোঝা যাচ্ছে না, তবে উৎস হতে আলো সমানভাবে বিকিরিত হচ্ছে চারদিকে। যার কিছু পড়েছে তারিনের সামনে। সেই আবছা আলোয় দেখতে পাচ্ছে সে দাঁড়িয়ে আছে একটি নৌকার উপর, সরু ছোট একটি ডিঙি নৌকা, নৌকাটি আলতো করে পানির উপর দিয়ে অজানা গন্তব্যের দিকে ভেসে চলছে। কোথায় যাচ্ছে তা তারিন জানে না। সে শুধু এটাই বুঝতে পারছে যে সে একদম মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। নৌকায় কেউ নেই, সে একাই। কোনো শব্দ নেই। অন্য কোনো প্রাণের অস্তিত্ব নেই।

সবকিছু কেমন নিস্তব্ধ। এত নিস্তব্ধ হয় কী করে? নিস্তব্ধতারও তো শব্দ থাকে। এই নিস্তব্ধতার না আছে কোনো শব্দ, না আছে কোনো অনুভূতি। চারদিক কেমন নিরস হয়ে আছে, কোথাও কোন আনন্দের চিহ্ন নেই, বরং এই নিস্তব্ধতার জগতে নীরবে বিচরণ করছে এক অশুভ ভয়ংকর শোকের ছায়া। আর সেই ছায়ার মধ্য দিয়ে যেন নৌকাটি ভেসে চলেছে।

তারিন চারপাশে তাকাল। যেদিকে তাকায় শুধু পানি আর পানি। পানিও থেমে আছে, কোনো দিকে বইছে না, সেই থেমে থাকা পানির উপর দিয়ে নৌকাটি তুলোর মতো বয়ে চলছে। তারিন কিছুই বুঝতে পারছে না। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নৌকার উপর।

হঠাৎ করে নৌকা দুলতে লাগল। এপাশ-ওপাশ দুলছে। মনে হচ্ছে আচমকা এক বিশাল ভয়ংকর ঝড় এসে আঘাত করেছে এই ডিঙি নৌকাটিকে। কিন্তু ঝড়ের কোনো চিহ্ন দেখল না তারিন, সমস্ত কিছু যেমন নিস্তব্ধ ছিল ঠিক তেমনি আছে, তবে অশুভ ছায়াটি যে তার আশেপাশে ঘুরছে তা সে বুঝতে পারল। এত

জোরে জোরে নৌকা দুলছে যে সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। বেশিক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, উলটে পড়ে যাবে পানিতে।

তারিন বসে পড়ল। বসে নৌকার দুই পাশের গলুই ধরল শক্ত করে। নৌকার দুলুনি কমেনি, বরং ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এত জোরে জোরে দুলছে যে তার মনে হচ্ছে এই বুঝি নৌকাটি উল্টে গভীর পানিতে হারিয়ে যাবে। নৌকাটি এত জোরে দুলতে লাগল যে সে সামলাতে পারছে না, মনে হচ্ছে এই বুঝি পানিতে ছিটকে পড়ে যাবে সে। তারিন ভীষণ ভয় পাচ্ছে। তার আশেপাশে কেউ নেই, শুধু পানি আর পানি।

তারিন চিৎকার করল। চিৎকার করছে ঠিকই কিন্তু কোনো আওয়াজ বের হচ্ছে না তার মুখ থেকে। নিজের চিৎকারের শব্দ নিজেই শুনল না সে। হঠাৎ করে নৌকাটি একটি ঝাঁকুনি খেল। তারিন ঝাঁকুনিটা খুব কষ্টে সামলে উঠল। নৌকা থেকে উল্টে পড়ে যেতে যেতে বেঁচে গেল। সে ঝাঁকুনি সামলে যখন মাথা তুলল, তখন দেখল তার সামনে দুটি পা, বাচ্চার পায়ের মতো দেখতে ছোট ছোট আঙুলের পা।

একদম মাহার পায়ের মতো। তারিন চমকে উঠল। মাহা নাকি এখানে? পিছিয়ে গেল সে। পিছনে দুই হাত দিয়ে ভর দিয়ে সামনে তাকাল। আবছা আলোয় স্পষ্ট তার সামনে ফুটে উঠল একটি ভয়ানক মুখ। মাহার মুখের সাথে কোনো সাদৃশ্য নেই, বরং সেখানে ফুটে উঠেছে এক ভয়ানক চেহারা। প্রাণীটি মাহা নয়, নয় কোনো শিশু, সে যেন অন্য দুনিয়ার ভয়ংকর এক পিশাচ। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো প্রাণীটি উচ্চতায় মাহার সমান, শরীরের গঠন মাহার মতো। সবচেয়ে বিকৃত ব্যাপার হলো যে পিশাচটি উলঙ্গ হয়ে আছে এবং তার সবকিছু কেমন অস্পষ্ট। পিশাচটির আকার একদমই বুঝতে পারছে না তারিন।

আস্তে আস্তে প্রাণীটি একটি মানুষের আকৃতি ধারণ করল। যার মাথা আছে, গলা নেই, বুকের উপরটুকু নেই, তার উপর বুক আড়াআড়ি করে কাটা, মুণ্ডু শূন্যে ভাসছে, মাথায় চুলের পরিবর্তে মেডুসার মতো সাপ। কালো বিষাক্ত সাপ হিসহিস করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বুকের ক্ষত থেকে রক্ত চুয়ে চুয়ে পড়ছে, সেই রক্ত পুরো নৌকাটিকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। তারিন এই বীভৎস পিশাচটিকে আর সহ্য করতে পারল না।

"বাঁচাও! বাঁচাও আমাকে!" তারিন চোখ বন্ধ করে চিৎকার করতে লাগল।

পিশাচটি এগিয়ে আসছে। আস্তে আস্তে পা ফেলে তারিনের দিকে এগিয়ে আসছে। যতবার নৌকার উপর পা ফেলছে ঠিক ততবার নৌকাটি দুলে উঠছে। তারিন পিছিয়ে যাচ্ছে। পিশাচটি যত তারিনের দিকে এগিয়ে আসছে সে তত

পিছিয়ে যাচ্ছে। পিছিয়ে যেতে যেতে সে একদম নৌকার শেষ মাথায় এসে পড়ল। নৌকার গলুই এসে তার হাতে লাগল। সে বুঝতে পারল এ-ই তার শেষ।

তারপর হয় সলিলসমাধি হবে, নাহয় এই জানোয়ারের হাতে প্রাণ দিতে হবে। তারিন তবুও একবার বাঁচার আশায় মাথা ঘুরিয়ে পিছনে দেখল। দেখতে পেল পিছনে সবকিছু ক্যানভাসের মতো লাল। সে যা কিছু দেখছে সব লাল। একটু আগে যে দুনিয়া রঙিন ছিল তা এখন একরঙা হয়ে গিয়েছে। লাল দুনিয়া। আকাশ, পানি, নৌকা সব লাল। তারিন এসব দেখে আরও ভয় পেল। মাথা ঘুরিয়ে দেখতেই বুঝল পিশাচটি খুব কাছে চলে এসেছে। মাংস পোড়ার তীব্র দুর্গন্ধ তারিনের নাকে এসে লাগল।

তারিন সহ্য করতে না পেরে আবার চোখ বন্ধ করে চিৎকার করল, "বাঁচাও! বাঁচাও!"

হঠাৎ করে নৌকা তীব্র ঝাঁকুনি খেল। তারিনের মনে হলো এই বুঝি পিশাচটি তাকে ধরে ফেলবে, তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে শেষ করবে। নিজের শেষ পরিণতি নিজের চোখে দেখতে চায় না, তাই সে চোখ বুজে থাকল। সে আবার ঝাঁকুনি অনুভব করল। ঝাঁকুনির সাথে সাথে ভাসা ভাসা স্বরে আওয়াজ আসল, "আপা! আপা! এই আপা!"

আপা ডাক শুনে তারিন চোখ খুলে তাকিয়ে দেখল আসলান ঝুঁকে আছে তার দিকে। আসলানের পাশে দাঁড়িয়ে মাহা ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে। তারিন কিছুই বুঝতে পারল না। সে উঠে বসল। আসলান সরে গেল। তারিন খাটে হেলান দিয়ে বসল, বসে শুধু চুপ করে থাকল কয়েক মিনিট। দুজন তারিনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। কপাল বেয়ে ঘাম পড়তে লাগল তার। কেমন অস্বস্তি লাগছে। সম্ভবত ঘামের জন্য।

তারিন নিজের ওড়নাটা দিয়ে ঘাম মুছে আসলানের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

আসলান এরকম প্রশ্নে অবাক হয়ে গেল। প্রত্যেকদিন বিকেলে আসলান মাহাকে পড়াতে আসে। মাহাকে পড়াচ্ছে প্রায় তিন মাস যাবৎ। মেয়েটি কথা বলতে পারে না, তবে অত্যন্ত মেধাবী। কম সময়ের মধ্যে সবকিছু শিখে নেয়। বাড়িতে যতদিন পড়াতে আসে ততদিন তারিনকে চোখে পড়ে আসলানের। সাজেদের সাথে কোনোদিন মুখোমুখি দেখা হয়নি, বরাবর তারিনের সাথে দেখা হয়। এটাই স্বাভাবিক কারণ আসলান জানে সাজেদ কত বড় মানুষ। আর বড় মানুষের ব্যস্ততা থাকবে।

আজও বিকেলে মাহাকে পড়াচ্ছিল মাহার রুমে। হঠাৎ করে চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পেল। প্রথমবার শোনার পর কান খাড়া করল আসলান, কিন্তু সাথে সাথে কোন আওয়াজ শুনল না। কিছুক্ষণ পর আবার চিৎকারের আওয়াজ আসল। "বাঁচাও" বলে কেউ চিৎকার দিল। আসলান কান খাড়া করে বুঝতে চেষ্টা করল চিৎকারটি কার। আরেকবার চিৎকারের শব্দ আসার পর সে বুঝতে পারল চিৎকারটি আর কারো নয়, তারিনের।

আসলান দেরি না করে দৌড়ে চলে আসল তারিনের বেডরুমে। এসে দেখল তারিন চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। প্রচণ্ড ঘামছে। আসলান ভয় পেয়ে গেল। কী করবে ভেবে পেল না। তারিন আবার চিৎকার দিয়ে উঠল। আসলান এবার এগিয়ে গিয়ে ঝাঁকুনি দিতে লাগল তারিনের বাহু ধরে। কয়েকবার ঝাঁকুনি দেওয়ার পর চোখ খুলল তারিন।

তারিনের চোখ দেখে অবাক হয়ে গেল আসলান। তীব্র লাল হয়ে আছে তারিনের চোখ। আসলান বুঝতে পারল কিছু ঘটছে এখানে। তারিনকে শক্ত করে দুই হাতে ধরে রাখল সে। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এলো তারিন। আসলান ছেড়ে দেওয়ার পর তারিন উঠে বসল, তারপর তারিনের মুখে প্রশ্ন শোনার পর চমকে উঠল আসলান। সে জানে দুঃস্বপ্ন মানুষ মনে রাখে। স্বাভাবিক মানুষ দিনে মাত্র কয়েকবার দুঃস্বপ্ন দেখে, তাই তা সে মনে রাখতে পারে। তারিনকে যেহেতু এইমাত্র ডেকে তুলেছে, নিশ্চয়ই তারিনের মনে থাকার কথা।

"আপা আপনি দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার দিয়ে উঠেছিলেন।" আসলান ভারী গলায় বলল।

তারিনের সেরকম কিছু মনে পড়ছে না। সে তো ঘুমাচ্ছিল। তবে আবছা লাল কিছুর কথা তার মনের গহিন কোণে উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু কোনো দুঃস্বপ্নের কথা তার মনে পড়ছে না।

তারিন স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিল, "না তো! আমি কিছুই দেখিনি। কী হয়েছে বলো তো?"

তারিনের এমন প্রশ্নে আসলান কী জবাব দেবে ভেবে পেল না। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে তারিনের দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

"এভাবে তাকিয়ে আছ কেন?" ভ্রু কুঁচকে তারিন জিজ্ঞেস করল।

আসলান তারিনের দিকে তাকিয়ে জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "কিছু না।"

তারিন কিছু বলল না। তারিনের মাথা এতটাই ব্যথা করছে যে মনে হচ্ছে কেউ তার মাথায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করছে, থেঁতলে দিচ্ছে তার মাথা।

ডাক্তারের কাছে যাবে যাবে করে আজ যাওয়া হয়নি। কাল সকালেই যাবে। কপালে হাত দিয়ে একটু মালিশ করল।

"আসলান তুমি যাও, আমি নাশতা নিয়ে আসছি," আসলানের দিকে তাকিয়ে তারিন বলল।

"রাত হয়ে গিয়েছে। আজ রাতে এখানে থাকতে পারব?" আসলান হেসে বলল। তার হাসির মধ্যে ইতস্ততা আর দ্বিধার রেশ। যদিও সে যথাসম্ভব স্বাভাবিক থেকে বলার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু আবেগ সামলাতে পারেনি। আসলে সে আর আগে এমন কিছু করেনি। তারিনদের সাথে সেরকম সম্পর্কও তৈরি হয়নি এখনো। খানিক বিব্রত হলো সে। তবে আজকের ব্যাপারটার পিছনে কারণ আছে যথেষ্ট।

"এ তো ভালো খবর! রাতে কী খাবে বলো," উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল তারিন।

আসলান কিছু বলল না। মুচকি হেসে মাহাকে নিয়ে বের হয়ে গেল। তাকে খুঁজছে সরকার, পেলে হয়তো মেরে ফেলবে। দোষ একটাই, ছাত্র ইউনিয়নের নেতা সে। কয়েকদিন যাবৎ স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের চেষ্টা করছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির সব ছাত্র সংগঠন, পিছনে সাপোর্ট দিচ্ছে অনেক রাজনৈতিক দল, সেরকম একটা দলের দলপতি আসলান।

পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে আজ কয়েকদিন যাবৎ। তার আশেপাশের অধিকাংশ ছেলে এখন জেলে। কয়েকজন রিমান্ডে। জিজ্ঞেসবাদ করা হচ্ছে আসলানের জন্য। কিন্তু তারাও জানে না আসলান কোথায়, সে কোন ঘাটের পানি খায়। এই কয়দিন ভার্সিটির বাইরে পালিয়ে থেকে আজ হঠাৎ করে আসলানের মনে পড়ল মাহার বাবার কথা, সে সরকারি দলের এমপি তাই তার বাসায় থাকলে কেউ সন্দেহ করবে না। সেজন্য ইচ্ছে করে থাকার আগ্রহ প্রকাশ করেছে সে। আসলান গিয়ে মাহার রুমে বসল। মাহা এসে বসল আসলানের পাশে। আসলান মাহার দিকে তাকিয়ে হাসল। মাহা হাত নাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল কী হয়েছে তার আম্মুর।

আসলান মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "তোমার আম্মুর কিছু হয়নি।"

মাহা মাথা নিচু করে পড়তে লাগল। পকেট থেকে একটি চিঠি বের করে নিল আসলান। হলুদ কাগজ, চার ভাঁজ। চিঠিটি এসেছে তার গ্রামের বাড়ি থেকে। দুদিন আগে হলে ফিরে দেখে চিঠিটি পড়ার টেবিলের উপর পড়ে আছে। হলুদ রঙের খামে একটি ছোট চিঠি। সেটি আসলানের কোনো আত্মীয় লেখেনি, সোনালি লিখেছে। সোনালির বিয়ের জন্য কথা চলছে, এই নিয়ে সোনালি পরপর কয়েকটি চিঠি দিল।

আসলান একটিরও জবাব দেয়নি। এখন প্রেমে মগ্ন হতে চায় না, দেশ নিয়ে ভাবার সময় এখন। দেশ থেকে এই স্বৈরাচারী সরকার আগে সরাতে হবে। তাছাড়া সব সামলে নেবে সোনালি। ভার্সিটি থেকে আজ তিন মাস হলো সোনালিকে বাড়ি নিয়ে গিয়েছে সোনালির বাবা। আসলান আর সোনালির সম্পর্ক জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। যাইহোক, এসব ভাবতে চায় না আসলান। জীবন নিয়ে যত কম ভাবা যায় তত ভালো। এতে সুখী হওয়া যায়।

আসলান আপাতত সুখি হতে চায়। তিন দিন পর আসন্ন বিক্ষোভ নিয়ে এখন ভাবা যাক। বিক্ষোভ যে করেই হোক সফল করতে হবে। একটি সিগারেট খেতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু এখানে ধরানো যাবে না, বাইরে গিয়ে ধরাতে হবে। মাগরিবের আজান দিল হয়েছে আধ ঘন্টার মতো। অন্ধকার নেমে গিয়েছে, এই অন্ধকারেই এখন সিগারেট খাওয়া যাক।

"মাহা তুমি এগুলো সমাধান করো। আমি একটু নিচে থেকে ঘুরে আসি," মাহাকে বলল আসলান। মাহা মাথা নাড়িয়ে সায় দিতেই নিচে নেমে গেল সে।

হলরুম থেকে বাম দিকে তাকালেই ডাইনিংরুম, ডাইনিংরুমে তাকাতেই তারিনকে দেখল, সেদিকে একবার তাকিয়ে দরজা ঠেলে বের হয়ে আসল। বাইরে এসে বসল সিঁড়ির গোড়ায়। চারদিকে অন্ধকার। দূর থেকে ঝিঁঝি পোকার আওয়াজ আসছে। আসলান পকেট থেকে সিগারেট ঠোঁটে লাগাল। ম্যাচবক্স শার্টের পকেটে ছিল, সেটা পকেট থেকে বের করে একটি শলাকা বের করে জ্বালাল।

যখন শলাকা সিগারেটের কাছে আনল, তখন আগুন নিভে গেল। অবাক হয়ে গেল আসলান। কোনো বাতাস নেই তবুও নিভে গেল শলাকাটি। আবার জ্বালাল একটি শলাকা, এবার আরেক হাত দিয়ে আড়াল করে নিয়ে এলো সিগারেটের দিকে, এবারও সিগারেটের কাছে আনতেই শলাকাটি নিভে গেল। সে অবাক হলো আবার। কোন বাতাস এসে যদি নিভাতো তাহলে তো হাতেও বাতাসের স্পর্শ টের পেত, কিন্তু সেরকম কিছুই হয়নি।

এবার ম্যাচটি সিগারেটের একদম কাছে এনে দুটি শলাকা একসাথে ধরাল, এবার আর সিগারেটের কাছে আনতে হলো না, জ্বলা মাত্রই কে যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল সেটিকে। ফুঁ দেওয়ার স্পষ্ট শব্দ শুনতে পেল আসলান, ফুঁউউউত... । সে দাঁড়িয়ে গেল। চারদিকে একবার চোখ বুলাল, কেউ নেই, দূর থেকে শুধু ঝিঁঝি পোকার শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দও নেই। আসলানের কাছে পরিবেশটা কেমন ভারী হয়ে গেল। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। যুক্তি কাজ করছে না।

বাতাস নেই, কিছু নেই। শলাকাগুলো নিভে গেল কেন! সে সিগারেটটি ছুড়ে মেরে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কী ঘটে গেল তার সাথে! বোঝা দূরের কথা, ভাবতেও পারছে না; কারণ সে ইতোপূর্বে কোনোদিন এরকম ঘটনার শিকার হয়নি। পিছনে ফিরে তাকাল। অন্ধকার, কয়েকটা গাছের ছায়া, দূরে মিটমিট করা আলো ছাড়া আর কিছু তার চোখে পড়ল না।

আসলান এসে সোফায় বসল। ব্যক্তিগতভাবে সে সংশয়বাদী। স্বয়ং ঈশ্বর নিয়েই যেখানে তার সংশয়, সেখানে জিন, ভূত, পেত্নি বিশ্বাস করা তো দূরের কথা। সুপারন্যাচারাল কিছু আছে তা-ই বিশ্বাস করে না, আবার প্যারানরমাল। তাহলে একটু আগে কী ঘটল? হয়তো ঘটেছে স্বাভাবিক কিছু, কিন্তু অস্বাভাবিক লেগেছে তার কাছে। সে চিন্তিত ছিল, তাই হয়তো নার্ভ ঠিক রাখতে পারেনি। ফলে ভেঙে পড়েছে এবং হ্যালুসিনেট করেছে।

এরকম হ্যালুসিনেশন হয়। অনেক কারণেই হয়। এসব নিয়ে আর ভাবলে হবে না। মাথা থেকে ঝেড়ে সরাতে চাইল আসলান, তবুও সবকিছু কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে। নিজেকে ভারী ভারী লাগছে, কেন লাগছে জানে না, তবে লাগছে। তার উপর আবার সিগারেট খেতে পারেনি, মরার উপর খাঁড়ার ঘা, সে একরাশ বিরক্তি নিয়ে বসে রইল।
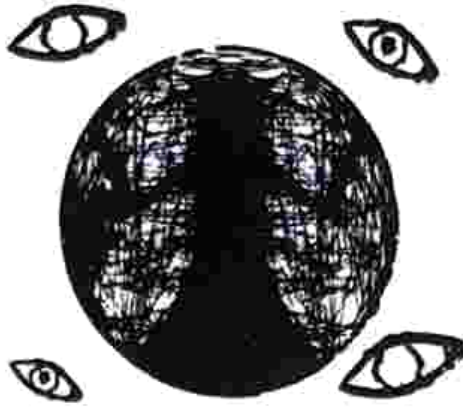
তারিন জেগে আছে, ঘুম আসছে না, কেমন অস্বস্তিকর লাগছে সবকিছু। সন্ধ্যায় বাবা এসেছিল, ঘণ্টা দুয়েক থেকে মেয়েকে দেখে চলে গিয়েছে, যাওয়ার আগে কাল ডাক্তারের কাছে যেতে বলেছে। তারিনও ভাবছে যাবে। কয়েকদিন যাবৎ মাথা প্রচণ্ড ব্যথা করছে। হুট করে চোখ ব্যথাও শুরু হয়, অবশ্য মাথাব্যথা বেশিক্ষণ টেকে না। ঘণ্টা দুয়েক থেকে চলে যায়। যতক্ষণ থাকে প্রচণ্ড কষ্ট দেয়। সাজেদও আজকাল কেমন অদ্ভুত ব্যবহার করছে।

সাজেদকে একদম সহ্য হয় না তারিনের। ওকে দেখলেই শরীর কেমন যেন জ্বালাপোড়া করে। সাজেদ এখন পাশে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। সে বেশিক্ষণ সাজেদের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না। ঘৃণা হয় কেমন। সাজেদ কাত হয়ে শুয়ে আছে, ভাগ্যিস তার মুখ এদিকে ফেরানো নয়, না হয় সামনে থেকে গলা টিপে ধরতো। তারিন উঠে হেলান দিয়ে বসল। নির্ঘুম রাত কাটানো অনেক মুশকিল। সে ঘড়ির দিকে তাকাল।

দুইটা তিন বাজে।

তারিন বিছানা ছেড়ে উঠে বাথরুমের লাইট জ্বালিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। বাথরুমের ছিটকিনি লাগিয়ে পিছন ফিরতেই লাইট নিভে গেল হঠাৎ। সে একদম অবাক হয়ে গেল। সে আবার অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলল, ভয় লাগতে শুরু করল এবার। অন্ধকার দেখলেই তার অনেক ভয় লাগে। এখন অনেক ভয় লাগছে। সে আবার পিছন ফিরল দরজার ছিটকিনি খোঁজার জন্য। হাত দিয়ে এপাশ-ওপাশ খুঁজল ঠিকই কিন্তু কোথাও কোনো ছিটকিনি পেল না। দরজার চ্যাপ্টা পাত শুধু তারিনের হাতে লাগল।

অবাক হলো তারিন। একটু আগেই যেখানে ছিটকিনি লাগাল, এখন সেখানে কিছুই নেই। বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। মনে হলো কেউ তাকে অন্য এক

জগতে টেনে নিয়েছে। সে জগতের ভয়াবহতা সে ঠিকই আঁচ করতে পারল। ভীষণ ভয় পেল সে। ভয় পেয়ে দরজায় জোরে থাপ্পড় দিল।

ধাক্কা দিয়ে ডাকতে লাগল, "সাজেদ! সাজেদ!"

ডাকতে ডাকতে গলা ফাটিয়ে ফেলল তারিন কিন্তু কোনো লাভ হলো না, সাজেদ এসে দরজা খুলল না। এখনও গাঢ় অন্ধকার। সে আবার দরজায় ধাক্কা দিয়ে চিৎকার করল, "সাজেদ! সাজেদ! আমাকে বাঁচাও। আমি এখানে আটকে আছি।"

এবারও লাভ হলো না, ওপাশ থেকে কোনো জবাব আসল না। তারিন এই অন্ধকার সহ্য করতে পারল না। তার ভীষণ কান্না পেল। নিচে ফ্লোরে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, কতক্ষণ কাঁদল জানা নেই। হঠাৎ করে আলো জ্বলে উঠল, রক্তিম একটা আলো, মাথার উপর থেকে আসছে। তারিন মাথা তুলে আলোর উৎস দেখার চেষ্টা করল, কিন্তু কোথাও পেল না। তার মনে হচ্ছে আলো সমস্ত রুম জুড়েই বিদ্যমান।

তারিন মাথা নিচু করে কাঁদছিল, তাই লাইটের আলোয় ফ্লোর স্পষ্ট দেখতে পেল। ফ্লোর লাল হয়ে আছে। স্বপ্নের কথা তার মনে পড়ে গেল। ভয়ংকর দুঃস্বপ্নটা মুহূর্তেই তার সামনে ভেসে উঠল। ভয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল তার। পায়ের দিকে চোখ নিতেই দেখল পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লাল হয়ে আছে। পানি লাল হয়ে আছে নাকি? সে ফ্লোরে ডান হাতের তর্জনী আঙুল ডুবাল। পানির মধ্যে অনায়াসে ডুবে গেল তার আঙুল। সে আঙুলটি পানি থেকে বের করল, আঙুল থেকে কয়েক ফোঁটা লাল পানি নিচে পড়ল, 'টপ' করে একটি শব্দ কানে আসল।

তারিন আঙুল এনে নাকের কাছে ধরল। নাকের কাছে ধরতেই বুঝতে পারল এটি লাল পানি না, এটি রক্ত, মানুষের তাজা গরম রক্ত। তার পেট গুলিয়ে উঠল, পেটের ভিতর থেকে সবকিছু যেন বের হয়ে যেতে চাচ্ছিল। সে বমি করার চেষ্টা করল, কিন্তু বমি আসল না। তার ভিতর অদ্ভুত এক যন্ত্রণা হতে লাগল। আবার চারদিকে তাকাল তারিন। ফ্লোর, দেয়াল, কমোড সমস্ত কিছু লাল হয়ে আছে। কে যেন পুরো বাথরুম রক্তে ভিজিয়ে দিয়েছে। সে এসব সহ্য করতে না পেরে আবার দাঁড়াল। যে করেই হোক তাকে ফিরে যাওয়ার পথ বের করতে হবে। এভাবে বসে থাকলে হবে না। তার মুক্তির পথ তাকেই বের করতে হবে। পিছন ফিরতেই তারিন ভয় পেয়ে পিছিয়ে এলো।

পিছনে কোনো দরজার নেই, সেখানে একটি দেয়াল, স্যাঁতসেঁতে দেয়াল। দেয়ালটি থেকে রক্ত চুয়ে চুয়ে বের হচ্ছে। তারিন নিজের দুই হাত দেখল। সেগুলো রক্তে লাল হয়ে আছে। শুধু দুই হাত নয়, তার জামাও রক্তে ভিজে আছে। সে এসব আর সহ্য করতে পারল না।

চিৎকার করে বলল, "আমার পিছনে কেন পড়ে আছ? আমাকে মুক্তি দাও। আমাকে ছেড়ে দাও।"

তারিন মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। হঠাৎ করে ক্যাচক্যাচ করে একটি শব্দ শুনতে পেল। সেই দেয়ালটি থেকে শব্দ আসছে। সে সরে গেল। দেয়ালটিও আস্তে আস্তে সরে গিয়ে সেখানে একটি অবয়ব ফুটে উঠল। অবয়বটি আসার সাথে সাথে অসহ্য একটি দুর্গন্ধ এসে লাগল তারিনের নাকে। এখন সে একটি ছায়ামূর্তি দেখছে। লম্বা, ধোঁয়ার মতো একটা ছায়ামূর্তি।

আস্তে আস্তে ছায়ামূর্তিটি একটি মানুষে পরিণত হলো, মানুষ বললে ভুল হবে, সে এমন কাউকে দেখছে যার চোখ নেই। চোখের কোটরে শুধু অন্ধকার। মাথার উপর দুটো শিং, দুটো শিংয়ের একটি ভাঙা, সেই শিংগুলোতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। তারিনের বুঝতে বাকি রইল না এটি কে। তার সামনে স্বয়ং শয়তান এসে দাঁড়িয়েছে।

তারিন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। শয়তানটি একটি হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে। হাতটি লোমশ, মনে হচ্ছে পশুর হাত, হাতে অসংখ্য চোখ, সবগুলো চোখ তারিনের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চোখগুলো থেকে লাল রক্ত বেয়ে বেয়ে পড়ছে। চোখগুলো রক্তকান্না করছে।

তারিনের হৃৎপিণ্ড জোরে জোরে লাফাচ্ছে। মাথার মধ্যে আবার সেই ব্যথা শুরু হয়েছে। ব্যথা ভুলে হতবিহ্বল হয়ে সে তাকিয়ে আছে শয়তানটির দিকে। কী করবে বুঝতে পারছে না। হাতটি একটু একটু করে এগিয়ে আসছে তার দিকে। তাকে প্রায় ধরে ফেলবে, ঠিক এমন সময় সে পিছিয়ে গেল। তাকে পিছাতে দেখে শয়তানটিও সামনে এগিয়ে কী যেন বলতে লাগল। তারিন কিছুই বুঝতে পারল না।

তারিন পিছিয়ে যাচ্ছে, শয়তানটিও তার সাথে তাল মিলিয়ে সামনের দিকে আসছে, পিছাতে পিছাতে হঠাৎ দেয়ালের সাথে গিয়ে তারিনের পিঠ ঠেকল। সে কী করবে বুঝতে পারছে না। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে তার। এদিকে শয়তানটির হাত ক্রমাগত তার দিকে এগিয়ে আসছে।

তারিন চোখ বন্ধ করে বলল, "যাও এখান থেকে। আমার থেকে দূরে যাও।"

চিৎকারের মধ্যেই তারিন তার হাতে গরম স্পর্শ টের পেল। স্পর্শের উষ্ণতা তারিনের মস্তিষ্ক নিতে পারল না। সে সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে নিচে লুটিয়ে পড়ল।

****

সাজেদের ঘুম ভেঙে গেল চিৎকারের শব্দে। চিৎকার শুনতেই সে বিছানায় উঠে বসল। চারদিক অন্ধকার। বিদ্যুৎ নেই, নাকি তারিন লাইট বন্ধ করে রেখেছে তা বুঝতে পারল না, কিন্তু রাতে তো সে লাইট জ্বালিয়ে ঘুমায় যাতে তারিন ভয় না পায়। সাজেদের পাশেই টেবিল ল্যাম্পের সুইচ। সে সুইচ চাপতেই ল্যাম্পটি জ্বলে উঠল। বিছানায় তাকিয়ে দেখল তারিন নেই। ধক করে উঠল তার বুক।

সাজেদ বিছানায় বসে ডাক দিল, "তারিন! এই তারিন!"

কোনো জবাব নেই। বিছানা থেকে নামল সাজেদ। বেডরুম থেকে বের হয়ে বারান্দায় এসে লাইট জ্বালিয়ে ডাক দিল, "তারিন! তুমি কোথায়?"

বাড়ির দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে তার ডাক তার কানেই ফিরে এলো। সাজেদ মাহার রুমের দিকে গেল এই আশায় যে, হয়তো তারিন মাহার রুমে শুয়ে আছে। মাহার রুমের দরজা অল্প করে খোলা। দরজা ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকল সে। দেয়ালে বোর্ড খুঁজে লাইট অন করে দেখল বিছানায় মাহা ছাড়া আর কেউ নেই। সে ঘুমিয়ে আছে। সাজেদ আবার লাইট বন্ধ করে বাইরে আসল, বাইরে আসতেই দেখল সিঁড়ির মাথায় আসলান দাঁড়িয়ে আছে।

আসলান সাজেদের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "কী হয়েছে?"

সাজেদ ছোট করে জবাব দিল, "কিছু না। তুমি ঘুমাতে যাও।"

আসলান কিছু না বলে নিচতলায় নামতে লাগল। হঠাৎ করে সাজেদের মাথায় আসল বাথরুমের কথা। বাথরুমে খোঁজা হয়নি। সেখানে থাকতে পারে তারিন। সে এক দৌড়ে বেডরুমে ঢুকল। বাথরুমের সামনে যেতেই দেখল বাথরুমের সুইচ দেওয়া, কিন্তু ভিতরে অন্ধকার, বাথরুমের লাইট বোধ হয় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সাজেদ দরজা ধাক্কা দিল। লাভ হলো না, দরজা ভিতর থেকে খুলল না, দরজা ভিতর থেকে লাগানো।

"তারিন! তারিন!" সাজেদ ডাক দিল, কোনো উত্তর আসল না।

সাজেদ এবার দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিয়ে ডাক দিল, "তারিন! এই তারিন!"

কোনো জবাব নেই। সাজেদ এবার নিজেকে শান্ত করে দরজায় কান পাতল। সে শুনতে পেল তারিন বলছে, "আমার পিছনে কেন পড়ে আছ? আমাকে মুক্তি দাও। আমাকে ছেড়ে দাও।"

এ কথা শোনার পর সাজেদ স্থির থাকতে পারল না। জোরে দরজায় লাথি দিয়ে দরজা ভেঙে ফেলল। দরজা ভাঙার আওয়াজ আসলানও শুনতে পেল। সে-ও দৌড় দিল নিচতলা থেকে। এক দৌড়ে সাজেদের বেডরুমে এসে হাজির হলো। বেডরুমে এসে দেখল সাজেদ বাথরুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

সাজেদ দরজা ধাক্কা দিতেই দেখল অন্ধকারে তারিন দাঁড়িয়ে আছে। সে ভিতরে যত ঢুকছে তারিন তত পিছিয়ে যাচ্ছে আর বলছে, "যাও এখান থেকে। আমার থেকে দূরে যাও।"

অন্যসময় হলে সাজেদ পিছিয়ে যেত কিন্তু সেদিনের মতো আজ আর ভুল করবে না। তারিনকে একা ফেলে কোথাও যাবে না। সাহস নিয়ে ভিতরে ঢুকল সাজেদ। ভিতরে ঢুকতেই পানির স্পর্শ পেল। বাথরুমের কল ছাড়া ছিল, পুরো বাথরুম পানিতে ভেসে গিয়েছে। সাজেদ এগিয়ে গেল। তারিন দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে আছে। সে এগিয়ে গিয়ে তারিনের হাত ধরা মাত্রই তারিন লুটিয়ে পড়ল। সে খপ করে তারিনকে ধরে তাকে কোলে তুলে নিয়ে বাইরে বের হয়ে আসতেই দেখল আসলান দাঁড়িয়ে আছে।

আসলানকে দেখে সাজেদ বলল, "তাড়াতাড়ি পানি নিয়ে এসো।"

আসলান চলে গেল। তারিনকে এনে বিছানায় শুইয়ে দিল সাজেদ। তারিনের কাপড়চোপড় সব ভিজে গিয়েছে, কাপড় থেকে পানি পড়ছে তাই সাজেদের কাপড়ও ভিজে গিয়েছে। তারিনের উপর কম্বল টেনে দিল। আসলান এক গ্লাস পানি এনে এগিয়ে দিল। পানি নিয়ে কয়েকবার তারিনের মুখে ছিটাল সাজেদ। তারিন চোখ খুলে বড় বড় করে তাকাল তার দিকে। শোয়া থেকে এক লাফে উঠেই সাজেদের গলা চেপে ধরল দুই হাত দিয়ে।

তারিন চিৎকার করে বলতে লাগল, "শয়তান! আমাকে তুই মেরে ফেল। আমাকে আর কত কষ্ট দিবি? আমি আর নিতে পারছি না।"

আসলান আর সাজেদ দুজনেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। সাজেদ খুব কষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "তারিন! আমি সাজেদ!"

তারিন আচমকা গলা ছেড়ে দিয়ে বিছানায় নেতিয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়তে লাগল সে। তারিনের ঠোঁট নড়ছে। সাজেদ কথাগুলো বোঝার জন্য নিজের মাথা এগিয়ে দিল তারিনের মুখের দিকে। তারিন ভাঙা ভাঙা স্বরে বলতে লাগল, "আমি আর নিতে পারছি না। আমি মুক্তি চাই।"

ঘুমিয়ে গেল তারিন। আসলান আর সাজেদ দুজন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল তারিনের দিকে। সাজেদ কী করবে বুঝতে না পেরে চুপ করে বসে তারিনের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারিনের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। তার এই অবস্থা দেখে ভিতরটা যেন ভেঙে যাচ্ছে সাজেদের। একবারও মুখ ফুটে বলা হয়নি যে মেয়েটিকে এত ভালোবাসে সে, তাকে একদিন না দেখলে সে অস্থির হয়ে যায়। মেয়েটি যখন ঘুমিয়ে থাকে, সে তখন জেগে থেকে তাকে দেখে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, মেয়েটির অজান্তেই তার কপালে চুমু খায় সে।

"ভাইয়া, সকাল হলেই তাকে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখান। আমার মনে হয় তিনি মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। এখন ঘুমিয়ে পড়ুন। আমি নিচে আছি। কোনো সমস্যা হলে আমাকে ডাক দেবেন।" এই বলে আসলান বের হয়ে গেল।

সাজেদ আসলানকে বের হয়ে যেতে দেখল। তারপর এগিয়ে এসে তারিনের কাপড় খুলতে লাগল। শুকনো জামাকাপড় পরিয়ে ভেজা কাপড়গুলো বাথরুমে রেখে তারিনকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকল সাজেদ। চোখ দিয়ে অঝোরে পানি ঝরছে। সে আটকানোর চেষ্টা করল না, বইতে দিল।
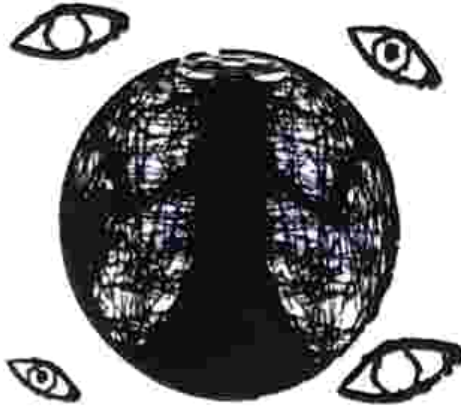
অনেক অসহায় বোধ করছে সাজেদ। রফিকের তীব্র অভাব অনুভব করছে। রফিক থাকলে সব কাজ সে করত, তার চিন্তা করতে হতো না। আজ সারাদিন বাসায়, কোথাও যায়নি। ভোর থেকে একটু পরপর টেলিফোন বেজে উঠছে তাই বিরক্ত হয়ে টেলিফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল সে। রাত থেকেই অপেক্ষা করছে ভোর হওয়ার। ভোর হতেই সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে গেল তারিনকে। সাইকিয়াট্রিস্ট তার পরিচিত ছিল। তাঁর নাম আব্দুর রহমান, ঢাকা মেডিকেলের সিনিয়র সাইকিয়াট্রিস্ট, তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছে তারিনকে। চেম্বারে সাজেদ ঢুকতে পারেনি, শুধু তারিন ছিল, তাকে বাইরে অপেক্ষা করতে হয়েছে।

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে তারিন তাঁর চেম্বারে ছিল। সাজেদের সেই সময়টুকু অস্থিরতার মধ্যে কেটেছে, রুমের বাইরে পায়চারি করে সময় পার করেছে। তারিন যখন বের হয়েছে, সাজেদ দৌড়ে ডাক্তারের কাছে চলে গিয়েছিল। তিনি তেমন কিছু বলেননি, শুধু বলেছেন তারিনকে একা রেখে না যেতে। তারিনের সাথে সবসময় একজনকে রাখতে। সাজেদ যদিও সন্তুষ্ট হতে পারেনি আব্দুর রহমান সাহেবের পরামর্শে। ডাক্তার সাহেব আসার সময় সাজেদের হাতে একটি চিরকুট ধরিয়ে দিয়েছেন। তারিনকে কিছু ওষুধ দিয়েছেন, ঘুমের ওষুধ, ওগুলো খেলে নাকি সুস্থ হয়ে যাবে তারিন। মূল কথা বিশ্রাম দরকার তারিনের। এসবই বলে দিয়েছেন ডাক্তার।

এখন প্রায় মধ্যরাত। সারাদিন তেমন সমস্যা হয়নি। স্বাভাবিক ছিল তারিন। দুপুরে বাইরে থেকে খাবার আনিয়ে সবাইকে খাইয়েছে সাজেদ, যদিও এই দায়িত্ব মাহার গৃহশিক্ষকের উপর দিয়ে গিয়েছে। ছেলেটি আজ সারাদিন মাহার যত্ন নিয়েছে। কোনো অভিযোগ করেনি। যদিও তারিন জোর করেছিল রান্না করার জন্য, কিন্তু সাজেদ দেয়নি। তারিনকে বিছানায় শুইয়ে পাশে শুয়ে থেকেছে সে।

তারিন একটু আগে খেয়ে ঘুমিয়েছে। ঘুমের ওষুধ খাওয়ার কিছুক্ষণ পর তারিন ঘুমে তলিয়ে গিয়েছে।

হাতের ছোট ক্যাসিও ঘড়িটায় সময় দেখল সাজেদ। রাত এগারোটা বিশ। সে বসে আছে হলরুমে। আসলান আর মাহা ছাড়া সুস্থ কেউ নেই। তারিনকে দেখাশোনা করছে সাজেদ, আর মাহাকে আসলান। সকালে যখন তারিনকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় তখন মাহাকে সাথে নিয়েছিল সাজেদ। মাহাকে ওর নানার কাছে রেখে যেতে চেয়েছিল কিন্তু আসলান এসে মাহাকে রেখে দিল, সেও আপত্তি করেনি। ছেলেটির প্রতি কেমন যেন বিশ্বাস জন্মে গিয়েছে তার।

রাতে ডাইনিংরুমে এসে দেখল খাবার রেডি করে রেখেছে আসলান। অবাক হলো সাজেদ কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারল ছেলেটি হয়তো রান্না জানে। খেতে গিয়ে আরও অবাক হলো। রান্না অনেক সুস্বাদু ছিল। একদম পাকা রাঁধুনির মতো ছেলেটির রান্নার হাত। মুরগির ঝোলের স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে সাজেদের। তার সাথে বেগুন ভাজা। রাতে তৃপ্তি সহকারে খেয়েছে সবাই।

"ভাই সিগারেট খাবেন?"

পিছনে ফিরে দেখল আসলান দাঁড়িয়ে আছে। আসলান সাদা একটি পাঞ্জাবি পরে আছে, পাঞ্জাবির উপরের দুটি বোতাম খোলা, সে কারণে পাঞ্জাবির একপাশ ভাঁজ হয়ে আছে। বেখাপ্পা লাগছে কেমন। সাজেদ প্রথমে দেখেই আন্দাজ করতে পারল যে ছেলেটি ভীষণ দুরন্ত। সে যে ভার্সিটির আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের একজন নেতা তা বুঝতেও বাকি রইল না। সাজেদের আদেশেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ তল্লাশি করা শুরু করে, যদিও পুলিশকে অন্য কারণ দেখিয়ে ক্যাম্পাসে ঢুকতে হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত কারণ ছিল এই ছাত্রনেতাদের শায়েস্তা করা। সেদিন বিকেলেই ছেলেটি হাজির হয়েছে তার বাড়িতে। ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছে সে। সাজেদের ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি ফুটে উঠল।

"হ্যাঁ, দাও একটা," সাজেদ দাঁড়িয়ে আসলানের দিকে ফিরে বলল।

আসলান একটি সিগারেট এগিয়ে দিল সাজেদের দিকে। সাজেদ সিগারেটটি নিয়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। দরজা ঠেলে বাইরে গেল সে। আসলান সাজেদকে অনুসরণ করল। সাজেদ পোর্চে এসে দাঁড়িয়ে থাকল কিন্তু পোর্চের সিঁড়িতে বসে পড়ল আসলান। সাজেদ পকেট থেকে দিয়াশলাই বের করে সিগারেট ধরাল, তারপর দিয়াশলাইটা আসলানের দিকে এগিয়ে দিতেই সে সিগারেট ধরিয়ে দিয়াশলাই ফেরত দিল। অন্ধকারের তীব্রতা এত নেই। চাঁদের আলোয় সবকিছু স্পষ্ট। আজ বাকি দিনগুলোর মতো অন্ধকারের রাজত্ব আর এই বাড়ির উপর নেই। চুপচাপ সিগারেট টানছে। কেউ কোনো কথা বলছে না।

"তুমি কোন সাবজেক্টে আছ?" নীরবতা ভেঙে সাজেদ প্রশ্ন করল।

সাজেদের প্রশ্ন শুনে আসলান বড় বড় টান দিয়ে সিগারেটটা শেষ করল। বাকি সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে নিজের পাঞ্জাবিটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, "পরিসংখ্যান।"

সাজেদ আবার প্রশ্ন করল, "হলে থাকো?"

"হ্যাঁ।"

"কোন হল?"

"শহিদুল্লাহ হল।"

"হলের ছেলেদের তো মাথা চলে গিয়েছে। তুমি আবার ওদের মতো হতে যেও না।" সাজেদ কথাটা বলে আড়চোখে তাকিয়ে থাকল আসলানের দিকে।

আসলান চুপ থাকল, কিছুই বলল না, বললেও লাভ হবে না। সে জানে সাজেদ কত চতুর। সে আসলানকে দেখেই তার উদ্দেশ্য বুঝে গিয়েছিল। নিজের পরিবারের কথা ভেবে হয়তো এখনও আসলানকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়নি।

সাজেদ স্বাধীনতার পরপর ভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছিল। বলতে গেলে দেশের ক্রান্তিকালে। সেখান থেকেই সুযোগ লুফে নিয়ে এখন এমপি। সুবিধাবাদী মানুষেরা ভয়ংকর হয়। সে চাইলে আসলানকেও ব্যবহার করবে। তাকে সেই সুযোগ দিতে চায় না আসলান। এখন কিছু বলতে গেলে সমস্যায় পড়বে সে।

আসলান প্রসঙ্গ বদলানোর জন্য বলল, "আপার কী অবস্থা?"

সাজেদ গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, "খেয়েছে। ঘুমের ওষুধ দিয়েছি। ঘুমাচ্ছে এখন।"

"ডাক্তার কী বলেছে?"

"সাইকোটিক ব্রেকডাউন।"

"যা হোক, সুস্থ হয়ে যাবে।" বলতে বলতে আসলান আবার সিঁড়িতে বসে পড়ল।

সাজেদ জবাব দিল না, চুপ থাকল কিছুক্ষণ। সাজেদের মনে প্রশ্ন ঘুরছে আজ সারাদিন, কাউকে বলতে পারছে না, সামনে বসা ছেলেটিকে বলবে কি না সে এখনও নিশ্চিত হতে পারেনি। ছেলেটা হয়তো হেসে উড়িয়ে দেবে।

"সাজেদ!..." দূর থেকে চিৎকার ভেসে আসল।

সাজেদ আওয়াজ শুনে নিজের নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে ব্যাপারটি বুঝতে চেষ্টা করল। চিৎকারটি ছিল তারিনের। কয়েক ন্যানো সেকেন্ডে সাজেদের মস্তিষ্ক সব

প্রসেস করে ফেলেছিল, তাই এক সেকেন্ডও দেরি না করে সে দৌড় দিল। আসলানও উঠে দৌড় দিল সাজেদের পিছু পিছু।

সাজেদ এক দৌড়ে বেডরুমের দরজায় এসে থামল। বেডরুমে উঁকি দিয়ে দেখে তারিন চিত হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। তারিনের নিথর দেহ এমনভাবে বিছানার উপর পড়ে আছে দেখে মনে হচ্ছে সেটির মধ্যে আর কোনো প্রাণ নেই। প্রাণহীন অন্তঃসারশূন্য একটি দেহ রয়েছে সাজেদের সামনে। সে নিজেকে সামলে নিল। ধীরপায়ে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। বিছানার কাছে আসতেই বুঝতে পারল তারিনের চোখ দুটি খোলা। নির্জীব চোখ দুটি উপরের দিকে তাকিয়ে আছে।

সাজেদ তারিনের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

তারিন মাথা ঘুরিয়ে সাজেদের দিকে তাকাল, কিছুক্ষণ তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, তারপর হুট করে বিছানা থেকে উঠে তাকে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল। ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থাকল সাজেদ। তারিনের কান্নার শব্দ তার কানে আসছে। প্রত্যেকটি শব্দ সুঁচের মতো বিঁধছে তার বুকে।

সাজেদ তারিনের মাথায় হাত রেখে বলতে লাগল, "আমি আছি এখানে। কী হয়েছে বলো।"

তারিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আসলান অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কী ঘটছে এই বাড়িতে, কী হচ্ছে এসব! কিছুই মাথায় ঢুকছে না তার। কী বলবে কিছুই বুঝতে পারল না। হঠাৎ তার চোখ পড়ল নিচে। সেখানে একটি ছাপ দেখতে পেল, কালো একটি ছাপ, মনে হলো ছাই দিয়ে ছাপটি করা। ছাপটি পরিষ্কার নয়। সেটি একদম বিছানার কাছে, তারিনের মাথা বরাবর, সেটি দেখার জন্য আসলান এগিয়ে গেল।

ছাপটির কাছে আসল আসলান। উপর থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না তবুও সে বুঝতে চেষ্টা করল। কোনো প্রাণী বা জড়বস্তুর ছাপ মনে হচ্ছে না। কোনো প্রতীকী চিহ্নও নয়। আরও ভালো করে দেখার জন্য সে নিচু হলো। নিচু হতেই সে বুঝল এটি কোনো ছাপ নয়। কী যেন লেখা। স্পষ্ট কিছু একটি লেখা। আসলান পড়তে পারছে না। অচেনা ভাষায় লেখা, একটি হরফও আসলান চিনতে পারল না। পুরোটা কালো কালি দিয়ে লেখা, সেগুলো যেন জ্বলজ্বল করছে আসলানের সামনে।

"আসলান, কী হয়েছে?" বিছানার উপর থেকে বলল সাজেদ।

আসলান মাথা তুলে তাকাল সাজেদের দিকে। তারপর সে আঙুল মুখের কাছে এনে ইশারা করল যাতে সাজেদ চুপ থাকে। সে সাজেদের থেকে চোখ

সরিয়ে যখন লেখাটির দিকে নিল, ততক্ষণে তা গায়েব হয়ে গিয়েছে। কিছুই নেই সেখানে। আসলান চমকে উঠল। মনে হলো ছাপটা উড়ে গিয়েছে কোনোদিকে। এখানে যে কিছু লেখা ছিল তা বোঝারও কোনো চিহ্ন ছিল না। ঝকঝকে ফ্লোরে সে নিজের বিক্ষিপ্ত প্রতিবিম্ব দেখল। একটু আগে সে কী দেখল এখানে? কী ঘটছে এই বাড়িতে?

আসলানের মুখ থেকে অজান্তেই বেরিয়ে আসল, "আল্লাহ!"

আসলান নিজেকে সামলে নিয়ে দাঁড়াল, তারপর আর বেডরুমে থাকেনি, বড় বড় পা ফেলে বাইরে চলে আসল। সে নিজেকে প্রচণ্ড যুক্তিবাদী ভাবত কিন্তু একটু আগে যা ঘটল সেখানে সমস্ত যুক্তি কেমন নস্যাৎ হয়ে গেল। সেদিনের ঘটনাটি যুক্তির কাছে হার মেনেছিল। কিন্তু আজকে! আজকে তো নিজের চোখে সব দেখল আসলান।

না! না!

এখানে কিছু ঠিক নেই। কিছু একটা ঘটে চলছে সবার অগোচরে। অশুভ কিছু। যা এখন আসলান টের পাচ্ছে। সে ধীরপায়ে এগিয়ে এসে সোফায় বসল। নিজের শরীর এলিয়ে দিল সোফার উপর। বসে দরদর করে ঘামতে লাগল। মাথা টনটন করছে। যতটা না দুশ্চিন্তায়, তার থেকে বেশি কনফিউশনে। কপালের দুদিক থেকে ব্যথা শুরু হয়ে মাঝখানে এসে থামছে। ঠিক পরীক্ষার আগের রাতে দুশ্চিন্তায় যেমন ব্যথা হয়।

আসলান চলে গেল। সাজেদ তারিনকে ধরে রেখে তার চলে যাওয়া দেখল। কী ঘটল আসলানের সাথে তা সে এখন পর্যন্ত আন্দাজ করতে পারেনি। তারিনের সাথে কী ঘটছে তা তো আগে থেকেই তার ধরাছোঁয়ার বাইরে। সে তারিনের দিকে মনোযোগ দিল, তারিন এখনও তার বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

"তারিন! তারিন।" সাজেদ বুক একটু কাঁপিয়ে ডাক দিল।

মাথা থেকে হাত সরিয়ে তারিনের কপালে হাত রাখল। জ্বরে তারিনের শরীর পুড়ে যাচ্ছে, একটু আগেই তো ঠিকঠাক ছিল তারিন, হঠাৎ করে এত জ্বর কখন উঠল। চামড়া যেন পুড়ে যাচ্ছে তারিনের।

তারিন বুকে মুখ গুঁজে রেখেই ফিসফিসিয়ে বলল, "ও আমাকে মেরে ফেলবে।"

সাজেদ তারিনকে শক্ত করে বুকের সাথে ধরে বলল, "কে তারিন?"

সাজেদের প্রশ্নে তারিন চুপ হয়ে থাকল। তারিনকে চুপ থাকতে দেখে সে আবার প্রশ্ন করল, "তারিন জবাব দাও। কে তোমাকে মারবে?"

তারিন ফিসফিসিয়ে জবাব দিল, "সাজেদ!"

কথাটা শোনার পর সাজেদ আর স্থির থাকতে পারল না। তারিনকে ছেড়ে দিয়ে বিছানা থেকে উঠে বসল। দ্রুত পা ফেলে বারান্দায় এসে ভেঙে পড়ল কান্নায়। হাঁটু গেড়ে বসে কাঁদতে লাগল। সাজেদের দুনিয়া কেমন যেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কোনো একটি অশুভ শক্তি জোঁকের মতো শুষে নিচ্ছে তার সমস্ত সুখ। সাজেদের কেউ নেই তারিন ছাড়া। বাবা, মা, বোন কেউ নেই, একমাত্র তারিনই তার সম্বল। এখন তারিনের এই অবস্থা। সে আর নিতে পারল না, ভেঙে পড়ল সে, কাঁদতে লাগল সিঁড়ির রেলিং ধরে।

কতক্ষণ কাঁদল ঠিক নেই। কান্নায় পাঞ্জাবির গলা ভিজে গেল। সে কান্না থামাল। চোখ-মুখ মুছে কিছুক্ষণ সময় নিল স্বাভাবিক হওয়ার জন্য, তারপর বেডরুমে তারিনের কাছে ফিরে গেল। তারিনের দিকে তাকিয়ে দেখল সে ঘুমিয়ে আছে। তারিনের মুখটা কালো হয়ে আছে, ঠোঁট দুটি শুকিয়ে ফেটে আছে। বুকটা হাহাকার করে উঠল সাজেদের। সে তারিনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বের হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোফায় বসল। সেখানে আসলান মাথা নিচু করে বসে আছে।

আসলান পায়ের শব্দে মাথা তুলে দেখে সাজেদ এসেছে। তার চোখ-মুখ ফোলা। পাঞ্জাবি ভিজে আছে, মুখে চিন্তার ভাঁজ, চোখ দুটো ছোটাছুটি করছে। এক কথায় বড় বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাকে।

সাজেদের এমন অবস্থা দেখে আসলান প্রশ্ন করল, "কী হয়েছে?"

সাজেদ কোনো জবাব দিল না। সোফার মধ্যে শুয়ে পড়ল। মুখের উপর একটা বালিশ ধরে রাখল। আসলান কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সাজেদের দিকে। আসলানও হেলান দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করল।

বেডরুমে শোয়ার সাহস হলো না আসলানের। একটি অজানা অসংজ্ঞায়িত ভয় কাবু করে নিল তাকে। এখানে এসে ফেঁসে গিয়েছে। কাল সকাল হলেই চলে যাবে হলে। সেখানে না যেতে পারলে গ্রামে চলে যাবে। তার বিশ্বাসের ভিত্তিটা কেমন ভেঙে যাচ্ছে। সে এসব মানে না, মানতে চায়ও না। এসব আজগুবি বিষয় কেবল মানুষকে গোমরাহ করার অস্ত্র। সে নিজে দেখেছে কত নামধারী ভণ্ড পীর মানুষের বিশ্বাসকে পুঁজি করে ধান্দাবাজি করে খায়।

না, এইসব আর মাথায় আনা যাবে না। ঘুমাতে হবে, না হলে আবার হ্যালুসিনেট করবে। পরে হ্যালুসিনেশনের পাল্লায় পড়ে এসব বিশ্বাস করা শুরু করবে। এই বাড়িতে থাকা যাবে না, চলে যাবে সে, এখন শুধু ভোর হওয়ার অপেক্ষা। হ্যাঁ, ভোরের আলোর মধ্য দিয়ে এই অশুভ বাড়ি থেকে প্রস্থান করবে আসলান।
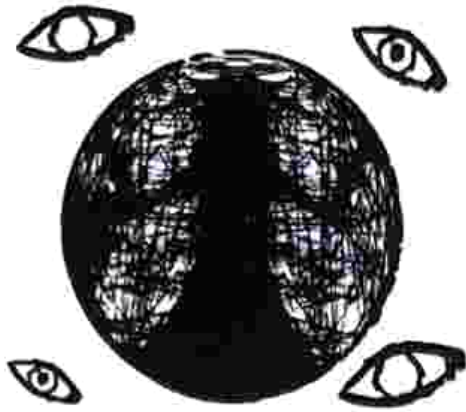
হুজুরকে নিয়ে হাফেজ মিয়ার দিনকাল ভালোই যাচ্ছে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা মক্তবে আসা শুরু করছে, কিছু লোক হুজুরের দাওয়াতে মসজিদেও আসা শুরু করেছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা অনেক কম। হুজুর আর হাফেজ মিয়া মিলেমিশেই রাঁধেন। হুজুর অনেক ভালো মানুষ। অনেক কিছু জানেন। কখনো রেগে কথা বলেন না, সবসময় ঠোঁটের কোণে হাসি ঝুলিয়ে রাখেন।

হুজুর রোয়াকে একটা মাদুর পেতে কুরআন মজিদ পড়ছেন। সেই দুপুরে খাওয়ার পর কুরআন মজিদ নিয়ে বসেছেন, এখনও পড়ে যাচ্ছেন, কতক্ষণ পড়বেন তা হাফেজ মিয়া এতদিনেও আন্দাজ করতে পারেনি। অনেক সময় আছর পর্যন্ত পড়েন, আবার অনেক সময় আধ ঘণ্টা পড়েই উঠে যান।

হাফেজ মিয়া খেয়াল করলেন হুজুর বারবার একটি সূরাই পড়ে যাচ্ছেন। হাফেজ মিয়ার সেই সূরার কয়েকটি আয়াত শরীফও মুখস্থ হয়ে গেল। নিশ্চয়ই সেই সূরার কোনো বিশেষ ফযীলত আছে। হুজুরকে সময় করে এটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে হবে।

গঞ্জের মসজিদ থেকে আজানের শব্দ ভেসে আসছে। গঞ্জের বড় মসজিদে চারটা মাইক লাগানো। যার ফলে আজানের শব্দ দূরদূরান্তেও ভেসে আসে। এই আজানকে অনুসরণ করে এলাকার বাকি মসজিদগুলোতে আজান দেওয়া হয়। হাফেজ মিয়া নিজের রুমে গিয়ে পাঞ্জাবি আর টুপি নিয়ে বের হয়ে এলেন। হুজুরও কুরআন মজিদ বুকে নিয়ে মাদুর গুছিয়ে নিলেন। মাদুর আর কুরআন মজিদ ঘরে রেখে বের হয়ে এলেন।

দুজনেই চুপচাপ হাঁটতে লাগলেন। হুজুর পিছন থেকে বলে উঠলেন, "মুয়াজ্জিন সাহেব কি জানেন যারা জাদু-টোনা করে তাদের শাস্তি কী?"

হাফেজ মিয়া থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, "জাদু-টোনা খারাপ নাকি?"

হুজুর মুচকি হেসে হাফেজ মিয়ার ডান কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, "শুধু খারাপ বললে ভুল হবে, এটা কুফরী। আর যারা কুফরী করে তারা হলো কাফির বা কুফফার। তারা বিনা হিসেবে জাহান্নামী। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ জাদুকরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন, যদি সে মুসলিমও হয়। এই মতের সাথে ইবনে কুদামা রহিমাহুল্লাহ-এর মতের মিল রয়েছে। তাছাড়া এই মতের সাথে অনেক ছাহাবা, আলিম, ইমাম মাশায়েখগণ একমত।"

"জানতাম না তো!" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস বললেন হাফেজ মিয়া।

"আপনাদের জনু কবিরাজ কেমন?" আড়চোখে প্রশ্ন করলেন হুজুর।

প্রশ্ন শুনে খানিকটা অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন হাফেজ মিয়া, তাই ইতস্তত করে বললেন, "না, এমন না।"

"আপনি নিশ্চিত?" হুজুরের প্রশ্নে নিরুত্তর হাফেজ মিয়া।

হুজুর মসজিদে চলে এসেছেন। হুজুর হাফেজ মিয়াকে বললেন, "আপনি একজন কবিরাজের কাছে যাবেন এবং সে যদি আপনাকে এমন কিছু জিজ্ঞেস করে যেমন – আপনার এবং আপনার বাবা মায়ের নাম, আপনার কোনো চিহ্ন, কাপড় অথবা রুমাল ইত্যাদি চায়, কোনো পশু চায়, দুর্বোধ্য মন্ত্র পাঠ এবং লিখে দেয়, নির্দিষ্ট দিনের জন্য ঘর বন্দি থাকতে নির্দেশ দেয়, পানি স্পর্শ থেকে বিরত রাখে, কোনো কিছু পুঁতে রাখার নির্দেশ দেয় বা তাবিজ দেয়, তাহলে বুঝবেন সে কালো জাদুকর।"

হাফেজ নিশ্চুপ। হুজুর মসজিদ দেখিয়ে বললেন, "যান, আজান দিন।"

হাফেজ মিয়া আজান দেওয়ার জন্য চললেন। মনে তাঁর অদ্ভুত এক সন্দেহ দেখা দিয়েছে। জনু কবিরাজ এতদিন পর গ্রামে ফিরেছে। যার কিছু ছিল না সে অঢেল সম্পত্তির মালিক। লোকজন দূরদূরান্ত থেকে তার কাছে আসে। সে কি তাহলে কোনো কালো জাদুকর? যদি তেমন হয় তাহলে তো তাকে শিক্ষা দিতে হবে।

না, হঠাৎ কোনো সিদ্ধান্ত নিলে হবে না। তার সম্বন্ধে আগে ভালো করে খোঁজখবর নিতে হবে। জানতে হবে সে আসলে এমন কেউ কি না। কবিরাজি তো সবাই করে। সবাই জিন পোষে, সবাই কি তাহলে কালো জাদুকর? প্রশ্নগুলো মনে উঁকি দিচ্ছে। সেগুলো মাথায় নিয়েই হাফেজ মিয়া আজান দিতে গেলেন।

আজান শেষ করে তিনি হুজুরের কাছে এলেন। হুজুর অজু শেষ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে কী যেন বিড়বিড় করে পড়তে লাগলেন। হুজুর পড়া শেষ করতেই হাফেজ মিয়া প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, "কী পড়লেন?"

হুজুর মুচকি হেসে বললেন, "কালেমা শাহাদাত।"

হাফেজ মিয়া এটা জানেন, তিনি পাঁচ কালেমা শিখেছেন কিন্তু এখন হুজুর এটা কেন পড়লেন তা তাঁর বোধগম্য হলো না, তাই হুজুরকে প্রশ্ন করলেন, "আকাশের দিকে তাকিয়ে কেন এটা পড়ছিলেন?"

হুজুর মসজিদের দিকে যেতে যেতে বললেন, "হযরত উক্বা ইবনে আমের রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যকার কেউ যদি উত্তম এবং পূর্ণাঙ্গরূপে অজু করার পর বলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসূল, তাহলে ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সে ইচ্ছে করলে এর যেকোনো একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।"

একটি কালেমার এত ফযীলত সেটা হাফেজ মিয়া ভাবতে পারেননি। জীবনে কি কম অজু করেছেন! এত অজুর পর যদি তিনি কালেমা শাহাদাত পড়তেন তাহলে এতদিনে তাঁর কত সওয়াব থাকত।

"চলুন, এখন নামাজ পড়ি।" বলেই হুজুর মসজিদে ঢুকলেন।

হাফেজ মিয়া এক সমুদ্র আফসোস নিয়ে হুজুরের পিছন পিছন গেলেন।
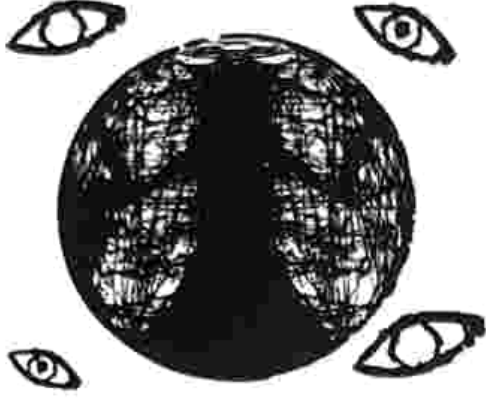
তারিনের ইচ্ছা ছিল না সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাওয়ার। তারিন কি পাগল নাকি যে পাগলের ডাক্তারের কাছে যাবে? তাদের কাছে তো যাবে পাগলরা। যারা মানসিক ভারসাম্যহীন, মানুষের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না, স্বাভাবিক আচরণ করতে পারে না। কিন্তু তারিন তো পুরোপুরি সুস্থ, এসব কিছুই হয়নি তার, তাহলে সে কেন যাবে?

আজ তার বাবা যদি অনুনয় করে না বলত তাহলে কস্মিনকালেও তারিন যেত না। সে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছিল আজ। হাসপাতালে একমাত্র তারিন ছাড়া সবাই অদ্ভুত আচরণ করছিল। সে মাথা নিচু করে বসে ছিল, যদিও সাজেদ পাশে ছিল, কিন্তু সাজেদের উপস্থিতি বিষের মতো লাগে তার কাছে।

সাইকিয়াট্রিস্ট লোকটি ভালো। তারিনের বাবার বয়সি। তাকে অনেক প্রশ্ন করেছে। সে সবগুলোর জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছে। ডাক্তার অবশেষে তারিনকে কিছু ওষুধ দিয়ে বলেছে, সেগুলো খেলে সে সুস্থ হয়ে যাবে। তারিন ডাক্তারের কথামতো রাতে ওষুধ খেয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করল, প্রায় ঘুমিয়েই পড়ল কিন্তু হঠাৎ করে একটা ডাক শুনে আবার জেগে গেল।

"ওঠ," ফিসফিসিয়ে কে যেন বলল।

প্রথমে তারিন পাত্তা দেয়নি, ইদানীং অনেক ভুলভাল শব্দ শোনে, সেগুলোকে গুরুত্ব দিলে ভালো থাকা হবে না; তাই তারিন কান না দিয়ে ঘুমিয়ে থাকল। ভুল শুনেছে হয়তো, চোখ মেলে আর দেখার প্রয়োজন মনে করল না।

এবার কেউ তারিনের বাহুতে ধাক্কা দিয়ে বলল, "উঠতে বললাম না? ওঠ।"

তারিন স্পষ্ট শুনতে পেল কেউ তার কানের কাছে এসে কথাগুলো বলল। কানের কাছে মৃদু উষ্ণতাও অনুভব করল। সে আর ঘুমিয়ে থাকতে পারল না,

জেগে গেল। চোখ খুলতেই দেখল টেবিলল্যাম্প মিটমিট করে জ্বলছে। গভীর ঘুম থেকে জেগে যাওয়ায় চোখ জ্বালা করছে, ঘুম ঠিকমতো হয়নি। সে ভালোমতো চোখ খুলে চারদিকে একবার দেখল। কেউ নেই। তারিন ভুল শুনেছে না হয় স্বপ্ন দেখেছে। তাই সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

এবার আবার কে যেন ফিসফিসিয়ে বলল, "সাজেদ তোকে মেরে ফেলবে।"

তারিন এবার চোখ খুলে তাকাল, আওয়াজ যেদিক থেকে আসছে সেদিকে মাথা ঘুরাল, মিটমিটে আলোতে দেখল কে যেন দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। একটি কালো অবয়ব ফুটে উঠল তারিনের সামনে, যার অনেকটাই তার চোখে ঝাপসা লাগছে। দরজার ওই পাশটায় আলো তেমন যাচ্ছে না, শুধু আবছা আলোয় একটি ছায়া বোঝা যাচ্ছে কিন্তু কে আছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

তারিন শুয়ে থেকেই প্রশ্ন করল, "কে ওখানে?"

কোনো জবাব আসল না। অবয়বটি আগের মতোই দাঁড়িয়ে থাকল। তারিন উত্তেজিত হয়ে গেল। সে আবার বলল, "কে ওখানে? সাজেদ তুমি?"

এবারও কোনো জবাব আসছে না। অবয়বটি আগের মতোই দাঁড়িয়ে আছে। তারিন ওঠার চেষ্টা করল, কিন্তু উঠতে পারল না, তার সমস্ত শরীর হঠাৎ অবশ হয়ে গেল। সে হাত-পা ছুঁড়ল। কিন্তু কিছুই নড়ল না। সবকিছু কেমন পাথর হয়ে গেল। সে জানে এখান থেকে উঠে যেতে না পারলে এই জানোয়ারটা থেকে বাঁচতে পারবে না। সে নিজের সমস্ত শক্তি জড়ো করে উঠতে চেষ্টা করল।

কিন্তু পারল না। নিজের হাত-পায়ের উপরে নিয়ন্ত্রণ নেই তার। নিজের অঙ্গগুলো বেঈমানি করতে শুরু করল তার সাথে। সে বুঝতে পারল এখান থেকে উঠে যাওয়ার আর ক্ষমতা নেই তার। সে স্তব্ধ হয়ে বিছানায় শুয়ে তাকিয়ে রইল পাথরের মতো কালো অবয়বটির দিকে।

কাঁপতে কাঁপতে তারিন আবার অবয়বটির দিকে তাকিয়ে বলল, "কে তুমি?"

এবার অবয়বটি নড়ে উঠল। অন্ধকার থেকে আস্তে আস্তে বের হয়ে আসতে লাগল সেটি। প্রথমে চোখ, তারপর শিং, লাল দুটো আগুনে পোড়া শিং। শিংয়ের উপর জ্বলজ্বল করছে আগুন, ঠিক সেদিন যেভাবে জ্বলছিল সেভাবে। তারিনের বাথরুমের ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল, তাই ভয়ে তার হাত-পা কাঁপতে শুরু করল। শয়তানটি বের হয়ে আসল, চোখ দুটি এবার অন্ধকার নয়, জ্বলজ্বল করে আগুন জ্বলছে চোখে। তার মুখ একদম সাজেদের মতো। সাজেদের মতো নয় যে, পুরোপুরি সাজেদ। শয়তানটি এগিয়ে আসছে। তারিন বিছানায় ছটফট করতে লাগল, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

শয়তানটি যত এগিয়ে আসছে তত গরম অনুভব করছে তারিন। তার মনে হচ্ছে শরীরের চামড়া পুড়ে যাচ্ছে। সে সহ্য করতে পারল না। সে চিৎকার করল, কিন্তু তার গলা থেকে কোনো আওয়াজ বের হলো না, ভিতরেই শেষ হয়ে গেল নিজের আওয়াজ। বিছানায় পড়ে ছটফট করতে লাগল তারিন। নিজের চোখ দুটি বোজার চেষ্টা করল। এই ভয়ানক চেহারা আর দেখতে চায় না সে কিন্তু চোখের পাতা দুটি এক করতে পারল না। কে যেন সেগুলো শক্ত করে ধরে রেখেছে, এক হতে দেবে না চোখের পাতা দুটিকে, শয়তানটি নিজেকে দেখাতে চায়। তারিনকে তিলে তিলে কষ্ট দিতে চায়। তারিনের চোখ বেয়ে পানি পড়তে লাগল। চোখ থেকে গাল, তারপর বিছানায় গিয়ে সে পানি পতিত হলো।

শয়তানটি এগিয়ে এসে তারিনের মাথার কাছে দাঁড়াল। তারিন শয়তানটির চোখের দিকে তাকাল, চোখ দুটি জ্বলছে, প্রথমে অসহ্য লাগলেও এখন আর অসহ্য লাগছে না। তারিন চোখ খোলা রেখে জ্বলতে থাকা চোখ দুটির দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে থাকল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিজের চোখ সরিয়ে নিল সে। মাথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। কেমন ভোঁতা লাগছে চোখ দুটি, এখন আর তেমন যন্ত্রণা হচ্ছে না সেগুলোতে।

শয়তানটিকে এখন আর ভয় লাগছে না তারিনের। মাথা তুলে আবার শয়তানটির দিকে তাকাল, এবার শয়তানটির কপালের দিকে চোখ পড়ল, কপালের উপর আরবি হরফে কী যেন লেখা। তারিন পড়ার চেষ্টা করল, ঠোঁট নেড়ে পড়ল ও। পড়ার পর নিজের শরীরে প্রচণ্ড তাপ অনুভব করল। তারিনের মনে হলো তার শরীরে সমস্ত রক্ত ভিতরে টগবগ করে এমনভাবে ফুটছে যে এই বুঝি তার চামড়া ফেটে রক্ত বের হয়ে আসবে। তারিন সহ্য করতে পারল না।

"সাজেদ! সাজেদ! আমাকে ছেড়ে দাও।" বলে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করল। সে চিৎকার দেওয়ার পর শয়তানটি একটি ক্রূর হাসি দিল। হাসি দেওয়া মাত্র যেন তারিনের সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল।

এই রুমটাও যেন কেঁপে উঠল। কী ভয়ানক হাসির শব্দ। তারিনের ভিতরটাও কাঁপতে লাগল এই হাসির শব্দ শুনে। শয়তানটি হাসি বন্ধ করে আবার তারিনের দিকে তাকিয়ে তার একটি হাত এগিয়ে আনল তারিনের দিকে। লোমশ হাত, হাতে অসংখ্য চোখ, চোখগুলো এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তারিনের দিকে। কী ভয়ংকর দৃষ্টি। তারিনের মনে হলো এই কাল দৃষ্টি তাকে শেষ করে দেবে। সে আর সহ্য করতে পারল না, চোখ বন্ধ করে ফেলল। সে তার গালে শয়তানটির হাতের স্পর্শ পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

****

তারিনের জ্ঞান ফিরল প্রায় মধ্যরাতে। জ্ঞান ফিরেই দেখল জ্বলজ্বল করে আলো জ্বলছে রুমে। পাশ ফিরে দেখে সাজেদ নেই। সে সাজেদকে না দেখতে পেয়ে যেন হাপ ছেড়ে বাঁচল, আজকাল একদম সহ্য হয় না সাজেদকে, এড়িয়ে যেতেই ভালো লাগে। রাতে কী ঘটেছে সমস্ত কিছু ভুলে গেল তারিন। কিচ্ছুটি মনে নেই। সেই শয়তান, তার চোখ কিংবা হাতের ছোঁয়ার কিছুই মনে পড়ল না তার।

তারিনের প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে। আপাতত খেতে হবে তাকে। সে নিজের উপর থেকে কাঁথাটা সরিয়ে হাই তুলে নিচে নামল। স্যান্ডেলগুলোকে উপেক্ষা করে খালি পা ফ্লোরে রাখল। একটু কোমলতা অনুভব করল, কিন্তু তার কেমন যেন গরম লাগছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। নিচে নেমে আস্তে আস্তে বেডরুম থেকে বের হয়ে বারান্দায় আসল।

বারান্দায় লাইট জ্বালানো আছে, হলরুম আলোকিত, সম্ভবত আজ বিদ্যুৎ যায়নি। কোথাও কোনো লাইট বন্ধ করা হয়নি। তারিন দোতলার করিডর থেকে উঁকি দিয়ে নিচে দেখতে পেল সোফায় আসলান শুয়ে আছে। ছেলেটা খুব খেয়ালি। কেউ বেডরুম ছেড়ে হলরুমে ঘুমায়? আসলান থেকে সামনে তাকাতেই দেখল সাজেদও শুয়ে আছে।

সাজেদকে দেখা মাত্রই বিরক্তি লাগা শুরু হলো তারিনের। অসহ্য লাগতে শুরু করল। সে সাজেদের দিকে তাকিয়ে এক দলা থুতু ফেলল। থুতু দোতলা থেকে নিচতলার কার্পেটে গিয়ে পড়ল। সে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রেলিং ধরে আস্তে আস্তে নিচে নেমে গেল।

নিচে নেমেই ডাইনিংরুমে গেল। সাজেদ আর আসলানের দিকে ফিরেও তাকায়নি তারিন। ডাইনিং থেকে পানি খেয়ে নিল। আরেকবার ডাইনিং টেবিলে চোখ বুলিয়ে সে ডাইনিং টেবিলের উপর থেকে বোল তুলে নিল। প্রথম যেই বোলটি তুলল সেখানে ভাত দেখল, সেটি রেখে সামনের বোলটি তুলল, এটি সামনে নিতেই দেখে মাছ ভাজা। মাছ ভাজা নাকের কাছে আনতেই অসহ্য লাগল। কী অসহ্য গন্ধ! পঁচা গন্ধ আসছে মাছ ভাজা থেকে। বোলটি টেবিলে রেখে দিল।

তারপর গেল কিচেনে। কিচেনে গিয়ে দেখল এক কোণায় একটি ছোট ঝুড়ি, ঝুড়িটির উপর অসংখ্য ময়লা, সে ঐ ময়লার ঝুড়ির দিকে এগিয়ে গেল। ঝুড়ির কাছে গিয়ে সেটি সামনে নিয়ে আসল, সেটি আনতেই চোখে পড়ল সবজির খোসা, সেই খোসা থেকে সুগন্ধ আসছে। তারিন ঝুড়িটি মুখের কাছে এনে ধরল। হ্যাঁ, সুগন্ধ আসছে। সে ঝুড়ি থেকে তুলে সবজির খোসা মুখে দিয়ে আস্তে আস্তে খেতে লাগল। খোসার নিচেই মাছের আঁইশ দেখা যাচ্ছে।

মাছের আঁইশের মধ্যে একটি মাঝারি ধরনের মাছ পড়ে আছে। তারিন মাছটি তুলে চোখের সামনে এনে ধরল, তারপর মাছটি মুখের কাছে এনে চিবাতে লাগল। মাছটি থেকে কালো রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল তার ঠোঁটের কিনারা বেয়ে। সে সেগুলো জিহ্বা দিয়ে চেটে নিল। মাছের আঁইশগুলোও বাদ গেল না, সে দুহাত দিয়ে তুলে খেতে লাগল আঁইশ। প্রায় সবগুলো খেল। খাবার খেয়ে পানি পান করলো ডাইনিংয়ে এসে ।

ডাইনিং থেকে হলরুমের দিকে তাকাতেই দেখল সাজেদ দাঁড়িয়ে আছে, সাজেদের পিছনে আসলান। সাজেদের মুখ শুকিয়ে আছে। চোখ দেখে মনে হচ্ছে যেন চোখগুলো কোটর থেকে বের হয়ে আসবে তার। আসলানের ভয়ার্ত চোখ দুটি দেখে ভীষণ হাসি পেল তারিনের। সে হেলেদুলে হা হা করে হাসতে লাগল।

****

খসখস আওয়াজে একটু আগে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আসলানের। আওয়াজ রান্নাঘর থেকেই আসছিল, প্রথমে ইঁদুর ভেবে উড়িয়ে দিল আসলান, কিন্তু আওয়াজ এত জোরে আসছিল যে চোখ লাগাতে পারল না সে। ঘুম আসতে যাবে এমন সময় সেই আওয়াজে তা চলে গেল। সে উঠে পড়ল। আপদ দূর করতে হবে, না হলে ঘুমানো যাবে না। আস্তে আস্তে পা ফেলে কিচেনে গেল, একটু সামনে গিয়েই হতভম্ব হয়ে গেল। তারিনকে দেখল ময়লার ঝুড়ি থেকে মাছের আঁইশ তুলে খাচ্ছে, এটা দেখে আর সহ্য করতে পারল না সে, ফিরে এসে সাজেদকে ডেকে তুলল।

সাজেদ চোখ খুলে বলল, "কী হয়েছে?"

আসলান জবাবে কিছু না বলে শুধু আঙুল দিয়ে ইশারা করল রান্নাঘরের দিকে। সাজেদ বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রান্নাঘরের দিকে তাকাল। কিচেনে মিটমিট করে আলো জ্বলছে, মিটমিট আলোয় দেখতে পেল তারিন রান্নাঘর থেকে এই দিকে এগিয়ে আসছে। তার দুই হাতে নোংরা, সবজির খোসা, মাছের আঁইশ লেগে আছে, সাথে একটি বোঁটকা গন্ধ আসছে তারিনের কাছ থেকে।

সাজেদ বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকল। নিজের চোখকে আজকাল বিশ্বাস করতে পারছে না। কেমন পর পর লাগে! না হয় এত অদ্ভুত কিছু তার দেখতে হয়! আসলানও একদৃষ্টিতে থাকিয়ে থাকল। তারিন আস্তে আস্তে এগিয়ে আসল দুজনের দিকে। তারিন যত এগিয়ে আসল দুর্গন্ধ তত বাড়তে লাগল। আসলানের মনে হলো এই বুঝি সে বমি করে দেবে।

তারিন দুজনের পাশে এসে দাঁড়াল। মুখের চারপাশে লেগে থাকা মাছের আঁইশগুলো বাম হাতের বাহু দিয়ে মুছল সে। হাতটা মুখের কাছে এনে আঁইশগুলো চেটে খেল। গা রি রি করছে আসলানের। সাজেদের দিকে তাকিয়ে দেখে সে চোখ ছানাবড়া করে তারিনের দিকে তাকিয়ে আছে। তারিন আস্তে আস্তে দুজনের মুখের কাছে মুখ নিল। আসলান দুই হাত মুখে চেপে ধরল।

তারিন আর এগোল না। খানিক পিছনে এসে খিলখিল করে হেসে উঠল সে। হাসি দেখে দুজনেই কেঁপে উঠল। যেন একটা ঠান্ডা স্রোত এসে আচমকা তাদের কাঁপিয়ে দিয়েছে। হাসি শেষ করেই তারিন আসলানকে প্রশ্ন করল, "তোকে যে বললাম চলে যেতে, তুই যাসনি কেন?"

তারিনের প্রশ্ন শুনে পেট মোচড় দিয়ে উঠল আসলানের। কয়েকজন মানুষ একসাথে কথা বললে যেমন শোনায় ঠিক তেমনি শোনাল তারিনের গলা। মনে হলো গলা একটি আর আওয়াজ অনেকের। শরীরের লোম দাঁড়ানোর মতো আওয়াজ। আসলানের বুঝতে কিছু আর বাকি রইল না। ওই দুর্বোধ্য ভাষায় লেখাটি তারিন লিখেছিল। যা একটি সতর্কবার্তা ছিল। আসলান কী বলবে ভেবে পেল না।

"তারিন, চলো। বেডরুমে চলো। ঘুমাবে," সাজেদ তারিনের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল।

"খবরদার! এদিকে এগোবি না। হিজড়া কোথাকার। নিজের বউকে খুশি রাখতে পারিস না আবার মাগির কাছে যাস কোন আক্কেলে? আজ গেলি না মাগির কাছে?" তারিন চিৎকার করে বলল। আসলান শুধু অবাক হয়ে কথা শুনল।

সাজেদ কিছু বলল না। এগোতে লাগল তারিনের দিকে।

সাজেদকে এগোতে দেখে তারিন বলল, "খবরদার! এদিকে এগোলে মেরে ফেলব।"

সাজেদ কোনো কথা শুনল না, তারিনের দিকে এগিয়ে গেল, একদম মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল। ঠিক এমন সময় তারিন ধাক্কা দিল সাজেদকে। সাজেদ ছিটকে প্রায় কয়েক গজ দূরে গিয়ে পড়ল। আসলান সাজেদের দিকে ছুটে গিয়ে সাজেদকে তুলল। তারিন এখনও দাঁড়িয়ে আছে, প্রচণ্ড লাল হয়ে আছে তার দুই চোখ। সাজেদ দাঁড়িয়ে আবার তারিনের দিকে এগোল। পিছনে দাঁড়িয়ে থাকল আসলান।

"আসলান, সাহায্য করো। ওকে ধরে রাখতে হবে," সাজেদ চিৎকার দিয়ে বলল।

আসলান এগিয়ে এলো। এবার সাজেদ কায়দা করে জড়িয়ে ধরল তারিনকে। আসলান গিয়ে ধরল তারিনের দুই পা। দুজন ধরা মাত্রই তারিন

নেতিয়ে পড়ল। ভয় পেয়ে গেল। আসলান কী হয়ে গেল তারিনের? মাত্রই একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষকে ছুড়ে ফেলে দিল আর এখন লুটিয়ে পড়ল! দুজনে ধরাধরি করে তারিনকে সোফায় শোয়াল।

আসলান দৌড়ে ডাইনিংয়ে গিয়ে একটি গ্লাসে করে পানি নিয়ে আসল। পানি ছিটাতে যাবে এমন সময় সাজেদ বলল, "পানি ছিটাতে হবে না। বেহুঁশ থাকুক। দেখো তো কয়টা বাজে?"

হলরুমে ঝুলানো দেয়ালঘড়িটার দিকে তাকাল আসলান। দেখল ঘড়ির কাঁটা প্রায় চারটা ছুঁই ছুঁই। সাজেদের দিকে তাকিয়ে বলল, "চারটা।"

সাজেদ জবাব দিল না। একটু পর ফজরের আজান দেবে, আজান শুনতে বড্ড ইচ্ছে করছে সাজেদের, শুনলেই প্রশান্তি লাগবে। সে সোফায় বসে আজানের অপেক্ষা করতে লাগল। মাথায় আসতে থাকা টেনশনগুলোকেও পাত্তা না দেওয়ার চেষ্টা করছে সে। ভেঙে পড়ার আগেই দাঁড়াতে হবে তাকে।

আসলান গ্লাসের পানিটুকু ঢকঢক করে শেষ করল। একটু আগে যা ঘটল তা তার চিন্তাভাবনার বাইরে। একটি মেয়ে একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষকে এত জোরে কী করে ধাক্কা দেয় যে পুরুষটি উড়ে গিয়ে কয়েক গজ দূরে পড়ে? বেশি হলে সরে কয়েক হাত দূরে যাবে। কিন্তু উড়বে কী করে?

এরকম শক্তি তো মানুষের পক্ষে ধারণ করা সম্ভব নয়! আসলান ডাইনিংয়ে গিয়ে আরেক গ্লাস পানি গিলল ঢকঢক করে। সমস্ত ঘর কেমন অস্বাভাবিক ঠান্ডা হয়ে আছে। আসলান এসব ভাবতে চায় না। সে শুধু সকালের সূর্য দেখতে চায়। ডাইনিংয়ে বসে সকাল হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল। একটি ভোর, পুরনো সূর্য, কিন্তু নতুন একটি জীবনের উৎস।
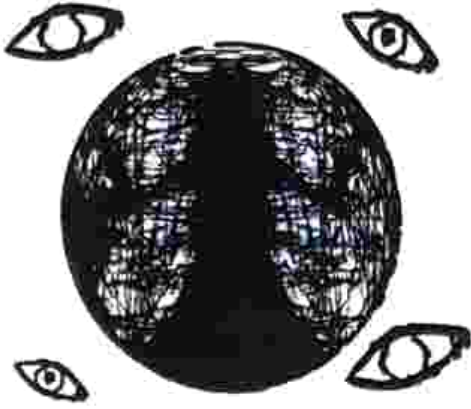
হুজুরকে নিয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রফিক একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বুকের খুব গভীর থেকে চাপা গোঙানির শব্দ ভেসে আসল তার। সবকিছু কেমন বদলে গেল। বাড়িটার দিকে তাকাতেই ভয়ে পেট মোচড় দিয়ে ওঠে রফিকের। বাড়িটার উপর যে অশুভ ছায়া নিজের দখলদারিত্ব দেখাচ্ছে তা আর চোখ এড়াচ্ছে না। সে ছায়া একে একে সবাইকে কালো গহব্বরে ঠেলে দিচ্ছে। রফিককে যে করেই হোক সবাইকে উদ্ধার করতে হবে।

দেশে গিয়ে স্টেশনে নেমেই সোজা চলে গিয়েছে পীর সাহেবের ওখানে। এক হুজুরকে নিয়ে সে আবার ট্রেনে করে ঢাকা চলে এসেছে। সেঁজুতির মাকে আনতে একেবারে ভুলে গিয়েছে। মনে রাখার সময় ছিল কোথায়? গিয়ে সরাসরি পীর সাহেবের কাছে গিয়েছে, সেখান থেকে আবার সরাসরি ঢাকায় ফিরেছে। পীর সাহেব অনেক ব্যস্ত মানুষ তাই ঢাকা আসার জন্য সময় বের করতে পারছিলেন না।

রফিক অনেক জোরাজুরি করলেও লাভ হয়নি, পীর সাহেব আসতে পারবেন না। পরে পীর সাহেব সোনাকান্দায় এক হুজুরের পরিচয় দেন, বলেন তাকে নিয়ে আসতে। রফিক দেরি না করে চলে গিয়েছে সোনাকান্দা। সেখান থেকে হুজুরকে নিয়ে সোজা ঢাকায়।

হুজুর দাঁড়িয়ে আছেন গেটের সামনে। রফিক হুজুরের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, হুজুর এখনও ভিতরে ঢোকেননি, পুরো বাড়িটি দেখছেন। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে হাত দুটো বুকের উপর নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে বাড়িটিতে চোখ বুলাচ্ছেন। রফিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে হুজুর যে দিকে মাথা ঘুরাচ্ছেন সে নিজেও সেদিকে মাথা ঘুরাচ্ছে।

হুজুর অনেকক্ষণ নিবীড় পর্যবেক্ষণের পর রফিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই তো সেই বাড়ি?"

রফিক মাথা নেড়ে সায় দিল। হুজুর তারপর জোরে "আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম" বললেন। এতটাই জোরে বললেন যে দূরে বসে থাকা কুকুরটিও উঠে দৌড় দিল। রফিক সেই কুকুরটির চলে যাওয়া দেখল। তারপর হুজুর চোখ বুজে কী যেন বিড়বিড় করে পড়তে লাগলেন। মাঝেমধ্যে জিহ্বা বের করলেন। রফিক অবাক হয়ে হুজুরের কর্মকাণ্ড দেখতে লাগল।

হুজুর অনেকক্ষণ দোয়া পড়ে রফিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "চলো।"

হুজুর আগে বাম পা বাড়ির ভিতর দিলেন, রফিক হুজুরকে অনুসরণ করে পা ফেলল, ভিতরে ঢুকেই চোখ পড়ল বাগানের দিকে। সবগুলো গাছ মরে গিয়েছে। যাওয়ার দিনও গাছগুলো সতেজ, প্রাণবন্ত, জীবিত ছিল, রাত হলে গাছ থেকে রজনিগন্ধার সুবাস পুরো বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ত, অথচ আজ গাছগুলো মরে গিয়েছে। পাতা শুকিয়ে গিয়েছে, ফুল ঝরে পড়েছে গাছ থেকে, গাছগুলো জীর্ণশীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

"হায় খোদা!" বলেই রফিক দৌড় দিল বাগানের দিকে।

বাগানের কাছে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। দুদিনের ব্যবধানে গাছগুলো কীভাবে মরল তা রফিকের মাথায় আসছে না।

"আগে ভিতরে চলো। সময় খুব কম," পিছন থেকে হুজুর বলে উঠলেন।

রফিক টলতে টলতে দাঁড়াল। তার ভিতরটা ভেঙে গিয়েছে গাছগুলোকে দেখে। নিজের হাতে বাগানটি করেছে সে। যত্ন করে সবগুলো গাছ লাগিয়েছে। নার্সারি থেকে প্রত্যেকটি গাছ পছন্দ করে নিয়েছে। গাছগুলোকে সন্তানের মতো মানুষ করেছে। এগুলোর বিয়োগব্যথা তার কাছে পুত্রবিয়োগের মতোই লাগল। ভিতরটা কষ্টে হুহু করছে রফিকের।

হুজুর আস্তে আস্তে হেঁটে দরজার দিকে গেলেন। দরজা অল্প করে খোলা, দরজার ফাঁক দিয়ে কেমন যেন ঠান্ডা বাতাস আসছে, সেই বাতাস রফিকের গায়ে লাগতেই তার শরীরের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেল। দরজা ধাক্কা দিতেই সে অবাক হয়ে গেল। দরজার দুই কপাট ছড়িয়ে যেতেই রফিক দেখল হলরুম ভরা মানুষ। অনেকেই অচেনা। রফিক সংকোচের মধ্যে দিয়ে ঘরের ভিতর পা রাখল।

রফিক ভিতরে ঢুকে সবার দিকে একবার তাকাল। কেউ খেয়াল করেনি যে সে এসেছে। সে এবার হুজুরের দিকে ফিরে বলল, "আসুন।"

হুজুর আবার দরজার সামনে দাঁড়ালেন। তারপর আবার বিড়বিড় করে "আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম" পড়তে লাগলেন।

রফিক হুজুরের জন্য দাঁড়িয়ে থাকল না। হুজুরের দোয়া পড়তে অনেকক্ষণ সময় লাগবে, সে এগিয়ে ভিতরে ঢুকল, ভিতরে ঢুকতেই রফিককে দেখে মাহা এসে জড়িয়ে ধরল। মাহা তার নানার কোলে ছিল, সেখান থেকেই রফিকের কোলে এলো। রফিক মাহাকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগল। মাহার জন্য নাড়ু নিয়ে এসেছে সে, পরে দেবে। সেগুলো পুঁটলিতে আছে, এত মানুষের সামনে দিলে মানুষজন নজর লাগিয়ে দেবে, বলা তো যায় না কার দৃষ্টি কেমন। সে মাহাকে কোল থেকে নামাল।

মাহা দৌড়ে গিয়ে আবার শহিদের কোলে উঠল। শহিদ মাথা তুলে একবার রফিকের দিকে তাকিয়ে আবার আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে গেল। রফিকের দুই চোখ সাজেদকে খুঁজতে লাগল, দেখল সাজেদ সোফায় মাথা নিচু করে বসে আছে, সে গিয়ে সাজেদের কাছে দাঁড়াল।

"হুজুর নিয়ে এসেছি। চিন্তা করো না। সব ঠিক হয়ে যাবে," রফিক সাজেদকে উদ্দেশ করে বলল।

সাজেদ মুখ তুলে তাকাল। অন্যসময় হলে রফিককে ধমক দিত সে কিন্তু এখন দেবে না। পরিস্থিতি এমন হয়ে গিয়েছে যে এখন আর কোনো কিছু অবিশ্বাস্য লাগে না। কাল রাতের ঘটনার পর তো একদমই লাগে না। কী ঘটল কাল রাতে এখন পর্যন্ত তার কোনো ব্যাখ্যা পাচ্ছে না সাজেদ। তারিনের এক ধাক্কায় তুলোর মতো উড়ে গিয়েছে সে। তাছাড়া অতসীর কথা কীভাবে জানল তারিন?

অতসীর কথা শুধু সাজেদ আর রফিক ছাড়া কেউ জানে না। অতসী সাজেদের রক্ষিতা। সাজেদ তার ধানমন্ডির একটি ফ্ল্যাটে অতসীকে রাখত, তারপর সুযোগ করে সেখানে যেত। দীর্ঘ পাঁচ বছর অতসীর সাথে সম্পর্ক ছিল সাজেদের, কিন্তু মাহা আসার পর সবকিছুই বদলে গেল। অতসীকে টাকা দিয়ে নিজের দেশের বাড়ি পাঠিয়ে দিল। তার মুখ বন্ধ রাখার জন্য টাকার পাশাপাশি তাকে খুন করার হুমকি দিল।

কিন্তু সে খবর তারিনের জানার কথা না। সাজেদ ভাবত অতসীর ব্যাপারটি মাটিচাপা দিয়েছে কিন্তু কাল বুঝল কিছুই আর গোপন থাকেনি। আসলানকেও সকাল থেকে দেখছে না। ভোরেই সাজেদ ফোন দিয়েছে তারিনের বাবাকে। সে চ্যালাচামুণ্ডা নিয়ে সকাল নয়টার মধ্যে হাজির হয়েছে, তারপর থেকে তারিনের পাশেই আছে শহিদ। তার পিএস মাহাকে নিয়ে গিয়েছে। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপার সে-ই সামলেছে। তারিনের বাবার ইচ্ছে ছিল তারিনকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে কিন্তু সাজেদ দেয়নি, বরং ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসেছে। সাজেদের ফোন পেয়ে

দেরি করেননি সাইকিয়াট্রিস্ট আব্দুর রহমান, ছুটে এসেছেন এখানে, এখন আপাতত তারিনের রুমে।

"আসসালামু আলাইকুম।" দরজার কাছ থেকে সালামের শব্দ শুনল সাজেদ।

দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল সাদা পাঞ্জাবি পরিহিত এক হুজুর দাঁড়িয়ে আছেন। বয়স বেশি হবে না, বড়জোর সাজেদ থেকে বছর পাঁচেকের বড় হবে। দাড়িগুলোও পাকেনি, ছিমছাম দেহ, মাঝারি ধরনের উচ্চতা, মুখে হাসি ঝুলে আছে। হুজুরের মাথায় টুপির বদলে কালো কাপড়ের পাগড়ি। তার মাঝখান দিয়ে হুজুরের মাথাভর্তি চুল দেখা যাচ্ছে, চুলগুলোও মিশমিশে কালো। চুল দেখেই যে কেউ আন্দাজ করতে পারবে হুজুরের বয়স বেশি না, চল্লিশ-বিয়াল্লিশের মধ্যে হবে।

হুজুরকে দেখে শফিকুল ইসলামের কথা মনে পড়ে গেল, হাটহাজারি মাদরাসার প্রিন্সিপাল, দুবছর আগের সেই আলোকিত দুটি চোখ যেন এই হুজুরের মাঝে দেখছে সাজেদ। সে চোখ অবনত করে ফেলল। মাথা নুইয়ে সালামের উত্তর দিল। সাজেদ অজান্তেই দাঁড়িয়ে পড়ল, কেন দাঁড়াল জানে না, মন থেকে হঠাৎ শ্রদ্ধাবোধ থেকেই দাঁড়িয়েছে তা সে আন্দাজ করতে পারেনি।

রফিক এগিয়ে গিয়ে সাজেদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল, "হুজুর, এ হচ্ছে সাজেদ। এর কথাই বলেছিলাম। এমপি।"

হুজুর সাজেদের দিকে হাত বাড়িয়ে মুসাফাহা করতে করতে বললেন, "আমি মাওলানা জালাল উদ্দিন। আপনার বাড়িতে অনেক বড় বিপদ আসছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা যদি সহায় হন তাহলে আমি সমাধান করব। তার আগে যদি আমার যোহরের নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করে দিতেন তাহলে ভালো হতো।"

সাজেদ হুজুরের দিকে তাকিয়ে হেসে রফিককে চোখ দিয়ে ইশারা করল। রফিক সাজেদের ইশারা পেয়ে হুজুরকে ডাক দিয়ে বলল, "চলুন। আমি নামাজের ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি।"

রফিক হুজুরকে নিয়ে দোতলায় উঠতে লাগল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই দেখল এক বৃদ্ধ হাতে একটি ব্যাগ নিয়ে বের হয়ে আসছেন। বৃদ্ধ দুজনের দিকে তাকিয়ে একটি মুচকি হাসি দিলেন।

জালাল উদ্দিন আবার জোরে সালাম দিলেন, "আসসালামু আলাইকুম।"

বৃদ্ধ বিড়বিড় করে সালামের জবাব দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামলেন। বৃদ্ধ আর কেউ নন, সাইকিয়াট্রিস্ট আব্দুর রহমান। শেষ পর্যন্ত কেসটি হুজুর পর্যন্ত গড়াল

ভেবে তাঁর ভীষণ হাসি পেল। সাধারণ সাইকোটিক ব্রেকডাউন। সেজন্য রোগী হ্যালুসিনেট করছে আর বিষয়টিকে ওরা কোন জায়গায় নিয়ে গিয়েছে! হুজুর নিয়ে এসেছে ঝাড়ফুঁক করার জন্য। আব্দুর রহমান সাহেবকে দেখেই সাজেদ দাঁড়াল। ডাক্তার সাহেব তাকে বসতে ইশারা করলেন, সাজেদ বসে পড়ল।

"শহিদ সাহেব, এখানে মানুষের মনের রোগ হয়েছে। মানসিক রোগ। আপনার এত লোকজন কোনো কাজে আসবে না। তাদের বলুন বাইরে যেতে," শহিদের দিকে তাকিয়ে আব্দুর রহমান বললেন।

শহিদ মাথা ঘুরিয়ে তাকাতেই সবাই চলে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে সমস্ত রুম আবার আগের মতো ভরে গেল শূন্যতায়। শহিদ এবার আব্দুর রহমানের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার মেয়ের কী হয়েছে বলুন।"

আব্দুর রহমান কথা বলার জন্য মুখ খুললেও থেমে গেলেন। দরজার দিকে তাকালেন। সাজেদ তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে দেখল আসলান দাঁড়িয়ে আছে। দরজায় দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড ঘামছে।

সাজেদ চোখ দিয়ে ইশারা করতেই আসলান সাজেদের কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "তারিন আপা কীসের ছাত্রী ছিলেন?"

এরকম প্রশ্নে অবাক হয়ে গেল সাজেদ। সাজেদ জবাব দিচ্ছে না দেখে আসলান আবার প্রশ্ন করল, "বলুন। তিনি কোন বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন?"

সাজেদ জবাব দিল, "ইকোনমিক্স।"

"কোথা থেকে?" আসলান আবার প্রশ্ন করল।

সাজেদ চট করে জবাব দিল, "চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।"

আসলান আবার প্রশ্ন করল, "তিনি কখনো দেশের বাইরে গিয়েছেন?"

সাজেদ এবার বিরক্ত হয়ে বলল "আগে বলো কী হয়েছে।"

আসলান উত্তেজিত হয়ে বলল, "আপা আর্মাইক ভাষা কী করে জানেন?"

সাজেদ কিছুই বুঝতে না পেরে হাঁ করে আসলানের দিকে তাকিয়ে থাকল। আসলান তার পকেট থেকে একটি কাগজ বের করে দিল সাজেদকে। সাজেদ কাগজ খুলে দেখল কিছু হরফ লেখা। একটিও সাজেদ চিনতে পারল না।

সাজেদ কাগজটি ধরে জিজ্ঞেস করল, "এটি কী?"

সাজেদের প্রশ্ন শুনে উত্তেজিত হয়ে আসলান এক নিঃশ্বাসে বলতে লাগল, "গত রাতের কথা মনে আছে? আমি ফ্লোরে কিছু দেখেছিলাম। ফ্লোরে কিছু লেখা ছিল। আর সেই লেখাতে ব্যবহৃত কিছু অক্ষর আমি আমার মাথায় টুকে নিয়ে এখন গিয়ে লাইব্রেরিতে খুঁজলাম। খুঁজে পেলাম এগুলো আর্মাইক হরফ। হিব্রুর

আগের ভাষা। বিশ্বে খুব কম মানুষ এই ভাষা জানে। বাংলাদেশে কোনো লিংগুইস্ট নেই যে এটি জানবে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কোনো সাবজেক্ট নেই। এমনকি বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। লাইব্রেরিতেও এই সম্পর্কিত কোনো বই ছিল না। পরে আমি ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপকের কাছে গিয়ে অক্ষরগুলো লিখলে তিনি একটি বই দিলেন। যার মধ্যে পেলাম কাল রাতের লেখাটা আর্মাইক ভাষায় লেখা।"

সাজেদ কিছু বলল না, কারণ শেষ রাতে তারিন বলেছিল আসলানকে ওয়ার্নিং দিয়েছে, কী দিয়েছিল তা বোঝেনি। আসলে এত ঝামেলার মধ্যে এ নিয়ে ভাবার আর আলাদা সুযোগ হয়ে উঠেনি। তাকে বলেছিল বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে, আসলান যায়নি। সাজেদও ভেবেছিল আসলান বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে কিন্তু তার ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে ছেলেটি বাড়ি ফিরেছে।

"কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না," পাশ থেকে আব্দুর রহমান বললেন।

সাজেদ আব্দুর রহমানকে বলল, "কিছু না। আপনি তারিন সম্পর্কে বলুন।"

"তারিন সাইকোটিক ডিজঅর্ডারে ভুগছে। পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডারেরও কিছু সিম্পটম পাওয়া গিয়েছে। যাইহোক, এজন্য তীব্র হ্যালুসিনেট করছে। আবোলতাবোল বকছে," আব্দুর রহমান চোখ বুজে বললেন।

"কিন্তু তার শরীরে এত শক্তি আসে কী করে যে সাজেদ ভাইকে দূরে ফেলে দেয়? তাছাড়া সাজেদ ভাইও তো অনেক কিছু অনুভব করেছে। তেমনি আমিও। এটি অন্য ব্যাপার," আসলান পাশ থেকে বলল।

আসলানের কথা শুনে আব্দুর রহমান সাহেব তার দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বললেন, "শোনো ইয়াং ম্যান। মানুষের অনেক শক্তি। তোমার ধারণা নেই যে মানুষের কত শক্তি। মানুষের এই শক্তি আসে সারভাইভাল ইন্সটিংক্ট থেকে। কোনোভাবে তারিনের সারভাইভাল ইন্সটিংক্ট অ্যাক্টিভ হয়ে যায় তাই এত শক্তি দেখায়। তাছাড়া তারিনের রোগ শুধু তারিনের একার নয়। এই বাড়ির সবার। এটাকে বলে শেয়ার্ড সাইকোটিক ডিজঅর্ডার।"

তবুও আসলানের বিশ্বাস হলো না। সে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "ইটস সামথিং এলস।"

আব্দুর রহমান সাহেব সাজেদের কথা শুনে মুচকি হেসে বললেন, "অনেক কিছুই ব্যাখ্যাহীন। ছেলে অসুস্থ হলে মা বুঝে যায়। বৃষ্টির আসার আগে মথ মাটি খুঁড়ে বের হয়, মৃত্যুর আগে মানুষের ব্রেন অসাড় হয়ে যায়, যার ফলে সে এক সময়ে একাধিক স্মৃতি এক্সপেরিয়েন্স করতে পারে। এগুলোর ব্যাখ্যা আছে কোনো? নেই। তাই বলে এগুলো প্যারানরমাল? না, তেমন কিছুই নয়।"

আসলান চুপ করে শুনল। কিন্তু তাকে দেখে মনে হলো না যে সে আব্দুর রহমান সাহেবের কথায় সন্তুষ্ট। মুখে একরাশ চিন্তা আর দ্বিধা।

"আচ্ছা আমি ইনজেকশন দিয়ে এসেছি। টানা দশ ঘন্টা ঘুমাবে। ঘুম থেকে উঠলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি উঠি এখন," আব্দুর রহমান দাঁড়িয়ে বললেন।

আব্দুর রহমান সাহেবের কথায় শহিদ আহত স্বরে বলল, "সে কী! আমার মেয়ে যে এখনও বিছানায় পড়ে আছে! আর আপনি চলে যাচ্ছেন?"

আব্দুর রহমান সাহেব একটু হাসলেন। সাজেদ ধন্যবাদ দিতেই আব্দুর রহমান চলে গেলেন। হলরুমে এখন শুধু শহিদ, সাজেদ আর আসলান।
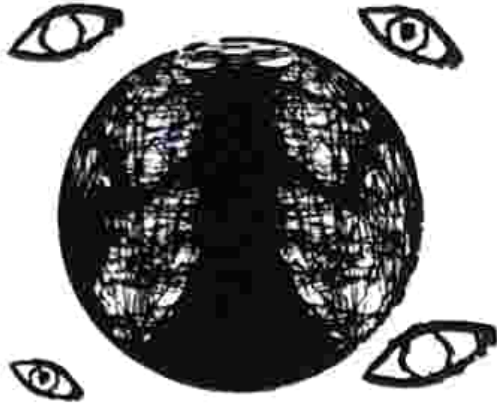
হুজুরকে ঘিরে সবাই বসে আছে। হুজুর একদম সবার মাঝখানে বসে আছেন আর সবাই উৎসুক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। হুজুর কিছুক্ষণ আগে নামাজ পড়ে এলেন, হুজুরের সাথে রফিকও বোধ হয় নামাজ পড়েছে, তার মাথায় টুপি দেখা যাচ্ছে। মাহা সাজেদের কোলে, সাজেদ চুপ করে বসে আছে। আব্দুর রহমান যাওয়ার পর সবাই চুপচাপ, নীরব হয়ে গিয়েছে সব, যাকে বলে পিনপতন নীরবতা। হুজুর নেমে আসার আওয়াজে সবার সেই নীরবতা ভেঙেছে। দুপুরে কারো খাওয়া হয়নি, হুজুর সবাইকে খেতে মানা করেছেন, সে আদেশ সবাই পালন করছে।

হুজুর আসার পর সবাইকে লম্বা করে সালাম দিলেন, তারপর হুজুর এতক্ষণ যাবৎ চোখ বুজে বিড়বিড় করে কী যেন পড়ছেন, মাঝেমধ্যে হাতের আঙুলের কড়া গুনতে দেখা যাচ্ছে। হুজুর এবার সাজেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "জনাব! আমাকে এক গ্লাস পানি এনে দিন।"

হুজুর পানি চাওয়ার পর রফিক ডাইনিংয়ে চলে গেল, এক গ্লাস পানি নিয়ে এসে হুজুরের হাতে দিল, হুজুর পানির গ্লাসটা হতে নিয়ে রফিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শুকরিয়া।"

তারপর হুজুর গ্লাসটা মুখের উপর ধরে বললেন, "জনাব, আপনারা দুজন রোগীর কাছে যান। কোনো অবস্থাতেই রোগীকে বের হতে দেবেন না।"

রফিক আর শহিদ ছাড়া সবাই চমকে উঠল। একটু আগে ডাক্তার সাহেব বলে গেলেন দশ ঘণ্টার আগে ঘুম থেকে উঠবে না আর সেখানে হুজুর বলছেন কিছুক্ষণের মধ্যে উঠে যাবে তারিন। এই কথা শোনার পর উত্তেজনা ধরে রাখতে পারল না আসলান।

প্রশ্ন করে ফেলল, "হুজুর! তাকে তো ঘুমের ওষুধ দিয়ে গিয়েছে।"

"আগেও তো দিয়েছিল একবার। কাজ হয়নি। এবার কী করে হবে?" হুজুর মুখের উপর জবাব দিলেন।

এবার সাজেদ অবাক হলো। ঘুমের ওষুধ দেওয়ার ব্যাপারটা হুজুর কী করে জানলেন! সেদিন তো রফিক বাড়ি ছিল না যে তার কাছ থেকে হুজুর জানবেন। অবিশ্বাস্য সবকিছু কী সাজেদের সাথেই ঘটছে? সাজেদ নির্বাক হয়ে থাকিয়ে থাকল হুজুরের দিকে।

"যান, আপনারা দুজন যান। আর রফিক সাহেব আমার সাথে থাকুক," হুজুর আসলান আর সাজেদকে উদ্দেশ করে বললেন।

দুজন চলে গেল তারিনের কাছে। ধপধপ পা ফেলে দোতলায় হারিয়ে গেল তারা। বেডরুমে হারিয়ে যাওয়া পর্যন্ত রফিক তাদের দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ করল হুজুরের উপর। হুজুর গ্লাসটা মুখের সামনে ধরে কী যেন বিড়বিড় করে পড়লেন।

পড়া শেষ করে রফিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "জনাব আপনি আমার সাথে আসুন।"

এই বলে হুজুর উঠে গেলেন, সাথে রফিকও। হুজুর সামনে সামনে হাঁটছেন, পিছনে পিছনে তাল মিলিয়ে রফিক, তার পিছনে শহিদ। মাহা তার নানার হাত ধরে আছে। শহিদ বাইরে আসতেই দেখল তার লোকজন বাইরে জড়ো হয়ে আছে।

"তাদেরকে বাড়ির বাইরে যেতে বলুন। ত্রিসীমানায় যেন তাদের না দেখা যায়," হুজুর রফিককে বললেন।

রফিক সবাইকে তাড়াতে লাগল। তাড়াতে তাড়াতে একদম মেইন গেটের সামনে এসে সবাইকে বের করে লাগিয়ে দিল গেট। পিছন ফিরতেই দেখল হুজুর পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন।

হুজুর আবার "আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম" পড়ে জোরে জোরে সূরা পড়তে শুরু করলেন।

পড়তে পড়তে গ্লাস থেকে পানি ছিটাতে লাগলেন। একটু পরপর পানি ছিটালেন। পানি ছিটিয়ে আস্তে আস্তে গেট থেকে সরু রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলেন ঘরের দিকে। হুজুর রাস্তায় সূরা পড়ে পানি ছিটাচ্ছেন, রাস্তার দুপাশও বাকি থাকল না, বালিকণাগুলো ভিজতে লাগল হুজুরের ছিটানো পানিতে। পিছন পিছন রফিক আসছে। দরজার কাছে এসে হুজুর পানি ছিটানো বন্ধ করলেন। তারপর গ্লাসটি রফিকের কাছে দিয়ে বললেন, "আরেক গ্লাস পানি নিয়ে আসুন।"

রফিক গ্লাস নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকল। এমন সময় ধুপধাপ শব্দ আসতে লাগলদোতলা থেকে। রফিক কৌতূহলী হয়ে গ্লাস নিয়েই সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল। তারপর আস্তে আস্তে তারিনের রুমের দরজায় উঁকি দিয়ে দেখল দরজার কাছে চিত হয়ে পড়ে আছে আসলান। তার কপাল ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। রফিক এগিয়ে গেল আসলানের কাছে।

আসলান রফিককে দেখেই বলল, "আপাকে ধরো।"

রফিক মাথা তুলে বিছানার দিকে তাকাতেই দেখল তারিন বিছানার উপর লম্বা হয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। তার দুই হাতের মুঠোয় সাজেদ, হাওয়ায় ঝুলছে সে, প্রায় আধমরা হয়ে তারিনের হাতের মুঠোয় ছটফট করছে।

রফিক তাড়াতাড়ি বিছানায় গিয়ে তারিনকে জাপটে ধরে বিছানায় কাত করে শুইয়ে ফেলল। সাজেদ একটু দূরে ছিটকে পড়ল, পরমুহূর্তেই তারিন নিজেকে সামলে নিল, শক্তি জড়ো করে আবার দাঁড়াল। দুই হাত দিয়ে শক্ত করে তারিনের কোমরে নিচের দিকে টেনে ধরে রাখল রফিক। সে একা সামলাতে পারছে না তারিনকে। তারিন রফিককে টেনে নিয়েই উঠে দাঁড়াচ্ছে। আসলান দেখল তারিনের কাছে পরাজিত হচ্ছে রফিক।

আসলান এগিয়ে এসে তারিনের দুই পা একসাথে জড়িয়ে ধরে বিছানায় শোয়ানোর চেষ্টা করল, কিন্তু তেমন কোনো লাভ হলো না। তারিন আসলানের দিকে একবার মাথা ঘুরিয়ে তাকাল, তার লাল চোখ দুটি যেন জ্বলছে; চোখ দেখে ভয়ে আসলান নিজের চোখ বন্ধ করে ফেলল।

সাজেদ নিজেকে সামলে নিতেই দেখল তারিন বিছানায় দাঁড়িয়ে সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করছে। সাজেদ ফ্লোর থেকে কাঁথা তুলে নিল, এগিয়ে এসে কাঁথাটি কায়দা করে তারিনের মাথায় মুড়িয়ে দিল। তারপর দুই হাত দিয়ে জাপটে ধরল আর তৎক্ষণাৎ নিচ থেকে হ্যাঁচকা টান দিল আসলান। রফিক শক্ত করে ধরে রাখল কোমর, সাজেদ মাথা ধরে নিচের দিকে নামিয়ে ফেলল, এবার তারিনকে বিছানায় শুইয়ে ফেলল। রফিক স্পষ্ট শুনতে পেল কাঁথার ভিতর থেকে কে যেন ফোঁস ফোঁস করছে। মানুষ নয়, যেন কোনো বড় সাপ ফোঁস ফোঁস করছে।

এমন আওয়াজ আগে শোনেনি রফিক। ভয়ে তার গলা শুকিয়ে কাঠ। তিনজন তারিনকে ধরে রাখল। তারিন কাঁথার মধ্যেই ছটফট করতে লাগল ছোটার জন্য কিন্তু এবার আর তা সম্ভব হলো না। তিনজন পুরুষের সমস্ত জোর এখন তারিনের উপর। আস্তে আস্তে তারিন শান্ত হলো। ঠিক এই মুহূর্তে নিচ থেকে তীক্ষ্ণ একটি চিৎকার শুনতে পেল সবাই।

রফিকের মনে পড়ল হুজুরের কথা। হুজুর বলেছিলেন গ্লাসে করে পানি নিতে। রফিক তারিনকে ছেড়েই দৌড় দিল, পিছন পিছন আসলান। সিঁড়ি দিয়ে নেমেই দেখল, শহিদ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে দরজার মাঝখানে। রফিক দৌড় থামিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল শহিদের দিকে।

শহিদ দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছে। তার পেছনে দাঁড়িয়ে রফিক বলল, "কী হয়েছে চাচা?"

শহিদ কিছু না বলে রোবটের মতো রফিকের দিকে ঘুরল। রফিক দেখতে পেল শহিদ তার ডান হাতে পানির গ্লাস ধরে রেখেছে। শহিদ তার বাম হাত দিয়ে বাইরের দিকে নির্দেশ করল। রফিক সেই দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখল বাগানের মাঝখানে হুজুর দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি নিজের দুই হাত দিয়ে নিজের গলা ধরে আছেন, আর তাঁর মুখ দিয়ে অনরবরত রক্ত বের হচ্ছে। মনে হচ্ছে মুখ থেকে রক্তের ফোয়ারা তৈরি হয়েছে। হুজুরের সাদা পাঞ্জাবি লাল হয়ে গেল। তা দেখে স্থির থাকতে পারল না রফিক, পিছন দিকে হেলে পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু আসলান ধরে ফেলল।

রফিক ঘাড় ঘুরিয়ে আসলানের দিকে তাকাল, আসলান রফিককে দাঁড় করাল, রফিক দাঁড়িয়ে বাগানের দিকে এক দৌড় দিল। বাগানে গিয়ে হুজুরকে পিছন দিক থেকে ধরল। হুজুরকে ধরতেই তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে রফিকের উপর বমি করলেন, রক্তে রফিকের শার্ট ভিজে গিয়েছে। পিছনে আসলান এসে দাঁড়িয়েছে। রফিকের দৌড় দেখে নিজেকে আটকাতে পারেনি সে, পিছনে পিছনে এসে হাজির হয়েছে বাগানে। আসলানের কী করণীয় তা সে বুঝতে পারছে না। হুজুর অনবরত রক্ত বমি করে যাচ্ছেন আর সেই রক্তে মাটি লাল হয়ে যাচ্ছে।

"তুমি তাঁকে ধর," আসলানের দিকে তাকিয়ে বলল রফিক।

আসলান নিচু হয়ে হুজুরের মাথা ধরল। রফিক এক দৌড়ে নাসির ডাক্তারকে আনতে গেল। আসলান হুজুরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, হুজুর দুটি ঢেকুর দিলেন, তারপর নেতিয়ে পড়লেন আসলানের কোলে।

হুজুর মারা গিয়েছেন। আসলান হুজুরের মাথা ধরে হতভম্ব হয়ে আছে। কখনো এমন মৃত্যু দেখেনি আসলান। আসলানের পুরো হাত রক্তে রঞ্জিত। হুজুরের দেহের দিকে চোখ বুলাল আসলান। হুজুরের সাদা পাঞ্জাবি রক্তে লাল হয়ে আছে। আঁশটে একটা গন্ধ আসলানের নাকে লাগছে।

আসলান সহ্য করতে না পেরে মাটির দিকে চোখ নিল। মাটির দিকে তাকিয়ে দেখল তা-ও রক্তে লাল হয়ে আছে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রক্তে ভেজা লাল মাটির দিকে। হঠাৎ করে তার চোখ পড়ল হুজুরের ডান হাতের

দিকে। হুজুরের বাম হাত তাঁর বুকের উপর, কিন্তু ডান হাত পড়ে আছে মাটির উপরে। আঙুলগুলো মুঠ করা শুধু একটি আঙুল ছাড়া। হুজুরের তর্জনী আঙুল মাটির উপর গাঁথা। আঙুলের মাথায় কী যেন লেখা।

আসলান এত দূর থেকে বুঝতে পারল না। সে হুজুরের মাথা মাটিতে রেখে লেখাটিকে উদ্দেশ্য করে এগিয়ে গেল। কাছে যেতেই রক্তে লাল মাটিতে খোদাই করা লেখাটি স্পষ্ট হয়ে উঠল। আসলান স্পষ্ট দেখল মাটিতে খোদাই করা একটি নাম। নামটি দেখে সারা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল আসলানের, ভালো করে পড়ার আগেই সেটি রক্তে ভেসে গেল।
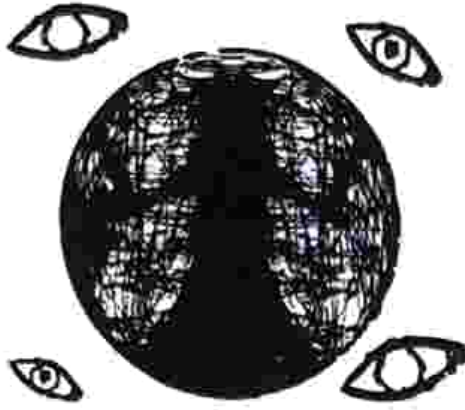
আসলান পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে, নিচে পড়ে আছে হুজুরের মৃতদেহ, তার রক্তে ভিজে আছে মাটি, সে ভেজা মাটি লেগে আছে আসলানের পায়ে। ভেজা মাটির ঠান্ডা অনুভূতি বরফের মতো জমিয়ে দিল তার মেরুদণ্ডকে। সে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে লাশটার কাছে। তার সমস্ত চিন্তা যেন সে ভেজা মাটির শীতলতায় জমে গেল। তার মনে হঠাৎ করে একটি নাম উঁকি দিল।

মাহা!

মাহা শহিদের সাথেই ছিল। যারা বাইরে ছিল তাদের সবাইকে আসলান দেখেছে, কিন্তু মাহাকে দেখেনি। এই অন্ধকারের দামামায় মাহা কোথায়? মাহার কী হয়েছে? মাহাকে কী করেছে? প্রশ্নগুলো মুহূর্তেই খেলে গেল তার মাথায়। কিছুই বুঝতে পারছে না সে। হুজুর মারা যাওয়ার আগে শুধু একটি নাম লিখে যান। সেই নামটির কথা মনে পড়তেই শরীর কেঁপে উঠছে আসলানের। নামটি কী অর্থ বহন করে তা আসলান জানে না, তবে সে বুঝতে পারছে এটিই সব রহস্য উন্মোচনের চাবি, কিন্তু আসলান ভালো করে পড়তে পারেনি সেটি কী ছিল।

এই নামের সাথেই কী জড়িয়ে আছে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা? কোনোক্রমে একমাত্র তারিনই কি সব ঘটনার শিকার? নাকি মাহাসহ বাকিরাও বিপদের মুখে? উত্তর জানা নেই আসলানের। হয়তো কারো কাছে আছে এসব ঘটনার ব্যাখ্যা, নয়তো এখানেই কি শেষ হবে সব? সবার আগে মাহাকে খুঁজে বের করতে হবে। আসলান চারদিকে তাকিয়ে মাহাকে খুঁজতে লাগল। কোথাও পেল না।

সে চিৎকার করে ডাক দিল, "মাহা!"

চারদিকে পাগলের মতো খুঁজতে লাগল আসলানের দুটি চোখ। দৃষ্টির ক্ষিপ্রতায় বাকি রইল না বাড়ির কোনো কোণা। কিন্তু মাহা কোথাও নেই। এখনও

পাথরের মতো দরজার মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে আছে শহিদ, সে এক দৌড় দিল শহিদের দিকে, শহিদ ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে।

আসলান শহিদকে বলল, "মাহা কোথায়?"

শহিদ নিরুত্তর। আসলান আবার জিজ্ঞেস করল, "মাহা কোথায়?"

শহিদ এখনও নিরুত্তর। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। চোখে কেমন একটা শূন্যতা। মানুষ যখন নিজেকে অসহায় মনে করে, তার কাছে যখন সবকিছু অর্থহীন লাগে, যখন পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য কোনো উদ্দেশ্য আর তার কাছে থাকে না; তখন তার চোখে এরকম শূন্য মৃতপ্রায় দৃষ্টি দেখা যায়।

এবার আসলান শহিদের দুই বাহুতে ঝাঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "মাহা কোথায়?"

ঝাঁকি খেয়ে শহিদের সংবিৎ ফিরল। সে বলল, "মাহা?"

বলতে গিয়ে কেঁপে উঠল শহিদ, সেই কাঁপুনি নিজের হাতেও অনুভব করল আসলান। শহিদের বাহু থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিল সে। শহিদ ভাবলেশহীনভাবে নিজের দৃষ্টি ফেরাল তার দিকে। চোখ দুটি আর তেমন শূন্য লাগছে না এখন। চোখ দুটো দেখে মনে হচ্ছে, তাতে কোনো প্রাণ আছে ঠিকই কিন্তু জীবিত মানুষের চোখে যে সজীবতা থাকে, তা এ দুটো চোখে অনুপস্থিত।

আসলান আরও জোরে জোরে বলতে লাগল, "হ্যাঁ মাহা! ও কোথায়?"

শহিদ নিজের বাগানের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলে উঠল, "মাহা চলে গিয়েছে।"

এরকম উত্তর শোনার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না আসলান। সে চিৎকার দিয়ে শহিদকে জিজ্ঞেস করল, "মাহা কোথায় চলে গিয়েছে?"

শহিদ নিজের ডান হাতের তর্জনী দিয়ে উপর দিকে নির্দেশ করল, আসলান সেই নির্দেশনা অনুসরণ করে উপর দিকে তাকাল, কিছুই নেই। আকাশটা একদম শূন্য, যেদিকে চোখ যায় শুধু নীল আকাশ। আশ্চর্য! আকাশে আজ একটি পাখিও নেই। মাহাকে কি আকাশে কেউ উড়িয়ে নিল নাকি!

আসলান নিজের দুহাত আকাশের দিকে তুলে বলল, "হে আল্লাহ! এ কী অবস্থায় ফেললেন আমাদের?"

মুখ নামিয়ে শুনতে পেল শহিদ বিড়বিড় করে বলছে, "মাহা চলে গিয়েছে।"

বারবার এক কথা বলতে লাগল শহিদ। কিছুই বুঝতে পারল না আসলান।

আবার জিজ্ঞেস করল, "চলে গিয়েছে মানে? কোথায় গিয়েছে?"

"হ্যাঁ, চলে গিয়েছে।"

শহিদ নিচে বসে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল আকাশের দিকে। আসলান বুঝতে পারল শহিদ হতবুদ্ধি অবস্থায় আছেন, তার মস্তিষ্ক আটকে আছে যেকোনো একটি ঘটনায়, সেই ঘটনা মাহাকে ঘিরে। আসলানের কানে হঠাৎ করে গেট খোলার আওয়াজ আসল। ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ সে দৃষ্টি নিতে বাধ্য করল গেটের দিকে। সে দেখল রফিক প্রবেশ করেছে। রফিকের সাথে হ্যাংলা-পাতলা প্রৌঢ় একজন লোক, এই ঘটনার মধ্যেই তাঁকে চোখে লাগল আসলানের। রফিক আগে যাচ্ছে, পিছু পিছু লোকটি। সে রফিককে হুজুরের মৃত্যুর খবর বলার জন্য ছুটে গেল।

রফিকের কাছে গিয়েই আসলান হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "হুজুর! হুজুর আমার হাতে...।"

কথা শেষ না করতেই রফিক ধমক দিয়ে বলল, "এখন চুপ থাকো।"

রফিক বাগানে পড়ে থাকা হুজুরের দিকে যেতে লাগল, আসলানও ছুটে আসতে লাগল, দুজনের শঙ্কায় ডুবে যাওয়া চোখ নিবদ্ধ করে রাখল রক্তাক্ত মাটিতে পড়ে থাকা হুজুরের নিথর দেহের দিকে।

লোকটি ডাক্তার, আসলান বুঝতে পারল। লোকটি ঝুঁকে হুজুরের গলায় ধরে পালস চেক করলেন, তারপর হাতে ধরে পালস চেক করলেন, তারপর মাথা নুইয়ে রাখলেন কিছুক্ষণ। আসলান বুঝতে পারল লোকটি মাথা নিচু করে রেখে কিছু পড়ছেন। ডাক্তার যদি হয় তাহলে তিনি আবার কী পড়বেন? বুঝতে পারল না আসলান।

লোকটি রফিকের দিকে মাথা ঘুরিয়ে বললেন, "মারা গিয়েছেন। কী করে মারা গেলেন?"

রফিক কোনো জবাব দিতে পারল না।

"রক্ত বমি করে।" পিছন থেকে আসলান বলল।

ডাক্তার চোখ সরু করে প্রশ্ন করলেন, "রক্ত বমি?"

আসলান কিছুক্ষণ হুজুরের দিকে তাকিয়ে থেকে খুব নিচু স্বরে বলল, "হ্যাঁ।" এই ছোট কথাটুকু বলতে গিয়ে আসলানের গলা কেঁপে উঠল।

"আশ্চর্য! আচ্ছা পুলিশকে খবর দিন। পোস্টমর্টেম করতে হবে। এক কাজ করুন। সাজেদের কাছে নিয়ে যান আমাকে," লোকটি বলল।

আসলান অবাক হলো। লোকটি সাজেদকে কী করে চেনে। লোকটি দাঁড়িয়ে দরজার দিকে যেতে লাগল। এমনভাবে হাঁটতে লাগল যেন এই বাড়ি

তাঁর পরিচিত। বাড়ির নাড়িনক্ষত্র তাঁর চেনা। দরজার গোড়ায় শহিদ বসে ছিল, তিনি তাকে তুললেন। শহিদ ভর করে দাঁড়িয়ে ভিতরে ঢুকল। রফিক আর আসলানও পিছনে পিছনে ঢুকল ঘরের ভিতর।

ভিতরে ঢুকেই লোকটি হাঁটা থামিয়ে রফিককে উদ্দেশ করে বললেন, "আগে এক গ্লাস পানি এনে তাকে দিন।"

রফিক দৌড়ে চলে গেল ডাইনিংয়ের দিকে। আসলান বাইরে মাহাকে খুঁজতে ছিল। বাইরে থেকে ভিতরে শোনা যেতে লাগল আসলানের কাঁপা কাঁপা গলার ডাক। রফিক সেদিকে কান না দিয়ে ডাইনিং থেকে এক গ্লাস পানি এনে শহিদের দিকে এগিয়ে দিল। শহিদ পানিটুকু নিয়ে এক টানে খেল। কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক হয়ে সোফায় বসল শহিদ। দীর্ঘ একটি শ্বাস বেরিয়ে আসল তার মুখ থেকে।

শহিদ রফিকের দিকে তাকিয়ে বলল, "ওকে বলো ডাকাডাকি করতে হবে না। মাহা চলে গিয়েছে।"

রফিক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় গিয়েছে?"

শহিদ ভাসা ভাসা স্বরে জবাব দিল, "চলে গিয়েছে।"

মাহার কথা শুনে রফিকও মাহাকে খুঁজতে চলে গেল। ডাক্তার খুব শান্ত হয়ে বসে তাকিয়ে আছেন শহিদের দিকে। মাঝেমধ্যে চশমা ঠিক করছেন আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বোলাচ্ছেন সবদিকে। একটু পরপর সে দৃষ্টি নিবদ্ধ হচ্ছে শহিদের উপর।

মাহাকে অনেক ডাকাডাকির পরও তার কোনো হদিস পেল না আসলান। ব্যর্থমনোরথ হয়ে হলরুমে ফিরে এলো। ডাক্তারের দিকে একবার তাকিয়ে আসলান শহিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল, "মাহা কোথায়? কী হয়েছে মাহার? আপনি কী দেখেছেন?"

শহিদ কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থাকল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, "আমি যা দেখলাম তা আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি যখন..."

"আপনি যখন কী..." আসলান শহিদের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে আসলান বলল।

শহিদ মাথা তুলে আসলানের দিকে রাগী চোখে তাকিয়ে বলল, "রফিক আসছে না দেখে হুজুর আমাকে পাঠান পানি আনতে। আমি পানি আনতে যাওয়ার সময় হুজুরকে দেখি বাগানের ভিতরে। মাহা একটু দূরে দাঁড়িয়ে হুজুরকে দেখছিল। হুজুর হাত দুটো বুকের কাছে নিয়ে কী যেন করছিলেন। আমি দূর থেকে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আমি পানির গ্লাস নিয়ে এসে দেখলাম হুজুর নিজের গলা ধরে আছেন। আর তাঁর মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে।"

"মাহা কোথায় ছিল?" আসলান প্রশ্ন করল।

শহিদ সরু গলায় বলল, "মাহাকে আমি কোথাও দেখিনি। আমি আমি... খেয়াল করিনি... কিন্তু..."

শহিদ থেমে গেল। পিনপতন নীরবতা সবার মধ্যে বিরাজ করতে লাগল।

সেই নীরবতা ভেঙে ডাক্তার বললেন, "কিন্তু কী?"

শহিদ মুখ তুলে ডাক্তারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল, "আমি দেখলাম কিছু একটি আকাশে উড়ছে। কালো কিছু একটি। আমি ভুল দেখেছি। হ্যাঁ, আমি ভুল দেখেছি। এত বড় জিনিস আবার আকাশে ওড়ে কী করে। আমি ভুল দেখেছি।"

"শহিদ সাহেব আপনি ভুলই দেখেছেন। শান্ত হোন। শান্ত হলে সব ঠিক হয়ে যাবে," পাশ থেকে ডাক্তারের গলা শুনল আসলান।

কিন্তু শহিদের কথা শোনার পর আসলান উত্তেজিত হয়ে গেল, কী করবে বুঝতে পারছে না, সমস্ত বাড়িতে খুঁজেছে সে। মাহার কোনো খোঁজ মিলল না। হঠাৎ করে মেয়েটি কোথায় উধাও হয়ে গেল?

একটু আগেই জলজ্যান্ত একটি মানুষ মারা গেল আসলানের হাতে। এখনও রক্তে লাল হয়ে আছে তার শরীর। এদিকে মাহা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে।

"পুলিশকে ফোন করুন," ডাক্তারটি আসলানের দিকে তাকিয়ে বললেন।

আসলান সংবিত ফিরে পেয়ে চলে গেল টেলিফোনের সামনে, ফোন করল শাহবাগ থানায়, এই একটি থানার টেলিফোন নম্বরই জানা আছে আসলানের।

ডাক্তার এবার শহিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সাজেদ কোথায়?"

শহিদ জবাব দিল না, দোতলার রুমটার দিকে তাকিয়ে থাকল। ডাক্তার সাহেবের বোঝার বাকি থাকল না যে সাজেদ ওই রুমেই আছে। ডাক্তার আস্তে করে ব্যাগ নিচে রেখে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে লাগল। শহিদ এবার দোতলায় সাজেদের বেডরুম থেকে চোখ সরিয়ে তাকিয়ে থাকলেন ডাক্তারের দিকে।

ডাক্তার উঠতে উঠতে বিড়বিড় করে কী যেন পড়তে লাগলেন। ঠিকভাবে বোঝা না গেলেও গুনগুন শব্দ ঠিকই কানে এলো শহিদের। সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে লাগল, শুনতে শুনতে আস্তে আস্তে গড়িয়ে পড়ল সোফায়, তারপর ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে গেল। আর কেউ শুনতে পাচ্ছে না ডাক্তার কী পড়ছেন, কিন্তু যত পড়ছেন তত যেন বাড়িটি জীবন্ত হয়ে যাচ্ছে। বাড়ির ইট-পাথরগুলো যেন আর্তনাদ করে উঠছে, সেই আর্তনাদ শুনে ডাক্তারের ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম একটি হাসি ফুটে উঠল।
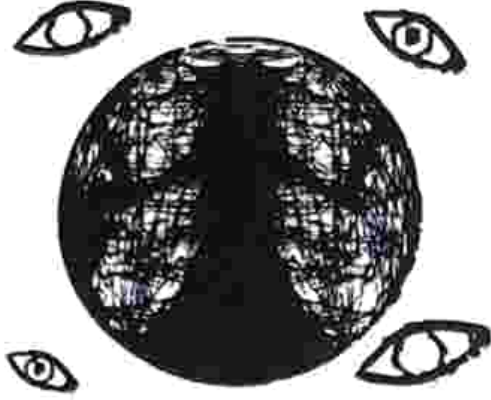
রফিক মাহাকে মাহার রুমে শুইয়ে দিয়ে এসেছে। মাহাকে বাগানের পাশে ঘরটিতে পেয়েছে সে, অজ্ঞান হয়ে ঘরের ভিতরে পড়ে ছিল। সে সমস্ত বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে কোথাও মাহাকে পায়নি, পরে মনে হলো গুদাম ঘরটির কথা। এখান থেকেই সব ঝামেলার শুরু। সে ছুটে গেল গুদাম ঘরে, গিয়ে দেখে মাহা পানির পাম্পটার কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। মাহার সমস্ত শরীরে কাদা লেগে ছিল, তার মুখ পাইপ দিয়ে ঢাকা ছিল, আশেপাশে সমস্ত কিছু ছড়ানো-ছিটানো ছিল।

মাহাকে আনার পর নাসির ডাক্তার এসে দেখে গিয়েছেন, বলেছেন কিছুক্ষণ পর এমনিতেই হুঁশ আসবে মাহার। মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে আছে শুধু, রফিক পানি ছিটিয়ে হুঁশ ফেরাতে চাইলে নাসির ডাক্তার মানা করলেন। পুলিশ এসে হুজুরের লাশ নিয়ে গিয়েছে, কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। শহিদ পুলিশকে যা বলার বলে দিয়েছে। পুলিশ পরে লাশ সোনাকান্দায় পাঠাবে।

রফিক নিজেই যেত যদি না বাড়িতে এত বড় ঝামেলা থাকত, অবশ্য সোনাকান্দায় সাজেদ তার লোক পাঠিয়ে রেখেছে, হুজুরের পরিবারের দেখাশোনার জন্য। রফিক নিচে আসল, নিচে শহিদ বসে আছে, তারিনকেও উঁকি দিয়ে দেখে এসেছে সে। তারিন ঘুমিয়ে ছিল। সারাদিন কারো খাওয়া হয়নি। শহিদ রফিককে দেখে মাথা তুলে বলল, "বাইরে হোটেল থেকে খাবার নিয়ে এসো।"

রফিক কিছু না বলে বাইরে বের হয়ে আসল। বাইরে আসতেই দেখল সাজেদ আসছে। হুজুরের মৃত্যুর প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টা পার হয়ে গেল। ঘণ্টাখানেক আগে হন্তদন্ত হয়ে কোথায় যেন গিয়েছিল সাজেদ। রফিক দেখল হাতে খাবারের ব্যাগ নিয়ে সাজেদ এগিয়ে আসছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে বিরিয়ানির ব্যাগ। অন্য

সময় হলে বিরিয়ানির ব্যাগ দেখে জিভে পানি এসে যায় রফিকের কিন্তু এবার আর তা হলো না, ক্ষুধা মরে গিয়েছে তার।

যাইহোক আর বাইরে যেতে হবে না। সাজেদ মাথা নিচু করে আসছে, তার পিছন পিছন আরেকটি অবয়ব দেখতে পেল রফিক, আস্তে আস্তে অবয়বটি মানুষের রূপ নিল। মানুষই ছিল, রফিক ভুল দেখেছে কারণ তার মাথা ঠিক নেই। তাই এমন অদ্ভুত দেখছে সবকিছু।

কাছে আসতেই সেই মানুষটি স্পষ্ট হয়ে গেল। চোখ বেশ ক্ষিপ্র, সরু নাক। বাদামি রঙের শরীর। লম্বায় প্রায় রফিকের সমান বা তার চেয়ে একটু বেশি। লোকটি হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে রফিকের দিকে। সাজেদ রফিকের কাছে আসতেই রফিক এগিয়ে খাবারের ব্যাগগুলো নিল।

"মাহা কী করছে?" সাজেদ জিজ্ঞেস করতে করতে রফিককে একরকম ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল।

"ঘুমাচ্ছে।" রফিক ছোট করে জবাব দিল।

রফিক দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকবে ঠিক এমন সময় ডাক্তার বলল, "রফিক সাহেব কেমন আছেন? আপনি তাবিজগুলো খুলে ঢুকুন। ভালো হবে।"

রফিকের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। এ তো নাসির ডাক্তারের বাড়ির সেই লোক! মানে তাঁর ভাগ্নে। সেই মোটা ঝাঁঝালো স্বর! রফিকের ভিতরটা নড়ে ওঠে লোকটির কথা শুনে, তাহলে এই জাফর! রফিক তাবিজ পরে আছে, শার্টের নিচে গলায় তাবিজ বাঁধা, কিন্তু ডাক্তার কীভাবে বুঝল? রফিকের পা কাঁপাকাঁপি শুরু হলো। সে ডাক্তারকে খুব ভালো করেই দেখছে। ডাক্তার মাঝারি আকারের, ঢিলেঢালা একটি শার্ট পরে আছে, মুখে দাড়ি, সবগুলো দাড়ি সাদা। চুল ছোট ছোট করে কাটা, কিন্তু চুলগুলো কালো। ডাক্তারের কপালের উপর হুজুরদের মতো একটি দাগ আছে। ডাক্তার রফিকের দিকে তাকিয়ে একটি হাসি দিয়ে আছে।

"আপনি কী করে জানেন আমি তাবিজ পরে আছি?" রফিক তোতলাতে তোতলাতে বলল।

"আপনার গলায় সুতা দেখা যাচ্ছে রফিক সাহেব। তা দেখেই বুঝলাম।" ডাক্তার তার হাত দিয়ে ইশারা করে বলল।

রফিক তার গলার দিকে তাকাল, কিন্তু গলা দেখা যাচ্ছে না। ডাক্তার রফিকের দিকে তাকিয়ে হা হা করে হাসতে লাগল। রফিক ভীষণ ভয় পেল,

তাড়াতাড়ি করে খাবারের প্যাকেটগুলো নিয়ে ভিতরে ঢুকে সোজা চলে গেল ডাইনিংরুমে। ডাইনিং টেবিলের উপর প্যাকেটগুলো রেখে খুলতে লাগল।

ঠিক এমন সময় সাজেদ ডাক দিল, "রফিক, এদিকে এসো।"

আধ খোলা অবস্থায় খাবারের প্যাকেটগুলো রেখেই চলে গেল রফিক। হলরুমে এসে দেখে সবাই বসে আছে। সন্ধ্যা হওয়ার উপক্রম। একটু পর মাগরিবের আজান দেবে। সবার মাঝখানে অদ্ভুত ডাক্তার বসে আছে। ডাক্তার সাহেব লোকটির পাশে একটি খাতা বের করে বসে আছে। কী যেন লিখছে। রফিক গিয়ে সাজেদের পাশে দাঁড়াল।

ডাক্তার রফিকের দিকে তাকিয়ে বলল, "রফিক সাহেব। আপনি জানেন আপনি একটি ধুরন্ধর মানুষ।"

ডাক্তার কী বলল রফিক কিছুই বুঝল না। ডাক্তার এবার সাজেদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি জীবনে অনেক পাপ করেছেন। পাপের উপর দাঁড়িয়ে আছেন আপনি। এখন এই পাপের খেসারত দিচ্ছেন। এই বাড়ির জায়গাটি আপনার ছিল?"

সাজেদ অস্ফুট স্বরে জবাব দিল, "না।"

ডাক্তার আবার বলতে লাগল, "দখল করেছেন, তাই তো? এই বাড়িটির উত্তর দিকে একটি কবর আছে জানেন?"

সাজেদ আবার জবাব দিল, "না।"

ডাক্তার আবার বলল "আমি দেশে ফেরার পর মামা সব বলেছে। এখানে যে সবে বাড়ি বানালেন সেটা দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। মামাকে জিজ্ঞেস করার পর আপনার সব ইতিহাস পেলাম। জোর সবসময় খাটে না। এই জায়গার প্রকৃত মালিককে নলের মাথায় রেখে বাধ্য করেছেন। কবরে গেলে মুনকার আর নকীরকে পারলে নল দেখাবেন।"

জাফর কিছুক্ষণ থেমে বলল, "আপনার শ্বশুর একাত্তরে রাজাকার ছিল। এখন মন্ত্রী। আমি নিজে যুদ্ধ করেছি। আমার সামনে রাজাকার বসে আছে। সে মন্ত্রী, আর আমি সাধারণ একজন শিক্ষক। যার ছাত্রদের উপর আপনারা অত্যাচার চালাচ্ছেন। অথচ আমি কিছু করতে পারছি না। আমি অসহায় বোধ করছি। এর পিছনে আপনি আর আপনার শ্বশুর আছেন।"

কয়েক সেকেন্ড থেমে জাফর আবার বলল, "এই অসহায়ত্ব অনেক বড় একটি ক্ষমতা। মানুষ অসহায় বোধ করলেই চরম মাত্রায় কাজ করতে পারে। দেখুন কী নিষ্ঠুর নিয়তি। আপনাকে এখন আপনার স্ত্রীকে বাঁচাতে আমার কাছে

আসতে হয়েছে। মাফ করবেন। আমি শিক্ষক মানুষ। কথায় ব্যঞ্জনা না লাগিয়ে কথা বলতে পারি না। একটু পর মাগরিবের আজান দেবে। আমি এখন আজান দিব আপনার বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে। আপনাদের সময় কম। বড়জোর দশ মিনিট। এই দশ মিনিটে আপনারা রেডি হয়ে এখানে আসবেন। নামাজ পড়ব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার কাছে আপনারা যদি তওবা না করেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা আপনাদের সাহায্য করবেন না। আমার চিকিৎসাও কাজে আসবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা পবিত্র কুরআনের সূরা বাক্বারার ৪৭ নম্বর আয়াত শরীফে বলেছেন, 'আমি সমগ্র বিশ্বের উপর তোমাদের উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।"

সাজেদ বড্ড বিরক্ত হয়ে বলল, "আপনাকে আনলাম তারিনকে দেখাতে, আপনি এরকম অপ্রাসঙ্গিক কথা বলছেন কেন?"

সাজেদের কথা শুনে জাফর হা হা করে হেসে উঠল। এই হাসি দেখে উপস্থিত সবাই বিরক্ত হলো কম, অবাক হলো বেশি। সবাই এখানে মোটামুটি সিরিয়াস অবস্থায় আছে আর সেখানে এই লোক হাসছে!

জাফর হাসি থামিয়ে বলল, "আমাদের মতো লোকদের বাজে অভ্যাস হলো নছীহত করা। কী করব বলুন! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা দাওয়াত দেওয়া ফরজ করে দিয়েছেন।"

সাজেদ জবাবে শুধু ভ্রূ কুঁচকাল। সে জানে লোকটি ধার্মিক কিন্তু এখানেও ধর্মের বুলি ছড়াবে তা ভাবেনি। জাফর দমে গেল না, বরং মুচকি হেসে বলতে লাগল, "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা সমস্ত সৃষ্টির উপর আমাদের মর্যাদা দিয়েছেন। এই বিশ্বে দৃশ্য-অদৃশ্য যা আছে সবার উপর। এখন আমাদের উচিত তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করা। সেজন্য পবিত্র কুরআনের প্রথম দিকে সূরা বাক্বারায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা আমাদের কী কী করতে হবে তা বলেছেন। সূরা বাক্বারায় দুই থেকে চার নম্বর আয়াত শরীফে বলেছেন, 'এই সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই। এটা পথ প্রদর্শনকারী পরহেজগারদের জন্য, যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং নামাজ প্রতিষ্ঠা করেন। আর যারা আমার প্রদত্ত রিযিক থেকে দান করেন।'

এগুলো পালন করতে হবে। এগুলো সাধারণ ব্যাপার নয়। আপনার মেয়ের কী হয়েছে আমি জানি না। তবে যা-ই হোক, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার রহমত ছাড়া আরোগ্য সম্ভব নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা সূরা ইসরা (বনী ইসরাঈল) এর ৮২ নম্বর আয়াত শরীফে বলেছেন, 'আমি অবতীর্ণ করেছি পবিত্র কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া।'

সুতরাং এখানে বিশ্বাস খুব জরুরি বিষয়। বিশ্বাস মানে শুধু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালাকে স্বীকার করা না। তাঁর সব আদেশ-নিষেধ মেনে নেওয়া। তিনি যা গ্রহণ করতে বলেছেন তা গ্রহণ করা আর যা বর্জন করতে বলেছেন তা ত্যাগ করা। আপনাদের দিকে লক্ষ করুন। আমি এসব বলছি, তাই এখন আপনাদের বিরক্ত লাগছে। ভাবছেন কেন বলছি। আপনার মেয়ের সাথে কী সম্পর্ক। একটু পর সব বলব। একটু অপেক্ষা করুন। এখন গিয়ে ফ্রেশ হয়ে আসুন।"

কথা শেষ হওয়ার পর নির্জনতা নেমে আসল, জাফর এক টানে সব বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠল। প্রথমে সবাই বিরক্ত হলেও আস্তে আস্তে সবাই জাফরের কথার মানে বুঝতে পারল, তাই সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনল। কিন্তু সে ধৈর্য আর থাকল না, চুপচাপ উঠল সবাই। সবার আগে শহিদ রওনা হলো নিজের রুমের দিকে, তাকে অনেক ভীত মনে হচ্ছে, মুখ অনেক ছোট করে রেখেছে সে।

সাজেদ এখনও কপালে হাত ঠেকিয়ে বসে আছে। রফিক দাঁড়িয়ে আছে। জাফর দাঁড়াল, বেশ শব্দ করেই দাঁড়াল। সবার দৃষ্টি গেল জাফরের দিকে। সে হেঁটে দরজার কাছে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে খিলান ধরে কী যেন পড়তে লাগল।

রফিক সাজেদের পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। জাফর রফিকের দিকে ফিরে হেসে বলল, "রফিক সাহেব আমি বাইরে আজান দেব। দরজা খোলা থাকবে। আপনি গিয়ে গোসল করুন। পবিত্র হয়ে আসুন।"

জাফর বাইরে বের হয়ে গেল। রফিক সোফায় বসল, তার ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। তাবিজগুলো গলায় ঝুলছে রফিকের। লোকটির কথায় পীর সাহেবের তাবিজ ফেলে দেওয়ার মানে হয় না। রফিকের কানে আজানের শব্দ আসতে লাগল। তার মানে লোকটি সত্যি সত্যি আজান দিচ্ছে।

আজানের প্রথম তাকবীর দেওয়ার পর হঠাৎ করে গরম বাতাস এসে লাগল রফিকের গায়ে। ভীষণ গরম। সে দাঁড়িয়ে গেল। হঠাৎ করে এরকম গরম বাতাস এসে লাগল কোথা থেকে? মনে হলো আগুনের লেলিহান শিখা কেউ এদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। সব গরম বাতাস বুঝি এই দরজা দিয়ে আসছে। লোকটি আজান দিচ্ছে। রফিক দাঁড়িয়ে না থেকে নিজের রুমে চলে গেল। দরজা লাগিয়ে আল্লাহ! আল্লাহ! বলে ডাকতে লাগল।
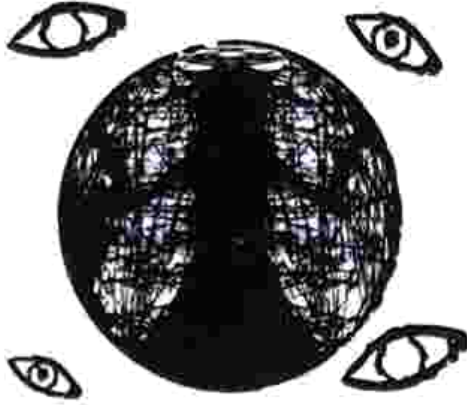
আসলান এসেছে কিছুক্ষণ হলো। প্রেসক্রিপশন নিয়ে বের হয়ে গিয়েছিল। ফার্মেসি থেকে ওষুধ কিনে এনেছে তারিনের জন্য। নিজের মাথায়ও ড্রেসিং করিয়ে নিয়েছে। ফিরেই জানতে পারল মাহাকে পাওয়া গিয়েছে, এর চেয়ে খুশির সংবাদ আর কিছু ছিল না আসলানের জন্য, সে দৌড়ে গিয়ে মাহাকে দেখে আসল। মেয়েটি সুস্থই আছে আপাতত।

শহিদের শরীর কাঁপছে সন্ধ্যা থেকে। সে কোনো কারণ বুঝতে পারছে না। নিজেকে গুটিয়ে সোফায় বসে আছে। তার সামনে ডাক্তার বসে আছে। মানুষটি নিজেকে জাফর বলে পরিচয় দেয়। শহিদ এরকম অদ্ভুত মানুষ আর দেখেনি, তবে লোকটির প্রতি চরম বিরক্ত শহিদ।

হ্যাঁ, একাত্তরের সময় একটি ভুল করেছে। সেটা এভাবে না বললেই হয়, আর নিজে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছে দেখে কী হয়েছে? আপাতত ঝামেলা মিটুক। ব্যাটাকে জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়বে। নিজের মেয়ের কথা ভেবে সেই সময় চুপ ছিল। বাধ্য হয়ে নামাজ পড়েছে। নামাজের সাথে মেয়ের আরোগ্যের কী সম্পর্ক তা বুঝতে পারছে না।

রাতে সবাই খেয়েছে, শুধু আসলানের খাওয়া হয়নি। গোসল করে এসেছে। চুল থেকে এখনও পানি ঝরছে। আসলান খেতে এসেছে ডাইনিংয়ে। কী করে পরিবারটির সাথে জুড়ে গেল তা আসলান বুঝতে পারছে না। গত তিনদিনে যা দেখছে তা যদি নিজের চোখে না দেখত তাহলে কখনো বিশ্বাস করত না সে। তার সামনে একটি লোক বসে আছে, আসার পর থেকেই দেখছে সবার দৃষ্টি লোকটির দিকে।

লোকটির নাম আসলান জানে না। সে লোকটির দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটি মাথা নিচু করে বসে আছে। তারিনকে এখনও দেখতে যায়নি আসলান।

ভয় করছে তার, ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক, এত কিছু দেখার পর ভয় না পেয়ে কোনো গতি থাকে না। সে মানুষ, রক্তমাংসের মানুষ, আর ভয় পাওয়া মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। সে এখনও নিজের আদিম প্রবৃত্তি সংবরণ করার মতো শক্তিশালী হয়নি।

"তোমার নাম কী?" লোকটি এবার আসলানের দিকে তাকিয়ে বলল।

আসলান থতমত খেয়ে গেল এমন হঠাৎ প্রশ্নে। এত মানুষের মধ্যে আসলানকে গুরুত্ব দেওয়ার কোনো মানে হয় না। সে আস্তে জবাব দিল, "আসলান হোসেন।"

"কী করো?"

"লেখাপড়া।"

"কোথায়?"

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।"

লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। মাথা নিচু করে কী যেন ভাবল। আবার মাথা তুলে আসলানকে প্রশ্ন করল, "কোন বিষয়ে?"

"পরিসংখ্যান," আসলান চট করে জবাব দিল।

লোকটি এবার মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "বাহ! তাহলে যা ঘটে গিয়েছে তা বিশ্বাস করতে নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে?"

আসলান এবার কোনো জবাব দিল না। চুপ করে নিচের দিকে তাকিয়ে থাকল। লোকটি যা বলেছে তা সত্যি। আসলানের চোখের সামনে যা ঘটে গিয়েছে তা আসলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। বিশ্বাস করতে চায় না আসলান, অলীক ভেবে উড়িয়ে দিতে চায়, কিন্তু যখন ঘটনার সম্মুখীন হয় তখন আবার বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। লোকটি প্রশ্ন করা থেকে থামল না।

আবার প্রশ্ন করল, "তোমার হল কোনটি?"

"শহিদুল্লাহ হল।"

"প্রভোস্ট জহির না?"

লোকটি কী করে বুঝল প্রভোস্ট কে? লোকটি কি ভার্সিটির কেউ? নাকি আগে আসলান সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে এসেছে? লোকটির উদ্দেশ্য কী? সে লোকটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চোখা গলায় প্রশ্ন করল, "আপনি কে?"

"আমার নাম জাফর। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস থেকে এক্সিকিউটিভ মাস্টার্স করেছি, যদিও আমি ডাক্তার, পাশাপাশি ভূত তাড়িয়ে বেড়াই।" এই বলে লোকটি হা হা করে হাসতে লাগল।

আসলানের বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। এমন একজন মানুষ এমন কাজ কী করে করতে পারে। জিন-ভূত যদি থাকে তাহলে তা তাড়াতে কখনো একজন শিক্ষক আসতে দেখেনি বা শুনেনি আসলান, এসব কাজ হুজুর, পীরদের, একজন শিক্ষকের এ কাজ হয় কী করে, উপরন্তু সে ডাক্তার?

"আপার কী হয়েছে?" আসলান প্রশ্ন করল।

জাফর সমস্ত কিছু শুনে নিয়েছে সাজেদের থেকে, রফিক থেকেও সমস্ত ঘটনা জেনে নিয়েছে, শুধু বাকি এই ছেলেটি আর তারিন। নাসির সাহেব তারিনকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে, আজান দিয়ে আপাতত বাড়িটাকে নিরাপদ রাখতে পেরেছে এটাই ধারণা জাফরের। এই ছেলেটির মনে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। তার চোখ স্থির নয়, দৌড়াদৌড়ি করছে। ছেলেটির ঘুম হয়নি, মাথায় চিন্তা ঘোরাঘুরি করছে, সে চিন্তিত আর ভীষণ কৌতূহলী।

জাফর ঠান্ডা গলায় বলল, "তারিন বোধ হয় জিন দ্বারা পজেসড।"

জাফর ভেবেছিল ছেলেটি চমকে উঠবে, কিন্তু কিছুই হলো না, মনে হচ্ছে এসবের সাথে পূর্বপরিচিত।

আসলান ভাবলেশহীনভাবে প্রশ্ন করল, "জিন কি আদৌ আছে?"

"আচ্ছা ডার্ক এনার্জি দেখেছ কখনো? দেখোনি। কিন্তু বিশ্বাস তো করো। মহাকাশের প্রত্যেকটি বস্তুকে সরিয়ে নিচ্ছে ডার্ক এনার্জি। একটি থেকে আরেকটি। মহাকাশ সম্প্রসারিত হচ্ছে এই ডার্ক এনার্জির কারণে। এই যে ডার্ক একটি এনটিটি আছে তা সায়েন্স বিশ্বাস করে। প্রত্যেক বস্তুর বিপরীত বস্তু আছে। যেমন ম্যাটার, এন্টি, ম্যাটার। আমরা বিশ্বাস করি এলিয়েন আছে। সেজন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার নষ্ট করি। এমনকি আমরা প্যারালাল জগৎকেও বিশ্বাস করি। এটা যদি বিশ্বাস করো তাহলে জিন বিশ্বাস করো না কেন? বিশ্বাস করো বা না করো তা তোমার উপর নির্ভর করে।" জাফর এক নিঃশ্বাসে জবাব দিল।

অনেকবার এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে জাফর। একেকজনকে একেকভাবে বোঝাতে হয়েছে তাকে। জাফরের জবাব শুনে আসলানের মনে হলো জাফর প্রস্তুত ছিল এই প্রশ্নের জন্য। অকপটে সব বলে গেল। জাফরও ছেড়ে দিল না, ঠোঁটের কোণে হাসি ঝুলিয়ে আসলানের দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিল, "এখন আমাকে বলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালাকে বিশ্বাস করো?"

ঈশ্বর আছেন কি না তা নিয়ে বরাবরই সংশয় ছিল আসলানের, এখন আর তা নেই। আসলানের মন থেকে একটি আওয়াজ আসে আজকাল। সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন, উপরওয়ালা একজন আছেন।

তাই আসলান বিনা সংকোচে জবাব দিল, "হ্যাঁ করি।"

আসলানের জবাব শুনে মুচকি হেসে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে বলল, "যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা থাকেন, তাহলে জিন আছে, শয়তান আছে, মালাইকাও আছেন। সৃষ্টিকর্তা যদি থাকেন, তাহলে তাঁর সৃষ্টিও আছে। এই সৃষ্টির মধ্যে একটি হলো জিন জাতি।"

কয়েক সেকেন্ড থেমে জাফর আবার বলল, "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা সূরা যারিয়াতের ৫৫ নম্বর আয়াতে বলেছেন, 'আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদতের জন্য।'

সৃষ্টিকর্তাকে যেহেতু বিশ্বাস করো তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার বিধান পবিত্র কুরআনকেও বিশ্বাস করো। তাহলে তোমাকে আমি পবিত্র কুরআন থেকে বোঝাচ্ছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা সূরা জিন নামে একটি আস্ত সূরা নাজিল করেছেন।"

জাফর কয়েক সেকেন্ড থেমে বিরতি নিয়ে আবার বলল, "সূরা আহক্বাফের ২৯ নম্বর আয়াতে বলেছেন, 'স্মরণ করুন, যখন আমি আপনার প্রতি একদল জিনকে আকৃষ্ট করেছিলাম।' সূরা আনআমের ১৩০ নম্বর আয়াতে বলেছেন, 'হে জিন ও মানব জাতি! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য হতেই রসূল আলাইহিমুস সালাম আসেননি, যাঁরা তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করতেন এবং তোমাদেরকে কিয়ামত সম্পর্কে সতর্ক করতেন?'

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা সূরা আরাফের ২৬-২৭ নম্বর আয়াতে বলেছেন, 'আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি, তাদের অন্তর আছে কিন্তু তা দিয়ে উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে দেখে না, তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে শুনে না, তারা জন্তু-জানোয়ারের মতো, বরং তার চেয়েও পথভ্রষ্ট, তারাই হলো উদাসীন।"

জাহান্নাম শব্দটা বলতে গিয়ে গলা ধরে গেল জাফরের। মনে হলো তার গলার স্বরকে কেউ পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছে তাই সেখান থেকে কেমন একটা আবেগতাড়িত শব্দ বের হচ্ছে। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে মাথা নিচু করে আল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালাকে ডাকতে লাগল। সবাই হাঁ করে তাকিয়ে আছে জাফরের দিকে।

জাফর মাথা তুলে বড় করে একটি নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "শুধু তাই নয়, পবিত্র কুরআনে এরকম অনেক আয়াত আছে জিন জাতি সম্পর্কে। সূরা হিজরের ২৬-২৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেছেন, 'আমি মানুষকে

কাদা থেকে তৈরি শুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। এবং তার পূর্বে জিনকে শিখাযুক্ত আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছি।"

জাফর থামতেই আসলান আবার প্রশ্ন ছুড়ে দিল, "আচ্ছা জিন যদি আগুনের তৈরি হয় তাহলে তারা জাহান্নামের আগুনে পুড়বে কী করে?"

জাফর জানত আসলান এই প্রশ্ন করবে। অনেক মুসলমান ভাবে জিনরা জাহান্নামে পুড়বে না, তারা সর্বশক্তিমান, সেজন্য তারা নানা উপায়ে জিনদের অনুগ্রহ তালাশ করে শিরক করে থাকে। বিশেষ করে যারা কালো জাদু করে তারা জিনকে ঈশ্বররূপে গ্রহণ করে। সমাজে প্রপাগাণ্ডা ছড়াতেও দেরি করে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার সাধারণ একটি সৃষ্টিকে তারা অতিরঞ্জিত করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার সমকক্ষ করে তোলে।

জাফর একটু সামনে ঝুঁকে বলল, "তোমার কথা ঠিক। ভুল নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা সূরা জিনের ৬ নাম্বার আয়াতে বলেছেন, 'কতিপয় মানুষ জিনদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করত ফলে তারা তাদের অহংকার বাড়িয়ে দিত।"

জাফর কয়েক সেকেন্ড বিরতি নিয়ে আসলানের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দিয়ে বলল, "আয়াতটি শুনে নিশ্চয়ই ভাবছ আয়াতের সাথে তোমার প্রশ্নের কী সম্পর্ক? শয়তান শক্তি লাভ করে আমাদের থেকেই। শয়তান কিন্তু জিনের জাত। ইবলিস একজন জিন ছিল। যখন আমরা পাপ করি শয়তান আমাদের গ্রাস করা শুরু করে। আস্তে আস্তে শয়তান আমাদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে। এটিই শয়তানের জয়। একজন মানুষকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা থেকে বিচ্ছিন্ন করে শয়তানের কাজে নিয়োজিত করতে পারাই তার মূল উদ্দেশ্য। আমরা মনে করি জিনরা সুপ্রিম। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তাদের গায়েব বা অদৃশ্য হওয়ার শক্তি দিয়েছেন আর তারা আগুনের তৈরি।"

আসলান জবাবে কিছু বলল না, শুধু মাথা নাড়াল। জাফর যোগ করলো, "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা সূরা হিজরের ২৬-২৭ নাম্বার আয়াতে বলেছেন 'আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি হতে। এর পূর্বে সৃষ্টি করেছি জিনকে, প্রখর শিখাযুক্ত অগ্নি থেকে"।

তাছাড়া আর রহমানের ১৫ নাম্বার আয়াতে বলেছেন, 'তিনি জিনকে সৃষ্টি করেছেন বিশুদ্ধ (ধোঁয়াহীন) অগ্নিশিখা হতে।' এ ছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার কথা। পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত আছে এ সম্পর্কে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার সাথে ইবলিসের কথোপকথন উল্লিখিত রয়েছে সূরা আরাফের ১২ নাম্বার আয়াতে, (ইবলিস বলল,) আপনি আমাকে সৃষ্টি

করেছেন আগুন দিয়ে আর হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি দিয়ে।"

কথা শেষ করে আড়চোখে তাকিয়ে থাকল আসলানের দিকে। আসলান ভাবলেশহীনভাবে জাফরের কথা শুনছে, এরকম নীরস প্রতিক্রিয়া পেয়ে দমে গেল না জাফর, বরং দ্বিগুণ উৎসাহে বলতে লাগল, "ইবলিসের শত্রুতা শুরু হয় জান্নাত হতে যেদিন ইবলিস আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার হুকুম না মেনে অভিশপ্ত হলো। সেদিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার সামনে ইবলিস চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি বিপথগামী হয়েছি, তাই আমি মানুষের নিকট পাপকর্মকে অবশ্যই শোভনীয় করে তুলব এবং আপনার একনিষ্ঠ বান্দাগণ ব্যতীত তাদের সবাইকে আমি অবশ্যই বিপথগামী করে ছাড়ব।' জান্নাতে মানুষের আদি মাতা-পিতাকেও শয়তান প্ররোচনা দিয়েছিল। তাছাড়া শয়তানের খপ্পরে পড়ে পৃথিবীতে পথভ্রষ্ট হয় কাবিল, যার হাতে শহীদ হন হযরত হাবিল আলাইহিস সালাম।"

কয়েক সেকেন্ড থেমে জাফর আবার বলল, "শয়তানের ক্ষতির পরম্পরা তারপর থেকে শুরু হয়ে আজ অবধি মাথা উঁচু করে টিকে আছে। জিন জাতিকে বশ করতে শয়তানের বেশি বেগ পেতে হয়নি। সেই উপকথা আজও পারস্যের অলিতে-গলিতে বলা হয়।

সেখানে বলা হয়, হযরত হাবিল আলাইহিস সালাম শহীদ হওয়ার পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা প্রথম নবীকে শিথ বা শিষ আলাইহিস সালামকে দেন। 'শিথ' অর্থ উপহার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা শিষ আলাইহিস সালামকে উপহারস্বরূপ দিয়েছিলেন। তাঁর সুযোগ্য সন্তান ছিলেন ইনচ আলাইহিস সালাম। পাহাড়ের উপর বাস ছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার প্রিয় বান্দাদের। সমতল ভূমিতে তখন কাবিলের বংশধরগণ থাকত। তারা পাপে নিমজ্জিত ছিল। শয়তান যখন সরাসরি ইনচ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে কাবু করতে পারল না তখন জিন লেলিয়ে দিল। জিনদের স্মরণ করিয়ে দিল হাজার বছর আগের কথা, যখন এই পৃথিবী ছিল তাদের দখলে।

প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে জিনরা পাহাড়ের অধিবাসীদের উপর হানা দিতে শুরু করল। শিথ আলাইহিস সালামের তৃতীয় অথবা চতুর্থ প্রজন্মে জন্ম নেন এক তাকওয়াবান বীরপুরুষ মুয়াজ্জাল। তিনি শক্ত হাতে জিনদেরকে দমন করেন, তাড়িয়ে দেন দ্বীপ আর সমুদ্রের দিকে।"[১]

জাফর কথা শেষ করে লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিল। সবাই মুখ হাঁ করে শুনল। আসলান নিজের অজান্তেই ডান হাতের বুড়ো আঙুল নিয়ে নখ কামড়াতে লাগল, যখন জাফর কথা শেষ করল আসলান নিজের অজান্তেই আঙুলে কামড় বসিয়ে দিল, ব্যথায় মুখ নীল হয়ে গেল তার।

আসলান হালকা করে থুতু ফেলে বলল, "ইদ্রিস আলাইহিস সালাম কি ইনক? আর এই যুদ্ধই কি নেফিলিম যুদ্ধ?"

জাফর মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, "আমি ঠিক নিশ্চিত নই। তবে হযরত ইদ্রিস আলাইহিস সালামকে অনেকে ইনচ আলাইহিস সালাম মনে করেন। সে সম্পর্কে কোনো দলীল আমার কাছে নেই।"

"আপনি কি সব কথায় এরকম দলিল দিয়ে বলেন? মানে রেফারেন্স দিয়ে?" আসলান ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করল।

জাফর হাসি দিয়ে বলল, "এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা আর তাঁর সৃষ্টির কাহিনি। এখানে বানিয়ে বলার আমার ইচ্ছে নেই, তাছাড়া তোমার মতো শিক্ষিত মানুষের সাথে এরকম রেফারেন্স দিয়ে কথা না বললে কি তুমি বিশ্বাস করতে?"

আসলান কিছু বলল না, ভাবতে লাগল, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার আদেশ মাত্র একবার অমান্য করে ইবলিস অভিশপ্ত হয়ে গেল, আর মানুষ দৈনন্দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার কত আদেশ অমান্য করে!

"এখান থেকে সমস্ত কিছু শুরু। ইবলিসের কথার মধ্যে অহংকার ফুটে উঠেছে। আর এই অহংকারই ইবলিসের পতনের মূল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই আগুনের তৈরি জিন কীভাবে আগুনে পুড়বে?" জাফর নিজ থেকেই বলল।

সবার দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো, সবার প্রতিক্রিয়া কী। না, কেউ বিরক্ত হচ্ছে না। তাই জাফর আবার শুরু করল, "দেখো, আমরা মানুষ কিন্তু মাটি দিয়ে তৈরি। এমন মাটি যেটা শুকিয়ে ঠনঠনে হয়ে যায়। এঁটেল মাটির মতো। জিনকে তৈরি করা হয় ধোঁয়াহীন আগুন দিয়ে। শীতল আগুন। মানে তার দেহ আগুনের তৈরি। শীতল আগুন, যে আগুনের জ্বলন শক্তি নেই। যদি জ্বলন শক্তি থাকত তাহলে বাতাসে আগুন লেগে যেত। আমাদের শরীরে মাটি আছে, তার মানে এই নয় যে আমাদের শরীরে চাষাবাদ করা যায়, গাছ লাগানো যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা জিনের আদি পিতাকে তৈরি করেছেন আগুন দিয়ে, আর আমাদের

পিতাকে মাটি দিয়ে। সুতরাং এমনও নয় যে জিনরা যা কিছুর সংস্পর্শে আসে তা জ্বলে যায়। তারা জ্বলন্ত আগুন নয়। মোটকথা আমরা যেমন কিছুটা মাটির তৈরি হলেও মাটি নই, তেমনিভাবে জিনরা আগুনের তৈরি হলেও তারা আগুন নয়।"

কয়েক সেকেন্ড থেমে নিজের ঘড়ি দেখে বলল, "এই সম্পর্কে আবুল ওয়াফা বিন আকীল বলেছেন, এক ব্যক্তি জিনদের সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করল, 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা জিনদেরকে আগুন থেকে তৈরি করেছেন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালাই বলেছেন আগুনের উল্কাপিণ্ড তাদের ক্ষতি করে, জ্বালিয়ে দেয়। তাহলে আগুন কী করে আগুনকে জ্বালায়?'

ওই ব্যক্তির প্রশ্নে আবুল ওয়াফা বিন আকীল জবাব দেন, 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা জিন জাতিকে আগুনের সাথে সে অর্থে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন, যে অর্থে মানুষকে সম্পৃক্ত করেছেন মাটি, কাদা ও শুকনো ঠনঠনে মাটির সাথে। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টির মূল উপাদান কাদামাটি হলেও মানুষ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাদামাটি নয়। তেমনই জিনরাও আগুনের উপাদানে সৃষ্ট কিন্তু জিন মানেই আগুন নয়।"

জাফর থেমে লম্বা একটা দম নিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকল। একটু সময় না দিলে এসব আবার লোকের হজম হয় না। কয়েক সেকেন্ড পর মাথা তুলে আসলানের দিকে তাকিয়ে বলল, "এ তো ইসলামের একজন জ্ঞানী মনীষীর কথা ছিল। চলো এবার নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা বলি। মুসনাদে আহমাদের ৫: ১০০, ১০৫ নম্বর হাদীসে তিনি বলেছেন, 'শয়তান নামাজের মধ্যে আমার মোকাবিলা করেছে আর আমি তার গলা টিপে দিয়েছি এবং তার থুতুর শীতলতা নিজের হাতে অনুভবও করেছি।' সুতরাং শয়তান বা জিন এমন আগুন থেকে তৈরি হয়েছে যা ধোঁয়াহীন। ঠান্ডা-শীতল আগুন। এই আগুন আগুনে পোড়ে।"

সবাই থ হয়ে তাকিয়ে আছে জাফরের দিকে, বিশেষ করে শহিদ। সে ভাবছিল, এই মানুষটার চরম জ্ঞান আছে ধর্ম সম্পর্কে। আসলান সমস্ত কথা হাঁ করে গিলছিল, যেমন গিলছিল তেমনই হাজারো প্রশ্ন মাথায় ঘুরতে শুরু করল। তার সেগুলোর উত্তর জানা জরুরি, না জানতে পারলে শান্তি পাবে না।

আসলান এবার সংকোচ কাটিয়ে বলেই ফেলল, "জিন আদতে কারা? জিন আর শয়তান কি এক? তারা কেন আমাদের ক্ষতি করবে?"

আসলানের প্রশ্ন শুনে কপাল কুঞ্চিত করে ফেলল জাফর। তার পানি দরকার। এদিকে তারিনও আসছে না। তারিন ঘুম থেকে উঠলে সে কাজ শুরু করবে। জাফর আসলানকে বলল, "যাও পানি নিয়ে এসো।"

আসলান খানিকটা বিরক্ত হয়ে পানি আনতে চলে গেল।

আসলান চলে যেতেই শহিদ বলল, "জাদু টোনা জানেন?"

জাফর বিরক্তির সুরে বলল, "না।"

শহিদ কপাল কুঞ্চিত করে বসে থাকল, আর কিছু বলল না। আসলান পানি নিয়ে আসল। জাফর ঢকঢক করে পানি খেল, গ্লাস রেখে আসলানকে ইশারা দিল বসতে। আসলান বসে পড়ল।

জাফর নিজের দুহাত মুঠ করে সামনে এনে বলল, "জিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা সৃষ্টি করেছেন। আমাদের সাথেই থাকে, বলতে গেলে আমাদের প্যারালাল। তাদের আমরা দেখি না। জিন আরবি শব্দ, যা এসেছে 'জান্না' থেকে। যার অর্থ লুকায়িত। যেমন আরবিতে ভ্রূণকে 'জানিন' আর হৃৎপিণ্ডকে বলা হয় 'জানান'। কারণ দুটিই লুকায়িত অবস্থায় থাকে। সেজন্য এই অদৃশ্য জাতিকে জিন বলা হয়।

জিনদের মধ্যে যারা খারাপ তাদের শয়তান বলা হয়। বহুবচন শায়াত্বিন। জিন আর মালাইকা এক নয়। তাছাড়া ইবলিসও কোনো ফলেন এঞ্জেল নয়। সে জিন ছিল, পরবর্তীতে সে ইবলিস নাম পেয়েছে। সূরা কাহাফের ৫০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেছেন, 'তোমরা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করো, তখন ইবলিস ছাড়া সবাই করল; সে ছিল জিনদের একজন।'

এই আয়াত থেকেই বুঝতে পারি ইবলিস আসলে মালাইকা নয়। সে ছিল জিন। তাছাড়া সূরা তাহরীমের ছয় নাম্বার আয়াতে বলেছেন, 'মালাইকারা কঠোর ও নির্মম, যাঁরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার আদেশ অমান্য করেন না, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালাযা নির্দেশ দেন তা-ই তাঁরা পালন করেন।'

এখান থেকেই বুঝতে পারছ আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা মালাইকাদের নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা যা আদেশ করেন তাঁরা তা-ই করেন। যদি আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা থাকে তাহলে অন্তিম দিনে মালাকুল মউত নিজের জান কবজ করবেন না, কিন্তু ইবলিস আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার আদেশ অমান্য করেছে। আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করেনি। সুতরাং সে জিন।"

জাফর কথা শেষ করে আসলানের দিকে তাকাল। তার চোখে একটা দীপ্তি দেখতে পেল জাফর। জানার জন্য দীপ্তি। এই বিষয়টা আজকাল অনেক ছেলেপেলে এড়িয়ে যায়। যখনই ধর্ম নিয়ে কথা বলা হয় তাদের একটা চুলকানি

সৃষ্টি হয়। অবশ্য এর জন্য ইসলামবিদ্বেষী সমাজ যতটা দায়ী, তার থেকে বেশি দায়ী ধর্ম ব্যবসায়ীরা; যারা বরাবর ইসলামকে ভুল রূপে উপস্থাপন করে আসছে।

জাফর আবার শুরু করল, "এখন আসি জিনদের উৎপত্তি নিয়ে। জিনরা মানুষের আগে পৃথিবীতে এসেছে। পূর্বের আয়াতে মজিদ থেকেই বুঝতে পারছ। জিনদের আদি পিতা ইবলিস কি না সে সম্পর্কে কোনো ধারণা আমি কোথাও পাইনি। তবে জাওহারি তাঁর বই আস সিহাহতে বলেন, 'আল জ্বান হলো জিনদের আদি পিতা।'

সূরা বাক্বারার ৩০ নাম্বার আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে ইবনে কাসীরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, 'হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টির দুই হাজার বছর আগে জিনরা পৃথিবীতে এসে বসতি স্থাপন করে।'

সুতরাং জিনরা মানুষদের আগে থেকেই দুনিয়ায় আসে। ইবনে দুরাইদের ইমাম উশ শু'আরা ওয়াল লুগাত বই থেকে জানা যায় যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'জিন জাতি সৃষ্টি করা হয়েছে হযরত আদম আলাইহিস সালামের দুই হাজার বছর আগে।' হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতি রাহিমাহুল্লাহ-এর বইয়ে পাওয়া যায় যে, হযরত ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'জিনদের আদি পিতার নাম হলো সামূম।' সবচেয়ে মজার ব্যাপার কী জানো? পৃথিবীতে একটি এঞ্জেলিক ওয়ার হয়েছিল। জন মিল্টনের প্যারাডাইস সিরিজের মতো।"

আসলান চোখ বড় করে বলল, "কী!"

জাফর হেসে ছোট করে জবাব দিল, "হ্যাঁ।"

"শুনতে চাই," আসলান মিনতির সুরে বলল।

জাফর আসলানের দিকে তাকিয়ে হেসে আবার শুরু করল, "তাফসীরে উসমানীতে জুওয়াইবীর ও হযরত উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু নিজেদের সনদ সহকারে হযরত ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর একটা হাদীস দেখিয়েছেন যেটা মূলত মুসতাদরাকের হাদিস। হযরত ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা জিন জাতিকে সৃষ্টি করার পর তাদের পৃথিবীতে বাস করার নির্দেশ দিলেন। তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার অনুগত হয়ে চলতে লাগল। অবশেষে দীর্ঘকাল কেটে যাওয়ার পর তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার অবাধ্যতা শুরু করে দিল এবং খুনখারাবি করতে লাগল।

তাদের এক বাদশাহ ছিল, যার নাম ছিল ইউসুফ। তারা তাকেও মেরে ফেলল। তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তাদের উপর দ্বিতীয় আসমানের

একদল মালাইকা পাঠালেন। তাঁদের মধ্যে ইবলিসও ছিল। ইবলিস ছিল চার হাজার মালাইকাদের সর্দার। সে আসমান থেকে নেমে জমিনের সকল জিন সন্তানকে খতম করল এবং বাকিদের প্রহার করে সমুদ্রের দ্বীপগুলোর দিকে তাড়িয়ে দিল।'

এই উদ্ধৃতি হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতি রাহিমাহুল্লাহ-এর বইয়ে আছে। অধিকাংশ ইমামদের মতে এটি অনেক দুর্বল বর্ণনা। সত্যও হতে পারে, আবার মিথ্যাও হতে পারে। এ সম্পর্কে অনেক মত আছে।"

জাফর থেমে আসলানকে কথাগুলো হজম করার সুযোগ দিল। কিছুক্ষণ পর একটা ঢোক গিলে বলল, "যেমন হযরত মুহাম্মাদ বিন ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ, হযরত হাবীব বিন আবী সাবিত রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখ বর্ণনাসূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, ইবলিস তার বাহিনীসহ পৃথিবীতে এসে ঠাঁই গ্রহণ করে মানুষ আসার চার হাজার বছর আগে।"

"ওয়েট! ওয়েট! ইবলিস মালাইকাদের সাথে এসে নিজের জাতকে মারল, এ কেমন কথা, সে তো নিজেও জিন ছিল?" জাফর কথা শেষ না করতেই আসলান বলল।

জাফর বিরক্তি বোধ করল। আসলানের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললো, "উপরে শুধু একজনের কথা বললাম। এবার অন্যদের কথা শোনো। হযরত ইবনে জারীর রাহিমাহুল্লাহ থেকে পাওয়া যায় যে, হযরত শাহাব বিন হাওশাব রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'ইবলিস ছিল সেসব জিনদের অন্তর্গত, যাদেরকে মালাইকারা পরাস্ত করেছিলেন এবং শয়তানকে কতিপয় মালাইকা গ্রেফতার করে আসমানে নিয়ে গিয়েছিলেন।'

তাফসীরে তাবারীতে আরও পাওয়া যায় যে, হযরত সা'আদ বিন মাসউদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'মালাইকারা জিনদের সাথে যুদ্ধ করতেন। এমন এক যুদ্ধে ইবলিসকে গ্রেফতার করা হয়। তখন ইবলিস শিশু ছিল এবং সে খেলা করছিল। তারপর সে মালাইকাদের সাথে ইবাদত করতে শুরু করল।"

"আচ্ছা তখন ইবলিসের নাম কী ছিল? ইবলিস?" জাফর থামতেই আসলান আবার প্রশ্ন করল।

জাফর জবাব দিতে দিতে প্রায় ক্লান্ত। এবার শেষ, এই চ্যাপ্টার বন্ধ করবে, না হয় ছেলেটি সারারাত জাগিয়ে রাখবে।

"ইবলিসের আসল নাম আজাজিল। এ কথা আমি নিজে বলছি না। হযরত ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন। কিন্তু হযরত আবুল মাসনা

রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ইবলিসের নাম ছিল 'নায়িল', কিন্তু অধিকাংশ আলীমগণ আজাজিল সঠিক বলে মনে করেন। আল্লামা ইবনে আবিদ দুনইয়া তাঁর বই 'মাকায়িদুশ শাইত্বান' বইয়ে এই দুজনের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যাও এবারে তারিনকে তুলে নিয়ে এসো," আসলানকে কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে আদেশ করল জাফর।

আসলানের মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। কী শুনল লোকটির কাছ থেকে! সে কোনো যুক্তি দেয়নি। সরাসরি রেফারেন্স দিয়ে কথা বলেছে। ভালো যদি থাকে, খারাপও থাকে, সেজন্য মালাইকার পাশাপাশি শয়তানও থাকে, আর শয়তানই এই বাড়ির উপর চেপে বসেছে।
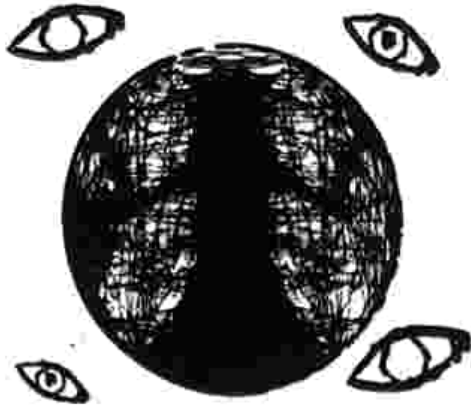
সাজেদ সন্ধ্যা থেকে বসে আছে তারিনের পাশে। তারিন আর ঘুম থেকে উঠেনি, গাঢ় ঘুমে তলিয়ে আছে। জাফরের উপর বিশ্বাস রেখে তারিনকে কোথাও নিয়ে যায়নি। মাহাও নিজের রুমে ঘুমিয়ে আছে। সাজেদ বুঝতে পারছে না তার আশপাশে কী ঘটছে। জলজ্যান্ত একটি মানুষের মৃত্যু হয়ে গেল বিকেলে, তারপর নিজের মেয়েকে পাওয়া গেল বেহুঁশ অবস্থায়, সবকিছু অদ্ভুত আর রহস্যময় হয়ে গিয়েছে।

বাথরুমে গিয়ে কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করে এসেছে। নাক আর মুখ ফুলে আছে তার। এতটা সে কখনো ভেঙে পড়েনি। দারিদ্র্যের কষাঘাত বা কাছের মানুষ হারানোর কষ্ট — কিছুই তাকে ভেঙে ফেলেনি। সে সবসময় কিছু না কিছু করে এসব থেকে বের হয়ে এসেছে। কিন্তু এখন নিজেকে অসহায় লাগে। তার মনে হচ্ছে তার মতো নিরুপায় এই দুনিয়ায় আরেকটা মানুষ নেই। টাকা-পয়সা, এত লোকবল — কিছুই তার কোনো কাজে আসছে না।

এসব ভাবতে ভাবতে মাথা ঝিমঝিম করছে তার। রাতে খাওয়ার জন্য কয়েকবার ডেকে গিয়েছে রফিক, ইচ্ছে হয়নি তাই যায়নি। তারিনের পাশে শুয়ে আছে। যদিও পেটে ক্ষুধা আছে কিন্তু নিচে যেতে ইচ্ছে করছে না। মানুষের মুখোমুখি হতে ভালো লাগছে না আর। তার ইচ্ছে করছে সবার থেকে দূরে কোথাও গিয়ে থাকতে, একটি দিন সমস্ত চিন্তা বাদ দিয়ে পার করতে।

"ভাই আসব?" দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে আসলান ডাক দিল।

সাজেদ তারিনের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ ডাক শুনে চমকে দেখল আসলান দাঁড়িয়ে আছে। সাজেদের পায়জামা আর পাঞ্জাবি পরে আছে। সাজেদ আসলানের দিকে তাকিয়ে চোখ দিয়ে ইশারা করল ভিতরে আসতে। আসলান এসে তারিনের পাশে দাঁড়াল। তারিনের উপর কাঁথা দেওয়া, ঠোঁট ফেটে গিয়েছে,

মাথায়ও কালো দাগ দেখল আসলান। বিকেলে যা অবস্থা হয়েছিল তাতে ব্যথা পাওয়ারই কথা। সে ঘুমিয়ে আছে।

"কিছু বলবে?" সাজেদ প্রশ্ন করল।

"না, ওই লোকটা পাঠাল আপনাদের দেখে যেতে। আর আপা উঠলে খবর দিতে," আসলান বলল।

সাজেদ উঠে বসে কপালে হাত রেখে কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "চলো, ডাক্তারকে খবর দেব।"

আসলান কিছু বলল না। সাজেদ উঠে বের হয়ে গেল, আসলানও পিছনে পিছনে গেল, আসলান সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে দেখল সাজেদ মাহার রুমে যাচ্ছে। সাজেদ মাহার রুমে গেল, আসলান বাইরে দাঁড়িয়ে রইল, সেখান থেকেই মাহার রুমের লাইট জ্বলতে দেখল আসলান।

কিছুক্ষণ পর সাজেদ মাহাকে কোলে নিয়ে বের হয়ে আসল। মাহা আসলানের কাছে আসতেই আসলান হাত মেলল। সাজেদের কোল থেকে মাহা আসলানের কোলে আসল। সাজেদ সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগল। পা যেন আর চলছে না। তবুও রেলিং ধরে জোর করে নিচে নামছে।

আসলান সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মাহাকে জিজ্ঞেস করল, "কেমন বোধ করছ?"

মাহা মাথা নাড়িয়ে জবাব দিল। সাজেদ নেমে সোজা চলে গেল রফিকের ঘরের দিকে। আসলান এসে হলরুমে মাহাকে কোল থেকে নামাল। মাহা তার নানার দিকে তাকিয়ে হাসি দিল, শহিদ হাসল না, বরং চেহারার মধ্যে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল তার। চোখ বড় বড় করে মাহার দিকে তাকিয়ে রইল শহিদ। মাহা তাকিয়ে আছে জাফরের দিকে। খুব অদ্ভুতভাবে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। জাফর মাথা নিচু করে আছে। আসলান এসে বসতেই সে আসলানের দিকে মাথা তুলে তাকাল।

আসলান ফিসফিসিয়ে বলল, "ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে।"

"আমি কী তাহলে? আচ্ছা, অন্য কোথাও দেখাতে চাইলে দেখাক, এসেছি যেহেতু একটু দেখে যাই। অন্য কোথাও নেওয়ার আগে যা করার আমি করব," জাফর ধীর গলায় বলল।

সাজেদ রফিককে নিয়ে হলরুমে এসে শহিদকে উদ্দেশ্য করে বলল, "বাবা, রফিককে পাঠাচ্ছি বাইরে। গাড়ি আনতে।"

"আমার গাড়ি বাইরে আছে। ড্রাইভ করে আমি নিয়ে যাব।" শহিদ জবাব দিল।

তারপর সাজেদ রফিককে নিয়ে দোতলার উদ্দেশ্যে হাঁটতে লাগল।

"সাজেদ সাহেব!" পিছন থেকে জাফর ডাকল।

সাজেদ ঘাড় ফিরিয়ে দেখল জাফর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে।

জাফর বড় বড় পা ফেলে এদিকে এসে বলল, "আপনার পরিবারের উপর সিহর (জাদু) করা হয়েছে। আমি নিশ্চিত নই, এটি আমার অনুমান। আমাকে শুধু এক ঘন্টা সময় দিন। আমি জানাচ্ছি কী করতে হবে। আপনি শুধু রোগীর মুখে পানি ছিটান, আর আমাকে পানি ভর্তি একটি গ্লাস এনে দিন।"

"আপনার ভণ্ডামি অনেক হয়েছে। আর নয়!" চেঁচিয়ে বলল সাজেদ।

আসলান পিছন থেকে ছুটে আসল, দাঁড়িয়ে রইল জাফরের পিছনে। শহিদ সাজেদের কথা শুনে মাথা তুলে তাকাল, কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জাফরের দিকে। শহিদের মন বারবার বলছে, এই মানুষকে বিশ্বাস করা যায়।

"সাজেদ! একবার চেষ্টা করুক। আমরা দেখি কী হয়। কোনো উন্নতি যদি না দেখি তাহলে সোজা হাসপাতালে নিয়ে যাব," শহিদ ঠান্ডা গলায় বলল।

সাজেদ বিরক্তি নিয়ে রফিকের দিকে তাকাল। রফিক বুঝে গেল তাকে কী করতে হবে। রফিক ডাইনিংয়ে চলে গেল, এক গ্লাস পানি নিয়ে হাজির হয়ে দিল জাফরের হাতে । জাফর বিড়বিড় করে কী যেন পড়ল। পড়া শেষ করে সাজেদের কাছে এগিয়ে পানির গ্লাসটি দিয়ে বলল, "এই পানিটুকু তারিনের উপর ছিটিয়ে দেবেন।"

সাজেদ পানি নিয়ে চলে গেল। জাফর রফিকের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনাকে বলেছিলাম তাবিজ খুলতে। যান, তাবিজগুলো খুলে বাইরে ফেলে আসুন আর বাইরের বরই গাছ থেকে সাতটি কচি পাতা নিয়ে আসুন।"

রফিক ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে জাফরের দিকে তাকাল, নির্বাক হয়ে থাকল সাজেদ। তাবিজে তার কী সমস্যা বুঝতে পারল না। লোকটির কথায় কর্তৃত্বের সুর ফুটে উঠেছে। এরকম ভারী গলার আদেশ শোনার পর খুব কম মানুষেরই তা অমান্য করার ক্ষমতা আছে, আর রফিকের মতো ছাপোষা মানুষের জন্য আদেশ না মেনে উপায় নেই। রফিক চলে গেল।

আসলান কিছুই বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। জাফর সবকিছু করার পর ব্যাখ্যা দেওয়ার মানুষ বলে মনে হলো আসলানের কাছে, এবারো হয়তো বা দেবে। সে ব্যাখ্যার জন্য আসলান বসে আছে।

"আসলান!" জাফর ডাক দিল।

জাফর দোতলার বেডরুমের দিকে তাকিয়ে বলল, "এ বাড়িতে নিশ্চয়ই টর্চ আছে?"

আসলান কিছু না বুঝতে পেরে ছোট করে জবাব দিল, "হ্যাঁ।"

জাফর এবার সাজেদের বেডরুম থেকে চোখ সরিয়ে নিল রান্নাঘরের দিকে, যদিও দেয়াল পড়ে যায়, তবুও সে দিকে তাকিয়ে বলল, "নিয়ে এসো।"

আসলান প্রশ্ন ছুড়ে দিল, "কেন?"

"নিয়ে এসো যাও," জাফর রাগত স্বরে বলল।

জাফরের আদেশের পর আসলান ছুটে গেল সাজেদের কাছে। দরজার সামনে গিয়ে দেখল তারিন বসে আছে বিছানায়, আর সাজেদ পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আসলান দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, "টর্চ লাগবে।"

আসলানের গলা শোনার পর তারিন আসলানের দিকে ঘুরে তাকাল। তারিনকে একদম চিনতেই পারছে না। অবাক হয়ে গেল আসলান। তারিনের চেহারাটা একদম সাদা হয়ে গিয়েছে, রক্তশূন্য, মনে হচ্ছে ভিতর থেকে কেউ শুষে রক্ত বের করে নিয়েছে। চোখ দুটি অর্ধনিমীলিত, চুলগুলো কপালের দুপাশে ভাঁজ হয়ে পড়ে আছে। তারিনের উন্মুক্ত কপাল দেখা যাচ্ছে, কপালের ডান পাশের উপরের দিকে একটু অংশ কালো হয়ে আছে, আঘাত পাওয়ার চিহ্ন।

তারিন আসলানকে হাত দিয়ে ইশারা করল খাটের নিচের দিকে। সাজেদ নিচু হয়ে টর্চ নিল। এগিয়ে গিয়ে টর্চটি আসলানের হাতে দিল। সাজেদ আবার তারিনের পাশে এসে দাঁড়াল। তাকে ধরে দাঁড়াল তারিন। সে দুহাতে তারিনের বাহু ধরল। তার উপর ভর করে বের হলে তারিন। আস্তে আস্তে পা ফেলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসল হলরুমে। আসলানও পিছন পিছন আসছে। তারিনকে দেখা মাত্রই শহিদ দৌড়ে এসে তারিনকে ধরল। তারিন সাজেদের হাত ছেড়ে বাবার হাত ধরে গিয়ে বসল সোফায়।

তারিনের সাথে কী ঘটছে সেটা জানে না তারিন। প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছে তার। অনেক দুর্বল লাগছে, সারা শরীর ব্যথা করছে, বিশেষ করে কোমর। মাহা কোথায় আছে, কী করছে, কিছুই জানে না। সাজেদকেও কেমন অসহায় দেখাচ্ছে। তারিন শুধু সবার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে।

"আসসালামু আলাইকুম।" একটি তীক্ষ্ণ মোটা কণ্ঠের সালাম শুনল তারিন।

তারিন সালামকে উদ্দেশ্য করে দেখে তার পাশে একটি মধ্যবয়সি যুবক দাঁড়িয়ে আছে। যুবক বললে ভুল হবে। বয়স একটু প্রৌঢ় হওয়ার দিকে ঝুঁকছে।

তার গালে বড় বড় দাড়ি। মাথায় ছোট ছোট চুল। কপালের উপরে একটি ছোট করে দাগ, দাগ দেখেই মনে হচ্ছে লোকটি অনেক ধার্মিক। তারিন মনে মনে সালামের জবাব দিল। লোকটি এবার তারিনের কাছে আসল, নিচে কার্পেটে বসল। তারিন চমকে উঠল। কোথা থেকে কোন অচেনা লোক এসে একবারে পায়ের কাছে বসে গেল! এ কেমন অভদ্রতা!

তারিন চেঁচিয়ে বলল, "আপনি কে? এ কী করছেন? এখান থেকে সরে বসুন।"

তারিন এত জোরে চিৎকার দিল যে শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেল। এত জোরে কী করে বলল! সে কখনো জোরে শব্দ করে কথা বলে না অথচ লোকটিকে এত জোরে ধমক দিল যে পুরো হলরুম কেঁপে উঠল। লজ্জিত হয়ে নিজের মাথা নিচু করে রাখল সে। কিন্তু লোকটি এত বড় ধমক খাওয়ার পরও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না, সরেও গেল না, বরং একটি হাসি দিয়ে বলল, "আমি তোমাকে তুমি করেই ডাকি। আমার নাম জাফর। আমি আল্লাহ তায়ালার একজন নগণ্য বান্দা। তোমার শরীর খারাপ যাচ্ছে। তা তো তুমি বুঝতে পারছ?"

তারিন নিজের দুই হাতের দিকে তাকাল, হাত দুটি অনেক চিকন হয়ে গিয়েছে, ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। সারা শরীর ব্যথা করছে, মাথা ধরে আছে, চোখ দুটিও বুজে আসছে। তার মানে তারিনের শরীর ঠিক নেই।

তারিন ছোট করে জবাব দিল, "হুঁ।"

জাফর তারিনের দিকে তাকিয়ে শীতল গলায় বলল, "তুমি সুস্থ হতে চাও না? তোমার মেয়ে তোমার কাছে আসতে ভয় পায়। তা তুমি জানো?"

তারিন কিছু বলতে পারল না। আবেগ তার ভিতরটাকে আঘাত করল। তার চোখ থেকে টপটপ করে পানি পড়ছে। সেই পানি গাল বেয়ে পড়ে কার্পেটের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখল সাজেদ।

জাফর শান্ত গলায় বলল, "শোনো বোন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা মানুষকে রোগ দেন, আবার সুস্থও করে দেন। তবে যেহেতু চিকিৎসা করা সুন্নত, তাই আমাদেরও উচিত চিকিৎসা করানো। তাই নয় কি?"

তারিন ছোট করে জবাব দিল, "হ্যাঁ।"

"বাহ!" লোকটির উচ্ছ্বসিত গলা শুনল তারিন।

তারিন মাথা তুলে তাকিয়ে দেখল লোকটি হাসি দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে একবার তাকিয়ে নিজের চোখ নামিয়ে ফেলল।

জাফর এবার রফিকের দিকে তাকাল। রফিক ডাইনিংয়ে চলে গেল, একটি পাতিলে করে পানি এনে তারিনের সামনে রাখল, যেমনটা করতে জাফর নির্দেশ দিয়েছিল। জাফর পানির পাতিলটি হাতে নিল তারপর বিড়বিড় করে কী যেন পড়ল। তারিনের উপর ফুঁ দিয়ে উঠে গেল পড়া শেষে। দরজায় দাঁড়িয়ে শুরু করল আজান। আজান এত মধুর হয় তারিনের জানা ছিল না, সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে লাগল, জাফর আজান শেষ করে তারিনের সামনে এসে দাঁড়াল।

জাফর বলল, "তারিন! আমি তোমাকে প্রশ্ন করব। তুমি শুধু হ্যাঁ আর না-তে জবাব দেবে।"

জাফরের কথায় তারিন মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

"তুমি কি নিয়মিত নামাজ পড়তে?"

"হ্যাঁ।"

"এখন পড়ো?"

"না। আজ কিছুদিন যাবৎ পড়া হয় না।"

"কেন?"

"এমনি।"

"বিশেষ কোনো কারণ নেই তো?"

"না।"

"কবে থেকে নামাজ পড়া বন্ধ করেছ?"

"মাহার জন্মদিনের পর থেকে।"

"আচ্ছা, তোমার শরীরের কোনো অঙ্গ কি হঠাৎ করে অবশ হয়ে যেত?"

"হ্যাঁ।"

"কোন কোন অঙ্গ?"

"যখন হয় তখন সমস্ত শরীর একসাথে হয়।"

"দুঃস্বপ্ন দেখতে?"

জাফরের দিকে ছলছল চোখে তাকাল তারিন। মনে পড়ে গেল সেই পিশাচটার কথা। পিশাচটির আগুনের মতো দুটি চোখ তার মনে পড়তেই সে কেঁপে উঠল। জাফর নিজের ডান হাত তারিনের মাথায় রাখল। তারিনের কাঁপুনি থেমে গেল ঠিকই, কিন্তু ভিতরের উত্তেজনা রয়ে গেল। সে অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করল।

তারিন কাঁপা কাঁপা গলায় জবাব দিল, "হ্যাঁ।"

জাফর আবার প্রশ্ন করল, "কাকে নিয়ে?"

তারিন চুপ, কিছু বলল না, জাফর এবার বলল, "তুমি যদি না বলো তাহলে তোমার চিকিৎসা কী করে করব?"

"আমার মেয়েকে নিয়ে," তারিন অস্ফুট স্বরে জবাব দিল।

জাফর নিচের ঠোঁট কামড় দিল। এই বিষয়টা নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করা উচিত হবে না। মানুষ তার প্রিয় জিনিসকে হারানোর ভয় করে সবসময় আর সেই ভয় স্বপ্ন আকারে তার সামনে উপস্থিত হয়।

সে স্বপ্নের ব্যাপার এড়িয়ে গিয়ে বলল,"মাথাব্যথা হয়?"

"হ্যাঁ।"

"আগে ছিল?"

"হ্যাঁ। কিন্তু কম। এখন বেশি।"

"রাতে ঘুম হয়?"

"না।"

"তোমার কোমরে ব্যথা হয়?"

"মাঝে মাঝে।"

জাফর প্রশ্ন করা বন্ধ করে নিঃশ্বাস নিল। সে সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, "সাজেদ আর তারিন থাকুক। বাকিরা চলে যান।"

সবাই চলে গেল দোতলায়, কেউ কিছু বলল না। মিনিটের মধ্যে হলরুম খালি হয়ে গেল। মাত্র তিনজন রইল, জাফর সাজেদের সামনে গিয়ে বসে পড়ল। সাজেদ পা গুটিয়ে নিল।

জাফর বলল, "আপনিও হ্যাঁ/না-তে জবাব দেবেন।"

সাজেদ কিছু বলল না। শুধু সম্মতিসূচক মাথা নাড়াল।

"তারিন কি ইদানীং বিনা কারণে আপনার উপর রেগে যায়?"

"হ্যাঁ।"

"ঘনঘন বেহুঁশ হয়?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি থাকার সময় হয় না আপনি এসে বেহুঁশ অবস্থায় পান?"

"দুটোই।"

"খিঁচুনি হয়েছিল?"

"হ্যাঁ। একবার হয়েছিল।"

"নিজে নিজে কথা বলে?"

"হ্যাঁ।"

"বাথরুমে সময়ের চেয়ে বেশি থাকে?"

"হ্যাঁ।"

জাফর কিছুক্ষণ চুপ থেকে কিছুক্ষণ ভেবে নিল। তার নাকের ডগায় কয়েক শিশিরের মতো কয়েক ফোঁটা ঘাম জমেছে। সে ডান হাতের শার্টের হাতা দিয়ে ঘাম মুছে সাজেদকে আবার প্রশ্ন করল, "আপনার মেয়ের জন্মদিনের আগের দিন বা তার আগে আপনাদের সহবাস হয়েছিল?"

এরকম প্রশ্ন আশা করেনি সাজেদ, তারিনের দিকে অবাক চোখে তাকাল, তারিন মাথা নিচু করে আছে।

সাজেদ মুখ ফিরিয়ে ছোট করে জবাব দিল, "হ্যাঁ।"

এবার জাফর তারিনের কাছে গিয়ে বসে বলল, "আপনি কি সেদিন সকালে গোসল করে নামাজ পড়েছিলেন?"

তারিন মাথা নেড়ে না বলল, জাফর মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে দোতলার দিকে তাকিয়ে জোরে ডাক দিল, "সবাই আসতে পারেন।"

ডাক দিয়ে জাফর গিয়ে বসল, সে মাথায় হাত দিয়ে আছে। তারিন অবাক হয়ে লোকটিকে দেখছে। কে এই লোকটি? আর এরকম অদ্ভুত প্রশ্ন করছে কেন? লোকটি কি কোনো সাইকিয়াট্রিস্ট? সাইকিয়াট্রিস্ট তো মনে হয় না। কে সে?

সবাই এলো। জাফর শহিদকে বলল, "আপনি আপনার নাতনিকে নিয়ে রুমে গিয়ে দরজা লক করে বসে থাকুন।"

শহিদ সবার দিকে একবার তাকাল। তারপর কিছু না বলে মাহাকে নিয়ে দোতলায় চলে গেল। এবার জাফর তারিনের কাছে এলো।

তারিনের দিকে তাকিয়ে শীতল গলায় বলল, "আমি তোমার চিকিৎসা করতে যাচ্ছি।"

জাফরের হাতে সাতটি কচি বরই পাতা। তারিনের পিছনে দুজন দাঁড়িয়ে আছে, বাম পাশে সাজেদ আর ডান পাশে আসলান। জাফরের নির্দেশেই তারা তারিনের পিছনে দাঁড়িয়েছে। দুজনে মিলে মানব দেয়াল তৈরি করেছে। রফিক দাঁড়িয়ে আছে একটি চাদর নিয়ে। তারিন জড়সড়ো হয়ে বসে আছে সবার মাঝখানে। একটু আগে গোসল করে এসেছে, সে কাঁপছে, গোসলের পর অজু করে নিয়েছে তারিন। জাফর তখন পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তারিনের চুল এখনও শুকায়নি, নাক দিয়ে পানি পড়ছে, সম্ভবত সর্দি লেগে গিয়েছে।

জাফর তারিনকে নিয়ে এসেছে হলরুমে। হলরুমে এসে দেখল সাজেদ অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, রফিক আর আসলান কথা বলছে। তারিন এসে সাজেদের পাশে বসে পড়তেই সাজেদ মুখ তুলে তাকাল তারিনের দিকে, তারপর চুপচাপ বসে পড়ল। রফিক এক বালতি পানি এনে রাখল। তারিন মাথা নিচু করে বালতির পানির কম্পন দেখতে লাগল।

জাফর সাতটা পাতা তারিনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এগুলো নাও। এই পানিতে মেশাও," পাতাগুলো তারিনের হাতে দিয়ে বলল, "সূরা ফাতিহা, নাস আর ফালাক্ব পারো তো?"

তারিন হ্যাঁ-বোধক মাথা নাড়াল। জাফর বরই পাতাগুলোর দিকে ইশারা করে বলল, "সূরাগুলো পড়ে আগে এগুলো মেশাও।"

তারিন সোফা থেকে নিচে নেমে মেশাতে লাগল, পাতাগুলো মিশিয়ে আবার দাঁড়াল।

"পাতিলের সামনে বসে পড়ো। আমি তোমাকে যা বলব তাই করবে। আমি যে রুকইয়া (ঝাড়ফুঁক) করব সেটি ইবনে তাইমিয়া করতেন। মাজমুআল

ফাতাওয়াতে তিনি তা উল্লেখ করে গিয়েছেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করব।" জাফর বলল। তারিন আবার পাতিলের সামনে বসল।

"তুমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা, তাঁর কিতাব, নবী-রসূল আলাইহিমুস সালাম, মালাইকা আলাইহিমুস সালাম আর আখিরাতকে বিশ্বাস করো?" জাফর তারিনকে বলল।

তারিন বলল, "হ্যাঁ করি।"

"তাহলে নিজের ডান হাত পানির মধ্যে রাখো। আর আমি যা বলব তা আমার সাথে সাথে পড়বে।"

জাফরের কথামতো তারিন তার ডান হাত পানিতে রাখল। সাজেদ আর আসলান নির্বাক হয়ে দেখছে, রফিক ভীতসন্ত্রস্ত, তান্ত্রিকের তন্ত্র দেখছে। তান্ত্রিক বললে ভুল হবে, হুজুর বলা চলে কিন্তু তা-ও যায় না। সেই চিন্তা বাদ দিয়ে আসলান ভাবল, নিশ্চিত জাফর ভাঁওতাবাজি ছাড়া কিছু করছে না, তবুও দেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

জাফর এবার তারিনের কাছে ঝুঁকে গেল। তারপর পড়ল,

بِسْمِ اللهِ ، أَمْسَيْنَا بِاللهِ الَّذِيْ لَيْسَ مِنْهُ شَيْءٌ مُمْتَنِعٌ ، وَبِعِزَّةِ اللهِ الَّتِيْ
لَا تُرَامُ وَلَا تُضَامُ ، وَبِسُلْطَانِ اللهِ الْمَنِيْعِ نَحْتَجِبُ ، وَبِأَسْمَائِهِ الْحُسْنٰى كُلِّهَا
عَائِذٌ مِنَ الْأَبَالِسَةِ ، وَمِنْ شَرِّ شَيَاطِيْنِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ مُعْلِنٍ
أَوْ مُسِرٍّ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ بِاللَّيْلِ وَيَكْمُنُ بِالنَّهَارِ ، وَيَكْمُنُ بِاللَّيْلِ وَيَخْرُجُ
بِالنَّهَارِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ ، وَمِنْ شَرِّ إِبْلِيْسَ وَجُنُوْدِهِ ، وَمِنْ شَرِّ
دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ أَعُوْذُ بِاللهِ بِمَا اسْتَعَاذَ
بِهِ مُوْسٰى ، وَإِبْرَاهِيْمُ الَّذِيْ وَفّٰى ، وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ ، وَمِنْ شَرِّ
إِبْلِيْسَ وَجُنُوْدِهِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَبْغِيْ

"বিসমিল্লাহ, আমসাইনা বিল্লাহিল্লাজি লাইসা মিনহু শাইয়ুন মুমতানিউন। ওয়া বি ইজজাতিল্লাহিল্লাতি লা তুরামু ওয়া লা তুদ্বামু, ওয়া বি সুলত্বনিল্লাহিল মানীঈ নাহতাজিবু, ওয়া বি আসমাইহিল হুসনা কুল্লিহা আ'ইযুন মিনাল আবালিসাতি, ওয়া মিন শাররি শায়াত্বীনিল ইনসি ওয়াল জিননি, ওয়া মিন শাররি কুল্লি মু'লিনিন আও মুসিররিন, ওয়া মিন শাররি মা ইয়াখরুজু

বিল-লাইলি ওয়া ইয়াকমুনু বিন নাহারি, ওয়া ইয়াকমুনু বিল লাইলি ওয়া ইয়াখরুজু বিন নাহারি, ওয়া মিন শাররি মা খালাকা ওয়া যারা'আ ওয়া বারা'আ, ওয়ামিন শাররি ইবলীসা ওয়া জুনূদিহী, ওয়া মিন শাররি দা'ব্বাতিন, আনতা আ'খিযুন বিনাছিয়াতিহা, ইন্না রব্বি আলা ছিরাত্বিন মুস্তাক্বীমিন, আউযু বিল্লাহি বিমাসতা'আযা বিহী মুসা ওয়া ঈসা ওয়া ইবরহীমাল্লাযি ওয়াফফা, ওয়া মিন শাররি মা খালাকা ওয়া যারা'আ ওয়া বারা'আ, ওয়ামিন শাররি ইবলীসা ওয়া জুনূদিহী, ওয়া মিন শাররি মা ইয়ামবাগী।"

তারিনও পাল্লা দিয়ে জাফরের সাথে পড়ল, পানিতে হাত রেখে পড়া শেষ করল।

তারপর জাফর বলল, "এবার আবার সূরা নাস আর সূরা ফালাক্ব পড়ে পানিতে ফুঁ দাও। হাত রাখো।"

জাফরের কথামত তারিন সব কাজ করে দাঁড়াল।

জাফরকে উদ্দেশ তারিন বলল, "এখন?"

"এখন যা করার আমি করব।" জাফর হাসি দিয়ে বলল।

হাসিটা সহ্য হলো না তারিনের, সে ঝাড়ি দিয়ে বলল, "আমি এখন আমার রুমে যাই।"

তারিন সোফা পার হয়ে যাবে এমন সময় জাফর বলল, "আরেকটু বসো।"

তারিন জবাব না দিয়ে হনহন করে হেঁটে সিঁড়ির গোড়ায় চলে গেল। সাজেদ আর আসলান অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল। একটু আগে যে তারিন একজনকে ভর দিয়ে হেঁটে নেমেছে সে অল্প সময়ের ব্যবধানে এখন এত জোরে জোরে হাঁটছে কী করে!

"ওকে ধরে এনে এখানে বসান," সাজেদকে নির্দেশ দিল জাফর।

সাজেদ কথামতো সামনে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল ঠিক এই মুহূর্তে তারিন বলল, "খবরদার! এগোবি না।"

তারিনের গলা শুনে কলিজা কেঁপে উঠল সাজেদ, তারিনের ভিতর থেকে মনে হলো কয়েকজন কথা বলে উঠল। সাজেদ থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তারিনের মুখ শক্ত হয়ে আছে, চোখদুটি পলকেই লাল হয়ে গিয়েছে, এখন আরও লাল হচ্ছে। সাজেদের বুঝতে আর কিছু বাকি রইল না যে কী ঘটতে চলছে। তারিন সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে।

"দাঁড়িয়ে থাকলে হবে না। ওকে ধরে নিয়ে আসুন," জাফর চিৎকার করে বলল।

মুহূর্তেই সংবিত ফিরে পেয়ে সাজেদ দৌড় দিয়ে তারিনকে ধরল। আসলান এগিয়ে গিয়ে তারিনের ডান হাত ধরল। তারিন প্রচণ্ড রকমের শক্তি নিয়ে দুজনের সাথে ধস্তাধস্তি করছে। সেদিনের মতো অবস্থা হলে এবার তারিনকে ধরে রাখা সম্ভব হবে না। আশঙ্কাটা মাথায় আসতে কলিজা মোচড় দিয়ে উঠে আসলানের। কিন্তু না, তারিন একটু পর শান্ত হয়ে গেল। তারিনের দুই বাহু ধরে দুজন টেনে এনে জাফরের সামনে বসাল।

জাফর হাত দিয়ে ফ্লোরের দিকে নির্দেশ করল। তারিনকে ফ্লোরে বসিয়ে দুজনে ধরে থাকল তারিনের দুই বাহু। তারিন সাপের মতো ফোঁসফোঁস করছে, মনে হচ্ছে সাপ তার শিকারের জন্য কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। রফিক থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কী করবে বুঝতে পারছে না। জাফর পকেট থেকে একটি চক বের করে নিয়ে ঘুরে ঘুরে তারিনের চারপাশে বৃত্ত আঁকল। তিনজন বৃত্তের মাঝখানে বসে আছে।

বৃত্ত আঁকা শেষ করে জাফর বলল, "আপনারা দুজন বের হয়ে আসুন।"

সাজেদ বের হয়ে আসতে চাইল না, তারিন যদি আবার ছুটে বের হয়ে যায়, সে ভয়ে! আসলান কিন্তু জাফরের কথা শোনার সাথে সাথে তারিনকে ছেড়ে বের হয়ে এলো।

"আপনিও বের হন। সমস্যা নেই। ওর কিছু হবে না," সাজেদকে উদ্দেশ্য করে বলল জাফর।

সাজেদ বের হয়ে আসল। জাফরের হাতে একটি পানির বোতল দেখল আসলান। সে ভেবে পাচ্ছে না লোকটি পানির বোতল কোথা থেকে নিয়ে এসেছে। কোন ব্যাগ বা বহন করার মতো কিছু সে নিয়ে আসেনি। তাহলে এই পানিভর্তি বোতল কোথা থেকে আনল জাফর? আর এই পানির বিশেষত্বই বা কী? পানি তো অন্যান্য সময় গ্লাসে করে কাউকে আনতে বলে সে, কিন্তু এবার নিজেই বোতলে ভরে পানি নিয়ে এসেছে, ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হলো না আসলানের।

জাফর পানির বোতলটি নিয়ে সামনে রেখে বসল। আসলান অবাক হয়ে দেখছিল সব, সে গিয়ে জাফরের পিছনে দাঁড়াল, জাফর আসলানের দিকে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারিনের দিকে ফিরে সালাম দিল, "আসসালামু আলাইকুম।"

তারিন ফোঁসফোঁস করছে, কিছু বলল না। জাফর তারিনকে নিশ্চুপ দেখে মুচকি হেসে প্রশ্ন করল, "সালাম দিলাম। সালামের জবাব দিলেন না। তার মানে আপনি অন্য ধর্মের।"

এবারও তারিন নিশ্চুপ।

"আসলান!"

জাফর আসলানকে ডাক দিতেই আসলান বলল, "হুঁ।"

"জানো, শয়তান খুব ধূর্ত শ্রেণির হয়। প্রচণ্ড রকমের ধূর্ত। তুমি তো দেখেছ একটু দোয়া পড়তে বললাম। তারিন পড়েছে। তারপর শয়তানটি এসে তারিনের উপর ভর করল। সে নিজেও জানে না সে নিজের ফাঁদে পা দিয়েছে। এখন আমার সামনে বসে আছে। দেখো কী করে শায়েস্তা করি।" জাফর বলল।

জাফর তার ডান হাত তারিনের মাথার উপর রেখে বিড়বিড় করে কী যেন পড়তে লাগল, তারপর হাত দিয়ে বোতল থেকে একটু পানি বের করে তা ছিটিয়ে দিতেই তারিন গগনবিদারী চিৎকার দিয়ে উঠল। সাজেদ ভয় পেয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল, আসলান কেঁপে উঠল, এইমাত্র কী ঘটল বিশ্বাস হচ্ছে না সাজেদের। চিৎকার মনে হয় তারিন দেয়নি, বরং তারিনের ভিতর থেকে কয়েকটি মানুষ চিৎকার দিয়েছে। চিৎকারের শব্দ শুনে ভয়ে লোম দাঁড়িয়ে গেল সবার।

জাফর চিৎকার করে বলল, "তোর নাম কী?"

তারিন শুধু ফোঁসফোঁস করছে। জাফর আবার একটু পানি হাতে করে ছিটিয়ে বলল, "তোর নাম কী? একে কেন ধরেছিস?"

এবারও লাভ হলো না, তারিন মাথা নিচু করে ফোঁসফোঁস করছে। পরিবর্তন না দেখে জাফর এবার দুই হাতে পানি ছিটাতেই তারিন আবার চিৎকার দিয়ে উঠল। চিৎকার শুনে শহিদ নিচে নামল, নিচে নেমেই বলল, "কী হয়েছে আমার মেয়ের?"

"রফিক! তাঁকে নিয়ে যাও।" শান্ত স্বরে বলল সাজেদ।

রফিক শহিদকে আবার দোতলায় নিয়ে গেল। জাফর সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে নাক কুঁচকাল। প্রত্যেকবার কোনো রুকইয়া করতে গেলে এমন কিছু না কিছু ঝামেলার শিকার হতে হয় তাকে। যাইহোক, সে আবার প্রশ্ন করল, "কে তুই?"

প্রশ্ন করতে দেরি হলো, লাইট নিভে যেতে দেরি হলো না, অন্ধকার হয়ে গেল সমস্ত কিছু। আসলান ভয় পেয়ে জড়িয়ে ধরল সাজেদকে। সাজেদ তার পকেটে থাকা টর্চ লাইট জ্বালাল। রফিক সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকল, ভয়ে পাথর হয়ে গিয়েছে। মাহার কথা মনে পড়তেই শহিদকে রেখে এক দৌড়ে মাহার রুমে চলে গেল।

সাজেদ টর্চটা তারিনের দিকেই ধরে রাখল। তারিন মাথা নিচু করে রেখেছে, সাপের মতো সেও মাথা নাড়াচ্ছে আর ফোঁসফোঁস করছে। জাফর এবার পানি ছিটাল, একবার না, কয়েকবার। চিৎকার দিয়ে উঠল তারিন, চিৎকারের শব্দে বাড়িটি কেঁপে উঠল।

"শেষবারের মতো বলছি নিজের পরিচয় দে। না হয় জ্বালিয়ে দেব তোকে। কেন এসেছিস?" জাফর চিৎকার করে বলল।

এবার তারিন মাথা তুলে তাকাল। টর্চের আলোয় সাজেদ দেখল তারিনের চোখ রক্তের মতো লাল হয়ে আছে, চেহারা আর ফ্যাকাশে নেই, লাল হয়ে আছে। গাঢ় রক্ত লাল। তারিন চোখ তুলে একটি হাসি দিল, কী বীভৎস হাসি, টর্চের আলোয় সে হাসি দেখে গা শিউরে উঠল সাজেদের।

"কে তুই? কেন এসেছিস?" আবার চিৎকার করল জাফর।

এবার তারিন কী যেন বলল। তারিনের ঠোঁট নাড়তে দেখল সবাই কিন্তু কেউ কোনো আওয়াজ শুনল না। বলা মাত্রই জাফর পিছিয়ে গেল। জাফরের এমন আকস্মিক পরিবর্তনে কিছুই বুঝল না সাজেদ আর আসলান। তারিন যা বলল তার কিছুই আসলান বুঝতে পারল না শুধু একটি শব্দ ছাড়া।

অতসী...!

জাফরের কানে অতসী শব্দটা বাজতে লাগল। জাফর নিজেকে সামলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আজান দেওয়া শুরু করল। আজান দেওয়া মাত্রই চিৎকার শুরু করল তারিন। ঘরের ভিতর প্রচণ্ড জোরে বাতাস বইতে শুরু করল, ঘরের ভিতর সমস্ত কিছু কে যেন ছুড়ে মারছে, দেয়ালে সেগুলো আছড়ে পড়ছে, ডাইনিংরুম থেকে প্লেট ভাঙার আওয়াজ আসতে লাগল, মনে হচ্ছে সিঁড়িতে ধপধপ পা ফেলে কেউ নামছে। আসলান আর সাজেদ ভয়ে নিচে ফ্লোরে শুয়ে পড়ল। নিজেদের মাথায় হাত দিয়ে কাঁপতে লাগল, তারা কাঁপছে, নাকি তাদের নিচে মাটি কাঁপছে তা তারা বুঝতে পারছে না।

আজান শেষ হওয়া মাত্রই লাইট জ্বলে উঠল। আসলান চোখ মেলে চারদিকে তাকাল, সব ঠিক আছে, কোথাও কিছু নষ্ট হয়নি। কোথাও কিছু পড়ে নেই, কিছুই হয়নি, সব যেমন ছিল তেমনি আছে। তাহলে এই ঝড় কোথায় হয়েছিল? মনে হচ্ছে কিছুই হয়নি এখানে, সব ঠিক আছে। তারিনের দিকে চোখ পড়তেই দেখে তারিন বৃত্তের মধ্যে গুটিসুটি মেরে পড়ে আছে।

জাফর আসলানের দিকে তাকিয়ে বলল, "খাতা কলম নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি।"

আসলান কিছু বুঝল না, তবুও জাফরের কথা শুনে চলে গেল নিজের রুমে। সেখান থেকে খাতা-কলম নিয়ে ফিরে এসে দেখল, সাজেদ কাঁদছে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ছেলেমানুষের কান্না যে এত বিষাদময় হতে পারে তা আসলান আগে দেখেনি। কী করবে বুঝতে পারল না, অবশেষে সিদ্ধান্ত নিল সাজেদকে তার মতোই থাকতে দেবে।

আসলান খাতা-কলম এগিয়ে দিতেই জাফর হাত থেকে ছোঁ মেরে নিল। তারিন এখনও ফ্লোরে পড়ে আছে, নিচের বোতল থেকে এক অঞ্জলি পানি তুলে তারিনের উপর ছিটাল জাফর। তারিন চিৎকার দিয়ে জেগে গেল। জাফর খাতা আর কলম এগিয়ে দিল তারিনের দিকে, তারিন তুলে নিল, তারপর কী যেন লিখল। জাফর খাতা আর কলম নিয়ে নিল তারিনের হাত থেকে।

তারপর বলল, "শুকরিয়া।"

মুহূর্তেই আবার ফ্লোরে গড়িয়ে পড়ল তারিন, নিচে পড়ে থাকল, বুঝা গেল অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে তারিন। জাফর খাতাটা নিয়ে সামনে সোফায় এসে বসল। সাজেদ সোফায় বসে এখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আসলান এসে জাফরের পাশে দাঁড়াল।

"সাজেদ সাহেব, ওকে নিয়ে যান আর আমি আজ আসলানের সাথে থাকব," জাফর বলল।

সাজেদ দাঁড়িয়ে চোখের পানি মুছে নিজেকে ঠিক করল, তারপর তারিনকে কোলে নিয়ে আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল, চলে গেল বেডরুমে।

"চলো। রেস্ট নেওয়া যাক। সকালে উঠে ফজর বাকি কাজ করব," জাফর বলল। আসলান হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

"আসলান!" জাফরের ডাক শুনে চমকে উঠল আসলান। অবাক হয়ে জাফরের দিকে তাকাল।

"ভয় পেয়েছ?"

আসলান ছোট করে জবাব দিল, "হুঁ।"

"অবাক লাগছে?"

আসলান আবার ছোট করে জবাব দিল, "হ্যাঁ।"

জাফর উঠে আসলানের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আসলানের ডান কাঁধে হাত রেখে বলল, "ভয় নেই। আল্লাহ তায়ালা আছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের থেকে কখনো মুখ ফিরিয়ে নেন না। মানুষ আল্লাহ তায়ালাকে ভুলে গেলেও

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তাঁর বান্দাদের ভুলে যান না। সবসময় তাদের খেয়াল রাখেন। তার জন্য যা ভালো তা-ই করেন।"

জাফর হাত নামিয়ে ফেলল। তার কথা শোনার পর আসলান শান্ত হলো। ভয় কিছুটা কমল। কিন্তু বুকের ধুকপুকানিটা কমল না। তার মতো একজন নির্মোহ বিজ্ঞানমনস্ক মানুষকে এসব দেখতে হচ্ছে — তা নিশ্চয়ই হজম করার মতো কোনো ব্যাপার না। সে নিজের রুমে গিয়ে চোখ বুজে একটু বিশ্রাম নিতে চায়। ঠান্ডা মাথায় ভাবতে চায়। সে হাঁটতে লাগল। জুতার আওয়াজ শুনে পিছনে ফিরে তাকাল। তার পিছন পিছন জাফরও আসছে। সে অবাক না হয়ে নিজের রুমের দিকে গেল।
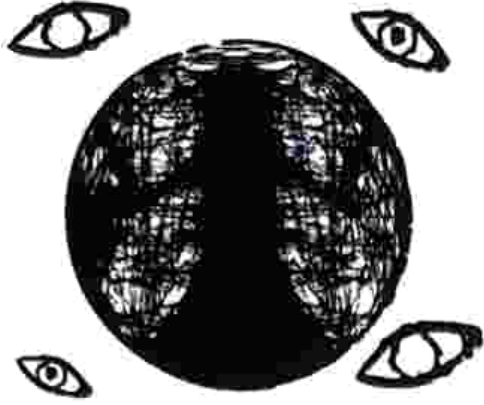
আসলান জাফরের পাশে শুয়ে আছে। বিছানায় গড়াগড়ি করছে অনেকক্ষণ যাবৎ ঠিকই কিন্তু ঘুম আসছে না। বিছানায় চুপ করে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে। জাফর ঘুমাচ্ছে কি না জানে না। তার মাথায় অনেক কিছু ঘুরছে। বিক্ষিপ্ত ভাবনার জগতে ডুবে যাচ্ছে বারবার, সেজন্য আর ঘুম আর আসছে না। একটু আগে জাফর তারিনের সাথে যা করল তা ব্যাখ্যাহীন। মুহূর্তেই তারিন বদলে যায়। স্প্লিট পার্সোনালিটি না তো?

কিন্তু স্প্লিট পার্সোনালিটিতে যখন মানুষ একটি পার্সোনালিটি থেকে আরেকটা পার্সোনালিটিতে বদল হয়, তখন একটি ট্রিগারের প্রয়োজন হয়। সেই ট্রিগার একটি সময়, একটি বস্তু, একটি অবস্থা, একটি কথা বা একটি স্মৃতি হয়ে থাকে, কিন্তু তারিনের বেলায় সেরকম কিছু খেয়াল করেনি আসলান। হয়তো এরকম কিছু আছে, যা আসলান বুঝতে পারেনি, সেটি বের করতে পারলে কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।

"স্প্লিট পার্সোনালিটির কেস না। একটু বেশি ভাবছ তুমি," জাফর পাশ থেকে জড়ো গলায় বলল।

আসলান একদম চমকে উঠল, খানিক পর ভয় পেল, বিছানায় বসে জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল। জাফর আসলানের মনের কথা কী করে বুঝল! কথাগুলো তো আসলান মনে মনে ভাবছিল, তাহলে এই মানুষটি বুঝল কী করে?

"আপনি কী করে বুঝলেন আমি কী ভাবছি?" জোরে জোরে শ্বাস নিতে নিতে বলল আসলান।

"তুমি এত জোরে মনে মনে কথা বলছ যে আমি শুনতে পেয়েছি," জাফর পাশ থেকে বলল।

আসলান তাহলে মনে মনে কথা বলছিল না। কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব? যদি জোরে জোরেই বলত তাহলে তো আসলানের মনে পড়ত, কিন্তু আসলানের স্পষ্ট মনে আছে সব যে, কথাগুলো সে মনে মনে বলছিল।

যাইহোক, এখন যেহেতু জাফর জেগে আছে তাহলে প্রশ্নগুলো করেই ফেলবে আসলান, না হয় বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে রাত পার হবে, কিন্তু জাফরকে কী বলে সম্বোধন করবে তা-ই ঠিক করতে পারেনি আসলান। ভাবতে লাগল সে, যেহেতু সে শিক্ষক, তাহলে স্যার বলেই সম্বোধন করা যাক।

আসলান আবার শুয়ে কিছুক্ষণ ভেবে কথাগুলো গুছিয়ে নিয়ে তারপর প্রশ্ন করল, "আপনি বললেন, জিন দ্বারা পজেসড আপা। তা কী করে বুঝলেন?"

জাফর ঘুমে জড়ো গলায় জবাব দিল, "দেখো একজন ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার রোগীকে জিজ্ঞেস করে সে কী কী কষ্ট ভোগ করছে, কী কী উপসর্গ দেখা যাচ্ছে রোগীর মধ্যে। রোগ নির্ণয় করতে প্রাথমিকভাবে ডাক্তার এসব করে, তারপর যদি চিকিৎসা করা সম্ভব হয় তাহলে রোগীকে ওষুধ দেয়। তারপরও যদি রোগী সুস্থ না হয় তাহলে ডাক্তার অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেয়, তারপর আবার চিকিৎসা করা শুরু করে। ঠিক এমনভাবে আমি প্রথমে উপসর্গ জেনে নিই।"

"আচ্ছা জিনে ধরার উপসর্গগুলো কী কী?" জাফর থামতেই আসলান প্রশ্ন ছুড়ে দিল।

জাফর আবার বলতে শুরু করল, "অনেকে অনেক রকমের কথা বলেছেন। ইবনে তাইমিয়া, হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতি রাহিমাহুল্লাহ, উমার সুলাইমান আশকারি বিভিন্ন জন বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। আমি সেগুলোকে এক করে নিজে কিছু দাঁড় করিয়েছি। যেমন ধরো —

এক নাম্বার হলো ইবাদতের প্রতি বিমুখতা।

নামাজ আদায় না করা, কুরআন মজিদ না পড়া, অপবিত্র থাকা ইত্যাদি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা সূরা যুখরুফের ৩৬ নাম্বার আয়াতে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, অতঃপর সে হয় তার ক্বারিন (সঙ্গী)।'

দেখো যেদিন তারিনের ফার্স্ট এনকাউন্টার হয় সেদিনের আগের দিন তারিন আর সাজেদের শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল। তারিন নামাজ পড়া থেকে বিরত ছিল, অপবিত্র অবস্থায় ছিল, আর বেশিরভাগ সময়েই এমন হয়। শয়তান একটি মানুষকে ঠিক এই সময়েই আক্রমণ করে। এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা পাঁচবার নামাজ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। পাঁচবার নামাজ পড়লে যেমন মানুষের

আত্মশুদ্ধি হয় ঠিক তেমনি শরীরেরও শুদ্ধি হয়। তারিন সেদিন দুটো বিষয় থেকেই বিমুখ ছিল।

আয়াতটি নিশ্চয়ই তোমাকে কনফিউজড করে দিয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা কেন শয়তান নিয়োজিত করবেন, তা তাফসীর পড়লে বুঝতে পারবে। সময় করে পড়ে নিও। সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তাফসীরে ইবনে কাসীর পড়তে পারো।

দুই নাম্বার উপসর্গ হলো কথা, কাজ, চলাফেরায় অদ্ভুত ব্যবহার করা। তিন নাম্বার হলো কোনো রোগ ছাড়াই বেহুঁশ হয়ে যাওয়া। চার নাম্বার হলো কোনো রোগ না থাকলেও শরীরের কোনো অঙ্গ অবশ হয়ে যাওয়া। পাঁচ নাম্বার হলো বিনা কারণে রেগে যাওয়া। ছয় নাম্বার হলো বাথরুমে বেশি সময় কাটানো। সাত নাম্বার হলো দুঃস্বপ্ন দেখা, তীব্র মাথাব্যথা, মেয়েদের অনিয়মিত মাসিক হওয়া।"

জাফর থেমে দম নিয়ে বলল, "এগুলো হলো মূল উপসর্গ। তাছাড়া এসব উপসর্গ অন্য রোগের কারণেও হতে পারে। সে কারণে নিশ্চিত হওয়ার জন্য রাতে আমি একটি রুকইয়া করলাম। বাকিটুকু তো তুমিই দেখলে।"

আসলান কিছু বলল না, চুপ করে থাকল। রাতে আসলানের সামনেই তারিনকে প্রশ্ন করা হয়েছে, এগুলো জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তারিন সবকিছুর পজিটিভ জবাব দিয়েছে। তাছাড়া জাফর যখন তারিনকে পড়া পানি ছিটিয়েছে, সে তখনই চিৎকার দিয়ে উঠেছে। আসলান বুঝতে পারেনি আসলে কী ঘটেছে, কেন ঘটেছে। শুধু আসলান কেন, কেউই বোঝেনি। আসলানের ইচ্ছে হলো প্রশ্ন করতে, কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল, এতকিছু জিজ্ঞেস করলে লোকটি বিরক্ত হবে।

আসলানের ঘুম আসছে না, তার সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছে হলো। সিগারেটের প্যাকেট পাঞ্জাবির পকেটেই আছে, সে তার হাত পকেটের উপর রাখল। মুচড়ানো সিগারেটের প্যাকেট আসলানের হাতে ঠেকল, সে উঠে বসে অন্ধকারে জাফরের দিকে একবার তাকিয়ে বের হয়ে আসল।

বাইরে বের হতেই দেখল হলরুমের লাইট জ্বালানো। অদ্ভুত লাগল আসলানের কাছে। রাত কম হয়নি, মধ্যরাত, এত রাতে কে হলরুমের লাইট জ্বালিয়ে রাখল। আরেকটু সামনে যেতেই বুঝল হলরুমের একদম মাঝখানের সোফায় কে যেন বসে আছে। ধক করে উঠল আসলানের বুক। অবয়বটিকে দেখে আসলানের ভয় লাগতে শুরু করল।

আসলান দূরে দাঁড়িয়ে থেকে ডাক দিল, "কে?"

কোনো জবাব নেই, কৌতূহলী হয়ে উঠল তার মন। সে এগিয়ে গেল হলরুমের দিকে, একদম হলরুমের কাছে এসে দাঁড়িয়ে চোখ ছানাবড়া করে অবয়বটির দিকে তাকিয়ে থাকল। হলরুমের অবয়বটিতে আর কেউ নয়।

রফিক!

রফিক মাথা নিচু করে বসে আছে। সোফার উপর পা দুটো তুলে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে, ঘুমিয়ে আছে না জেগে আছে তা বোঝা যাচ্ছে না। তার সাথে কিছু ঘটেছে, না হয় মাঝরাতে এখানে বসে থাকার মানে হয় না।

আসলান আস্তে আস্তে পা ফেলে রফিকের দিকে গেল। রফিক দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে আছে, প্রচণ্ড হতাশায় পড়লে মানুষ যেরকম ভাবে দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসে থাকে, ঠিক সেভাবে। আসলান এগিয়ে রফিকের পাশে দাঁড়াল। সে যে রফিকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তা বোধ হয় সে খেয়াল করেনি।

"রফিক ভাই!" রফিকের কাঁধে হাত রেখে আসলান ডাক দিল।

রফিক মাথা তুলে তাকাল। তার চোখ দুটি স্থির নেই, দৌড়াদৌড়ি করছে। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে আছে, কপালের পাশ বেয়ে টপটপ করে ঘাম পড়ছে। আসলান তা দেখে নিজের হাত সরিয়ে নিল।

আসলান রফিককে নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? এত রাতে এখানে কেন?"

রফিক কিছু বলল না, হাত তুলে ইশারা করল পানির জন্য। আসলান ছুটে গেল ডাইনিংয়ে, গ্লাসে পানি ভর্তি ছিল, আসলান গ্লাস নিয়ে এসে রফিককে দিল। রফিক ঢকঢক করে পানি গিলল, গিলেই আবার মাথা নিচু করে বসে রইল।

আসলান গ্লাসটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "রফিক ভাই, কী হয়েছে তা তো বলবেন।"

রফিক মাথা তুলে তাকিয়ে আসলানকে বসতে ইশারা করল। আসলান রফিকের পাশে বসতেই রফিক খপ করে তার হাত ধরে ফেলল, আসলান ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে উঠল, লাফ দিয়ে পিছনে চলে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ভাই কী হয়েছে?"

রফিক আরও শক্ত করে আসলানের হাত চেপে ধরে ফিসফিসিয়ে বলল, "আমি যে কথাটা বলব, তা কাউকে বলবে না তো? ওয়াদা করো।"

আসলান বুঝতে পারছে না কী বলবে, চুপ করে রইল।

রফিক উত্তেজিত হয়ে আসলানের হাত ঝাঁকি দিয়ে বলল, "ওয়াদা করো।"

আসলান অস্ফুট স্বরে বলল, "আচ্ছা।"

রফিক আসলানের হাত ছেড়ে দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিল, কথাগুলো গুছিয়ে নিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "আ...মি শুয়ে ছিলাম মাহার রুমে। মাহার নানা মাহার কাছে আমাকে দিয়ে অন্য রুমে চলে গিয়েছিল। আমিও মাহাকে নিয়ে দরজা দিয়ে শুয়ে ছিলাম। দরজা আটকে রাখার ফলে বাইরের কোনো আলো ভিতরে আসছিল না। তুমি হয়তো জানো না যে মাহা অন্ধকার ছাড়া ঘুমাতে পারে না। দরজা, জানালা সব বন্ধ করে রেখেছিলাম বুঝলে। একদম অন্ধকার। আমি মাহাকে গল্প শুনাচ্ছিলাম। মাহা গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল। একটু পর আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ করে চিকন গলার একটি চিৎকার শুনে ঘুম ভাঙল আমার।"

কয়েক সেকেন্ড থেমে রফিক নিজের ঠোঁট চেটে বলল, "আমি বুঝতে পারলাম না আমি স্বপ্নে শুনলাম না বাস্তবে। জেগেই দেখি গাঢ় অন্ধকার। সবকিছু একদম নিশ্চুপ। কোথাও কোনো শব্দ নেই। আমি আবার শুয়ে পড়লাম। চোখ লেগে আসল ঠিক এমন সময় শুনলাম কেউ কানের কাছে ফোঁস করে ওঠল। আমি ভুল শুনিনি। স্পষ্ট শুনেছি কেউ কানের কাছে এসে ফোঁস করে উঠেছে। আমি আবার বসে পড়লাম। ভয় লাগা শুরু হলো। আমি হাত বাড়িয়ে মাহাকে খুঁজতে লাগলাম। মাহাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এদিকে আমার অস্থিরতা বাড়তে লাগল। আমি পাগলের মতো অন্ধকারে মাহাকে খুঁজতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ খোঁজার পর আমার হাতে ঠান্ডা কী যেন লাগল। আমি হাত সরিয়ে নিলাম। মাহাকে পাচ্ছিলাম না। বুঝতেই পারছ আমার অবস্থা। আমি আস্তে করে মাহাকে ডাক দিলাম। কোনো জবাব আসল না। আবার ডাক দিলাম। এবার কে যেন আমার পাশ থেকেই আবার ফোঁস করে উঠল। আমি এবার ভয় পেলাম না। হাত দিলাম। হাত দিতেই ঠান্ডা স্পর্শ পেলাম। নরম, খসখসে একটি বস্তু হাতে লাগল। বস্তুটি আগেও আমার হাতে লেগেছিল। সেদিন গুদাম ঘরে। আমি লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়িমরি করে বাইরে এলাম।

বারান্দায় এসে হাঁপাতে লাগলাম। হঠাৎ করে মাহার কথা মনে পড়ল। দরজার কাছে যেতেই আবার শুনলাম ভিতরে কে যেন ফোঁসফোঁস করছে। ভয়ে আমার কলিজা মুখের কাছে এসে পড়ল। তারিনও এমন করত। কিন্তু তারিন তো সেখানে থাকার কথা না। আমি কী করব বুঝলাম না। যদি সাপ হয় তাহলে মাহা তো বিপদের মুখে। মেয়েটির কথা মনে পড়তেই আমি আবার রুমে ঢুকলাম।

আস্তে আস্তে পা ফেলে সুইচের দিকে যেতে লাগলাম। যতই এগোতে লাগলাম ততই ফোঁসফোঁস শব্দ শুনলাম। আমি ভয় না পেয়ে বোর্ডের কাছে গেলাম।"

রফিক থেমে আসলানের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, "আরেক গ্লাস পানি নিয়ে এসো।"

আসলান ডাইনিং টেবিল থেকে জগটা নিয়ে ছুটে আসল। এক গ্লাস পানি রফিকের দিকে এগিয়ে দিয়ে জগটি টি-টেবিলে রেখে দাঁড়িয়ে রইল সে। রফিক আসলানের হাত থেকে পানি নিয়ে কয়েক ঢোক খেয়ে গ্লাসটি আসলানকে ফিরিয়ে দিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে পানি খেতেও তার কষ্ট হচ্ছে।

রফিক বাম হাত দিয়ে মুখ মুছে বলল, "বোর্ডের কাছে গিয়েই সুইচ চেপে দিলাম। লাইট জ্বলল না। ভয়ে আমার আত্মার পানি শুকিয়ে গেল। বুক ধড়ফড় করতে লাগল। আমি আবার সুইচ চাপলাম। কয়েকবার চাপলাম। লাইট জ্বলছে না। এদিকে ফোঁস ফোঁস শব্দ বাড়তে লাগল। আমার মনে হলো বড়, বিষাক্ত একটি সাপ আমার দিকে আসছে। আমি সুইচ চাপতেই লাগলাম। চাপতে চাপতে হঠাৎ করেই একটি হাসির আওয়াজ শুনলাম। বিশ্বাস করো আমি এরকম হাসি আর কখনো শুনিনি।" রফিক থেমে একটা ঢোক গিলে আবার বলল, "আমার শরীরের সমস্ত লোম দাঁড়িয়ে গিয়েছে তখন। ভয়ে জমে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম বোর্ডের কাছে। কী করব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আমার বুকের ধড়ফড়ানি বেড়ে গেল। হাসি শোনার কিছুক্ষণ পর আপনাআপনিই লাইট জ্বলল। অথচ আমি তখন লাইটের সুইচ দিইনি। বিশ্বাস করো আমার হাত নিচে আটকে ছিল। আমি বোর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখি সুইচ বন্ধ। কিন্তু লাইট জ্বলছে। আমি সাথে সাথে বিছানার দিকে তাকালাম। দেখলাম মাহা শুয়ে আছে। নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। মাহাকে দেখছিলাম এমন সময় আবার লাইট চলে গেল। বোঝো আমার অবস্থা। আমি আর দেরি করিনি। এক দৌড়ে নিচে নামলাম। নেমে এখানে বসে হাঁপাচ্ছিলাম। তারপর তোমার দেখা পেলাম।"

রফিক শেষ করল, আসলান রফিকের কথা শুনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। রফিক তা দেখে আসলানকে প্রশ্ন করল, "কী হয়েছে তোমার? "

আসলান মুখ খুলে আওয়াজ করল, "মাহা!"

বলেই এক দৌড়ে দোতলায় উঠল আসলান। এরকম কিছু যদি হয় তাহলে মাহা নিশ্চয়ই বিপদে আছে। মাহার রুমের দরজা খোলা, আসলান কোনো কিছু চিন্তা না করে ভিতরে ঢুকে গেল, ভিতরে ঢুকেই সোজা চলে গেল বিছানার কাছে। বারান্দার লাইটের আলোয় ভিতরের গাঢ় অন্ধকার খানিকটা দূর হয়ে গিয়েছে,

একটু একটু দেখা যায়। আসলান দেখল বিছানার উপর একটি মানুষের অবয়ব দেখা যাচ্ছে, সেই আলোয় মাহা যে শুয়ে আছে বুঝতে পারল সে।

আসলান আস্তে আস্তে পা ফেলে মাহার কাছে গিয়ে তার গায়ে হাত রাখল। হ্যাঁ, মাহা শুয়ে আছে। ঠান্ডা অনুভূত হতে শুরু করল। জোরে নিঃশ্বাস ফেলল সে। রফিক ভয় পাইয়ে দিয়েছিল, যা বলেছে এখন তার সিকিভাগও বিশ্বাস হচ্ছে না, রফিক নিশ্চয়ই হ্যালুসিনেট করেছে। সারাদিন অদ্ভুত সব ব্যাপারের প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে রফিকও ছিল, তাই বোধ হয় হ্যালুসিনেশন হয়েছে। আসলান মাহার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বের হয়ে আসল, বের হয়ে আসার সময় মাহার রুমের দরজা বন্ধ করে দিল।

নিচে নেমে হলরুমে ঝুলানো ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল রাত দুইটা বাজে। আজ কয়দিন যাবৎ রাতে ঘুম হয় না, বলতে গেলে এই ঝামেলার কারণে ঘুমাতে পারে না। সারাক্ষণ এসব নিয়ে ভাবে আসলান, যার ফলে মাথা ঝিমঝিম করছে। বিশেষ করে সেদিনের হুজুরের মৃত্যু এখনও তাকে ভাবায়। চোখের সামনে একটি মানুষ রক্ত বমি করে মারা গেল, এখন পর্যন্ত হুজুর কিংবা হুজুরের পরিবারের কোনো খবর নিতে পারেনি সে।

এদিকে এই বাড়ি থেকে বের হতেই ভয় পাচ্ছে, বের হলেই পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে। কিন্তু সে হুজুরের মৃত্যুর কোনো সমাধান করতে পারেনি, কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। একজন সুস্থ মানুষ হঠাৎ রক্ত বমি করে মারা গেল। মৃত্যুর আগে হুজুর কী লিখে গিয়েছেন? কেন লিখে গিয়েছেন? তার উত্তর আগে বের করতে হবে।

হুজুরের শেষ লেখার কথা আসলান কাউকে জানায়নি। মাহা কী করে সেই গুদাম ঘরে গেল তা-ও জানা হলো না। মাহাকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেনি, সবাই বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছে। সবার আগে হুজুরের ব্যাপারটি খোলাসা করতে হবে, সেটির সাথে হয়তো সবকিছু জড়িয়ে আছে। একজন জলজ্যান্ত মানুষ হঠাৎ কেন রক্ত বমি করে মৃত্যু হলো সেটার কারণ জানা সবার আগে জরুরি।

"রফিক ভাই। এখানেই শুয়ে যান। আমিও আছি এখানে। নিচে কার্পেটে শোব," আসলান রফিকের দিকে তাকিয়ে বলল।

"তুমি আমার কথা বিশ্বাস করোনি? রফিক গম্ভীর গলায় বলল।

আসলান মুচকি হেসে বলল, "আরে ভাই। অনেক কিছুই তো ঘটছে। বিশ্বাস না করার কী আছে?

"না, তোমার চেহারা দেখে তো মনে হয় তুমি ভাবছ আমি মজা করছি তোমার সাথে।" রুক্ষ গলায় রফিক বলল। আসলান খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে গেল। সে বুঝতে পারছে রফিকের মেজাজ আস্তে আস্তে চড়ছে।

"ভাই, আপনি এখানে রেস্ট নিন।"

"না, তুমি যাও তোমার রুমে। আমি আমার রুমে যাই," রফিক জবাব দিল।

আসলান রফিকের মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, "আপনি থাকতে পারবেন তো?"

রফিক মুখে কষ্ট করে হাসি ফুটিয়ে বলল, "আরে পারব। যতটা ভীতুর ডিম ভাবো, ততটা ভীতু আমি নই। চলো যাই।"

রফিক দাঁড়িয়ে গেল, নিচতলায় রফিক থাকে, আর রফিকের পাশেই আসলানকে থাকতে দিয়েছে সাজেদ। আসলান গেস্টরুমে ছিল এতদিন, কিন্তু নিচতলায় এসে পড়েছে, বিপদ ঘটলে যেন হলরুমে আগে পৌঁছানো যায়, তা ভেবেই হয়তো সাজেদ আজ এখানে থাকতে বলেছে দুজনকে।

রফিক আগে আগে এগিয়ে গিয়ে নিজের রুমে ঢুকে ভিতর থেকে দরজাটা লাগিয়ে দিল, তারপর আসলান নিজের রুমের দিকে গেল। সে নিজের রুমে এসে দেখল দরজা অল্প করে খোলা। সে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই সুগন্ধ এসে তার নাকে লাগল, এমন সুগন্ধ আসলান আগে কখনো পায়নি, অদ্ভুত মিষ্টি একটি গন্ধ, মন হারিয়ে যায় এমন।

সুগন্ধির উৎস বোঝার চেষ্টা করল আসলান। খোঁজাখুঁজি করতে লাগল সুগন্ধ কোথা থেকে আসছে, অনেকক্ষণ খোঁজার পরও কোনো নির্দিষ্ট উৎস খুঁজে পেল না। সুগন্ধ সমস্ত ঘর জুড়েই ছিল, সে আর খোঁজার চেষ্টা করল না। ভিতরে অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার নয়, আবছা আলো আছে। সবকিছু বোঝা যাচ্ছে। বিছানার উপর একটি কালো অবয়বকে শুয়ে থাকতে দেখল আসলান। জাফর ঘুমিয়ে রয়েছে। আসলান জাফরের পাশে শুয়ে পড়ল। বিছানায় পিঠ ঠেকাতেই তার চোখ লেগে আসল।
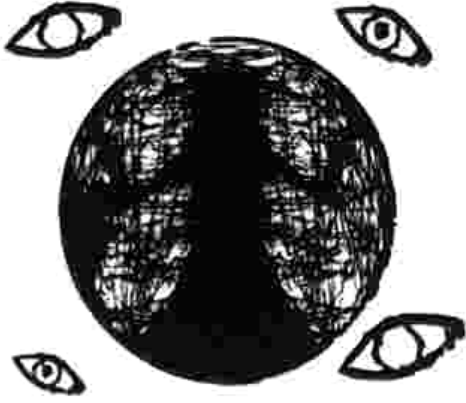
আসলানের চোখ জ্বলছে, মাথাও ব্যথা করছে। রাতে ঘুমিয়েছে দেরিতে আবার জাফর পাঁচটার দিকে ডাক দিয়ে তুলে দিয়েছে। আসলান জাফরের সাথে ফজর নামাজ পড়েছে কিছুক্ষণ আগে, এখন জাফরের পিছন পিছন যাচ্ছে, আসলানকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সেটা সে জানে না।

নামাজ শেষ করার পর জাফর হঠাৎ আসলানকে বলল, "চলো।"

আসলান আবার জিজ্ঞেস করল, "কোথায়? "

জাফর জবাব দিল না, শুধু একটু হেসে বলল, "এসো, তারপর দেখতে পাবে।"

আসলান জাফরের পিছন পিছন বের হয়ে এলো। বেশিক্ষণ হয়নি, এই তো পাঁচ মিনিট হলো গলির রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। সকালের ঠান্ডা বাতাস এসে আস্তে আস্তে ঠান্ডা করে দিচ্ছে। আসলান নিজের দুই হাত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল। মানুষ বের হয়নি এখনও, গলির কুকুরগুলো এত সকালে দুজনকে হাঁটতে দেখে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে, কয়েকটা আবার পিছু নিয়েছে। সে জাফরের পিছন পিছন হাঁটছে, হঠাৎ করে সে জাফরকে পার হয়ে সামনে এসে হাঁটতে শুরু করল। জাফর চোখ রাঙিয়ে জানতে চাইল কেন এমন করল, কিন্তু আসলান কিছু বলল না, কিছুক্ষণ এভাবেই চুপচাপ হাঁটল।

হাঁটার গতি ধীর করে জাফরের বরাবর হাঁটতে হাঁটতে জাফরকে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, জিন কেন মানুষকে ক্ষতি করে?"

জাফর আসলানের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, "সব বলব।"

আসলান বিরক্ত হলো, সাথে লজ্জিতও হয়েছে। সে প্রশ্ন করেছে ঠিকই কিন্তু জাফর জবাব দেয়নি। আসলান বুঝতে পারল যখন সে কোনো প্রশ্ন করে তখন

জাফর বিরক্ত হয়। দুজনেই চুপচাপ হাঁটছে। নীরবতা ভেঙে জাফর বলল, "তা বলো তোমার লেখাপড়া কেমন চলছে?"

"চলছে আর কি।"

"বাড়িতে কে আছে?"

আসলান জাফরের দিকে মুখ ফিরিয়ে জবাব দেয়, "কেউ নেই। মা দুই বছর আগে মারা গিয়েছে।"

"বাবা?"

বাবার কথা জিজ্ঞেস করতে আসলান চুপ হয়ে যায়। জন্মের পর বাবাকে দেখেনি আসলান, বাবা সম্পর্কে মাকে প্রশ্ন করলে মা এড়িয়ে যেত, নানা রকম গল্প বানাত, একসময় ক্লান্ত হয়ে প্রশ্ন করা ছেড়ে দেয় আসলান।

"এসে পড়েছি।" জাফরের কথা শুনে আসলানের চিন্তায় ছেদ পড়ল।

আসলান দেখল একতলা একটি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে, বাড়িটির দরজার ঝুলছে বিশাল লোহার কড়া, জাফর এগিয়ে গিয়ে দুইবার সেই কড়াটি দিয়ে দরজায় নক করল। নক করার কিছুক্ষণ পর দরজাটি খুলতেই নাসির সাহেবকে দেখতে পেল আসলান। নাসির সাহেব দরজা খুলেই জাফরের উপর-নিচ একবার দেখে নিয়ে আসলানের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "আরে! এসো এসো।"

আসলান অবাক হলো, অবাক হওয়ারই কথা, আসলানকে ভালো করে চিনেনও না, অথচ তাকে এমনভাবে সম্বোধন করলেন যেন অনেক দিনের পরিচিত। চেনা আত্মীয় বাড়িতে এলে দ্বিধাহীনভাবে যেভাবে সম্বোধন করে সেভাবে সম্বোধন করলেন।

নাসির সাহেব এখনও দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে একটি হাসি ঝুলে আছে। দরজার কপাট পুরোপুরি খোলা নয়, আংশিক খোলা। একটি কপাট খোলা আর তা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন নাসির সাহেব। জাফর দরজা ঠেলে ঢুকল, তারপর আসলান। দরজা দিয়ে ঢোকার সময় নাসির সাহেবের দিকে তাকিয়ে আসলান একটু হাসল। ভিতরে ঢুকতেই সুগন্ধ এসে লাগল, আতরের গন্ধ, এবার গন্ধটা ঠিকই বুঝতে পারল।

কাল রাতে যেমন পেয়েছিল তেমন নয়, তবে ভালো গন্ধ। এবার আসলান বুঝতে পারল যে গন্ধটা নাসির সাহেব থেকেই আসছে। ঘরে কয়েকটি বেতের চেয়ার রাখা, সেগুলোর একটিতে গিয়ে বসে আছেন নাসির সাহেব। ঘরে ঢোকার সাথে সাথে জাফর যেন কোথায় হারিয়ে গেল, আসলান এদিক-ওদিক তাকাল, কিন্তু কোথাও জাফরকে দেখতে পেল না।

আসলান ঘরটার চারপাশে চোখ বুলাল, ছোটখাটো একটি হলরুম, ঘরের মধ্যে বিশেষ কোনো আসবাব নেই। ছোট একটি ডাইনিং টেবিল, তার চারপাশে চারটি চেয়ার, তার থেকে দূরে কয়েকটি বেতের চেয়ার রাখা। পুরো দেয়ালে সাদা রং করা, দেয়ালে কোনো ছবি বা অন্যকিছু ঝুলানো নেই, আসলান খুব অবাক হলো এ দেখে যে বাড়ির চারপাশে জানালাগুলো বন্ধ, সেগুলো আবার পর্দা দিয়ে ঢাকা। বাইরে থেকে কোনো আলো আসছে না, দমবন্ধ অবস্থা, মিটমিট করে আলো জ্বলছে। সব মিলিয়ে ভৌতিক পরিবেশ।

"এসো, এখানে বসো," নাসির সাহেব চেয়ার নির্দেশ করে বললেন।

আসলান এগিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসে সমস্ত বাড়ির দিকে চোখ বুলাল, এখনও উল্লেখযোগ্য কিছু চোখে পড়ল না, একেবারে সাদামাটা একটি বাড়ি।

"তা কেমন আছ?" নাসির সাহেব প্রশ্ন করলেন।

"জি ভালো," আসলান জবাব দিল।

"বলো আলহামদুলিল্লাহ। সাজেদের পরিবারের কী অবস্থা দেখেছ তো। আল্লাহ তোমাকে তো সেই অবস্থায় ফেলেননি," নাসির সাহেব লেকচার দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন। আসলান মনে মনে আলহামদুলিল্লাহ্ বলল।

"বুঝলে, মানুষ সবচেয়ে বড় পিশাচ। এই যে পরিবারটির উপর জিন লেলিয়ে দিয়েছে। আমি প্রথম যেদিন গিয়েছিলাম সেদিনই বুঝেছিলাম। আমি ডাক্তার তবুও এসব বিশ্বাস করি। আমার চোখের সামনে অনেক ব্যাখ্যাহীন ব্যাপার ঘটে গিয়েছে। তুমিও তো বিশ্বাস করা শুরু করেছ।" নাসির সাহেব কয়েক সেকেন্ড থেমে বলল, "আমরা আমাদের দুনিয়াকে কতটাই চিনি? মানুষের দৃষ্টিসীমা মাত্র ৪৩০ থেকে ৭৭০ টেরাহার্টজ, অপরদিকে মানুষের কান ২০ হার্টজ থেকে ২০ কিলোহার্টজ তরঙ্গের শব্দ শুনতে পারে। এই যে রেঞ্জটা কিন্তু এই বিশাল তরঙ্গের একটা ফ্রেকশন। তাহলে একটু চিন্তা করো এই রেঞ্জের বাইরে যেগুলো আমরা দেখতে পারি না বা শুনতে পারি না, সেখানে কি কিছু থাকতে পারে না?"

নাসির সাহেব কথা শেষ করেই আসলানের মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে থাকলেন, অপেক্ষা করলেন আসলানের জবাবের। আসলান ডুবে গেল চিন্তার জগতে। আসলেই তো! এগুলোর বাইরে তো অনেককিছুই থাকতে পারে! কিছুদিন আগেও যেখানে আসলান ছিল সংশয়বাদী, অথচ আজ বিশ্বাসী। অনেক

কিছুই আমাদের সাথে ঘটে যায় যেগুলো বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাহলে এটা কি এমন কিছু?

"কী হলো? আবার কোথায় ডুবে গেলে?" নাসির সাহেব ভারী গলায় বললেন।

আসলান সংবিৎ ফিরে পেয়ে বলল, "না, তেমন কিছু না।"

নাসির সাহেব মুচকি হাসলেন, আসলান নিজের দৃষ্টি ঘোরাল অন্যদিকে, সে দেখল জাফর এগিয়ে আসছে। পরনে লুঙ্গি আর ফতুয়া, পিছনে ছোট একটি ব্যাগ।

আসলানের সামনে এসে বলল, "চলো।"

আসলান অবাক হয়ে বলল, "কোথায়?"

"ভিক্টিমের কাছে," জাফর জবাব দিল।

"আহা! নাশতা করে যাক ছেলেটা। প্রথমবার আসল," নাসির সাহেব মাঝখান থেকে বললেন।

জাফর বিরক্তির সুরে বলল, "মামা, বেশি দেরি করলে হুজুরের মতো হবে। ওই পরিবারকে সাধারণ কোনো জিন ধরেনি। মারিদ ধরেছে। দেরি করলে সব শেষ।"

আসলান মাথামুণ্ডু কিছু বুঝল না, হাঁ করে তাকিয়ে থাকল জাফরের মুখের দিকে।

"মারিদ! এসব কে করল? তাহলে তো বিপদ। তুই কি পারবি?" নাসির সাহেবের গলা কেঁপে উঠল কথাগুলো বলার সময়। একটি অজানা আশঙ্কা যেন চেপে ধরল নাসির সাহেবের গলা, কথা কেমন ভাসা ভাসা শোনাল।

"মামা তুমি শুধু শুধু চিন্তা করছ। মারিদের সাথে আমার অনেক পুরানো সম্পর্ক আছে। ওদের আমি বুঝি, জানি এবং শায়েস্তা করতে পারি। এছাড়া আর কোন রাস্তা নেই," জাফর আসলানের দিকে তাকিয়ে বলল, "চলো আসলান।"

জাফর হনহন করে হেঁটে বের হয়ে গেল। আসলানও বের হওয়ার আগে নাসির সাহেবের দিকে তাকাল, চোখ ছোট ছোট করে আহত দৃষ্টিতে নিজের ভাগ্নের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।

আসলান ভেবেছিল জাফর বুঝি ওঝা, এখন দেখছে নাসির সাহেবও ওঝা। এই পুরো পরিবার দেখছি এইসবের সাথে জড়িত! ভাবল সে। ডাক্তার মানুষ, সারা জীবন ধরে যারা বিজ্ঞান চর্চা করে তারা কীভাবে এরকম ঝাড়ফুঁকের সাথে জড়িত হয়?

খুব অদ্ভুত পরিবার, সেজন্য হয়তো কোনো নারী এই পরিবারের সাথে যুক্ত হয় না। আসলান আর কিছু বলল না, কী বলবে তা-ও বুঝতে পারছে না, ভাবলেশহীন হয়ে জাফরের পিছনে পিছনে যেতে লাগল।

দুজনেই হাঁটছে, আসলান জোরে জোরে পা চালিয়ে জাফরকে ধরল। অনেক্ষণ যাবৎ পাশাপাশি হাঁটল, সে এবার জাফরের সমানে সমানে হাঁটছে। তার মাথায় প্রশ্ন ঘুরছে। মারিদ কী? জানতে হবে।

"আচ্ছা মারিদ কী?" আসলান দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল।

জাফর চেহারার কোনো অভিব্যক্তি না ফুটিয়ে আসলানকে পেরিয়ে সামনে চলে গেল। আসলানও জাফরের পিছু পিছু হাঁটতে লাগল।

"জিনের একটি জাত," জাফর হাঁটতে হাঁটতে ছোট করে জবাব দিল।

"জিনের জাত আছে?" আসলান অবাক হয়ে পেছন থেকে প্রশ্ন করল।

জাফর হাঁটা থামিয়ে আসলানের দিকে খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "ইমাম বাগবী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর শারহুস সুন্নাহ বইয়ে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু ছালাবা আল খুশানি রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে। নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা বলেছেন, 'জিন হলো তিন ধরনের। প্রথম যারা তাদের পাখা আছে এবং তারা উড়তে পারে। আরেক শ্রেণি সাপ-কুকুর আকারে বসবাস করে। আরেক শ্রেণি স্থায়ীভাবে এক জায়গায় বসবাস করে ও ভ্রমণ করে। একদম মানুষের মতো তারা।'

কিন্তু আরবদের ভাষায় জিন ছয় প্রকার। ইবনে আব্দুল বার রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, জিন অনেকের কাছে অনেক রকমের হয়। যেমন– এক. কেবল জিনকে উল্লেখ করলে বলে 'জিন্নি।' দুই. যারা মানুষের সাথে বসবাস করে তাদের বলে 'আমের।' বহুবচনে 'উম্মার।' তিন. যে জিন শিশুকে উত্যক্ত করে তাদের বলে 'আরওয়াহ।' চার. যেই খারাপ জিন শুধু মানুষদের দিকে শত্রুতা দেখায় তাদের বলে 'শয়তান', বহুবচনে 'শায়াতিন।' পাঁচ. যদি শায়াতিন মানুষকে ক্ষতি করে তাহলে তারা 'মারিদ', বহুবচনে 'মারাদাহ', আর সবার শেষে ইফ্রিত।"

এতটুকু বলার পর চুপ হয়ে গেল জাফর। ইফ্রিতের নাম বলার সময় জাফরের গলা কেমন কেঁপে উঠল, আসলান ভয়ের গন্ধ পেল জাফরের মধ্যে, মুহূর্তেই আবার তা মুছে গেল।

"এই শ্রেণিবিন্যাস আশ শিবলি তাঁর বই 'আকামুল মারজান ফি আহকামিল জান্ন' বইয়ে উল্লেখ করেছেন। তবে খারাপ জিন মূলত তিন প্রকার, যারা মানুষের

ক্ষতি করতে পারে। মারিদ, গয়লান আর ইফ্রিত। মারিদ কখনো একা কোনো মানুষকে ক্ষতি করে না, দল বেঁধে আসে, তাই ওদের মারাদাহ বলে। সেই জন্য যার উপর তাকে ক্ষতি করার জন্য নিযুক্ত করা হয় সে শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় ভোগে। এমনকি তার আশেপাশে যারা থাকে তাদেরও ক্ষতি করে। এজন্য রোগীর যেই অভিজ্ঞতা হয় তা তার আশেপাশের মানুষজনেরও হয় এবং প্রতিক্রিয়া শেয়ারড হয়। যদি সাইকোলজির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখো তাহলে এটাকে বলে শেয়ারড সাইকোটিক ডিজঅর্ডার।" জাফর জবাব দিয়ে আবার পুরোদমে হাঁটতে শুরু করল।

আসলান জাফরের জবাব শুনে আবার ভাবনার জগতে হারিয়ে গেল। এ কারণেই শুধু তারিন নয়, পরিবারের প্রত্যেক সদস্য কিছু না কিছু অনুভব করেছে, সবাই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। আসলান ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে দেখল জাফর অনেক দূরে চলে গিয়েছে, সে দৌড় দিল, হাঁপাতে হাঁপাতে এসে জাফরকে ধরল। দুজনে পাশাপাশি হাঁটছে। আসলান খেয়াল করল জাফর মোটেও আগের মতো নয়, অনেকটাই রাশভারী আর কঠিন ব্যক্তিত্বের চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে এখন তার মধ্যে। মানুষটিকে দেখলে মনে হয় সবসময় চিন্তায় ডুবে থাকে। আসলান আর কিছু বলল না, দুজনে নীরবে হেঁটে চলল সাজেদের বাড়ির দিকে।

সবাই এখন ডাইনিংরুমে, গোল হয়ে বসে আছে সাজেদ, শহিদ আর মাহা; একপাশে সাজেদ আর মাহা, আরেকপাশে শহিদ। সাজেদ ঘুম থেকে ওঠার পর খেয়াল করল রফিক আর শহিদ দুজনেই মাহাকে এড়িয়ে চলছে, মাহাকে দেখলেই মুখ কালো করে ফেলছে। হঠাৎ করে দুজনের মাহার প্রতি এমন মনোভাবের কারণ বুঝতে পারল না সে, বোঝার চেষ্টাও করছে না। চারপাশে ঘটছে অদ্ভুত সব ঘটনা, যার অধিকাংশই ব্যাখ্যাহীন।

সুতরাং এসব সম্পর্কে সাজেদ আর ভাবতে চায় না, আপাতত তারিনকে নিয়েই ভাবা যাক। সে শুধু তারিনকে নিয়ে বাঁচতে চায়, আর কিছু লাগবে না তার। সবাই নাশতার জন্য অপেক্ষা করছে, খালি প্লেট নিয়ে বসে আছে আর নাশতা বানাচ্ছে তারিন। রান্নাঘর থেকে তেলের গন্ধ ভেসে আসছে, সাথে তাল মিলিয়ে শব্দ। সকালে সাজেদ উঠে দেখল তারিন বিছানায় নেই। তার বুক ধক করে উঠল।

রাতে স্যালাইন দিয়ে রাখা হয়েছিল তারিনকে, স্যালাইন ঝুলছিল খাটের হ্যাঙারে, কিন্তু সে বিছানায় নেই। সাজেদের কলিজা মোচড় দিয়ে উঠল। সে এক লাফ দিয়ে উঠে বাথরুমে গেল, বাথরুমে গিয়ে দেখল তারিন নেই। রুম থেকেই জোরে জোরে তারিনকে ডাক দিল, কিন্তু কোথাও তারিনের সাড়াশব্দ নেই। তারিনের কোনো জবাব না পেয়ে অস্থির হয়ে গেল সাজেদ। সে বের হয়ে মাহার রুমে গিয়ে দেখল মাহাও নেই।

হন্তদন্ত হয়ে নিচে নেমে দেখল মাহা বসে আছে সোফায়। মাহাকে দেখে যেন কলিজায় পানি আসল সাজেদের। মাহাকে জিজ্ঞেস করল তারিন কোথায়। মাহা হাত দিয়ে রান্নাঘরের দিকে ইশারা করল। সে কিচেনে যেতেই তারিন মুখ ঘুরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "গুড মর্নিং।"

সাজেদ কী জবাব দেবে বুঝতে পারছিল না। তারিন একদম বদলে গিয়েছে, এত দ্রুত মানুষ বদলায় কী করে! আগের মতো হয়ে গিয়েছে। চোখের নিচে কোনো কালো দাগ নেই, চোখ দুটি স্থির, মুখ স্বাভাবিক, মুখে হাসি ঝুলছে।

"কী খাবে?" তারিন সাজেদকে স্থির দেখতে পেয়ে বলল।

সাজেদ নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "যা খাওয়াও।"

তারিন হেসে বলল, তার বাবাকে নিয়ে নিচে আসতে, সাজেদও আদেশ শুনে দেরি করেনি, এক দৌড় দিয়ে শহিদকে নিয়ে আসল। রফিককে বাজারে পাঠিয়ে দিল, কতদিন হলো ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া হয় না, বাড়িতে এত ঝামেলার মধ্যে ভালোমতো খাওয়া হয়নি তার। তারিনের রান্নাঘরে আসাতে ক্ষুধা যেন পেটের মধ্যে নাড়া দিয়ে উঠল। মন সতেজ হয়ে গেল সাজেদের। রফিককে পাঠিয়েই ক্ষান্ত হলো না সে, নিজে রওনা দিল আসলান আর জাফরকে নিয়ে আসতে।

কিন্তু অবাক হলো আসলানের রুমে গিয়ে, আসলান আর জাফর কেউ ছিল না, বিছানা শূন্য। সাজেদ ভাবল বাড়ির কোথাও হয়তো আছে। সমস্ত বাড়ি খুঁজল, তাদের পেল না। খোঁজাখুঁজি শেষ করে এখন ডাইনিংয়ে এসে বসে আছে। তারিন হাতে খুন্তি নিয়ে ডাইনিংরুমে এসে দাঁড়াল, দেখল ডাইনিংয়ে সব ঠিকঠাক আছে কি না। তারিনের দৃষ্টি পড়ল সাজেদের দিকে, সাজেদকে চিন্তিত লাগছে তাই সেটা দেখে জিজ্ঞেস করল, "কী ভাবছ এত? "

সাজেদ অপ্রস্তুত হয়ে গেল তারিনের প্রশ্ন শুনে। কিছুক্ষণ সময় নিল নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য। তারিনের সামনে উল্টাপাল্টা কথা বললে হয়তো তারিন আবার অস্বাভাবিক আচরণ করা শুরু করবে। সাজেদ নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "রাতে বাসায় আসলান ছিল। সকালে ওর খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি ও নেই।"

তারিন অবাক হয়ে বলল, "ও মা কী বলো! আসলান ছিল নাকি বাসায়?"

তারিনের প্রশ্ন শুনে কথা হারিয়ে ফেলল সাজেদ, নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল তারিনের দিকে। তার ঠোঁট দুটি কাঁপছে, কিন্তু প্রতিক্রিয়া জানানোর মতো কোনো ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। তারিনের সাথে এমন খারাপ কিছু ঘটেছে যেটা তারিনকে একদম বদলে দেয়। তার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা সবগুলো সে বেমালুম ভুলে যাচ্ছে। আদৌ কি সে তারিন না অন্য কেউ? প্রশ্নটা উঁকি দিল সাজেদের মনে।

তারিন খানিক জোরেই আবার প্রশ্ন করল, "আসলান কাল রাতে এখানে থেকেছে বুঝি?"

এরকম কথা শোনার পর একসাথে শহিদ আর সাজেদ দুজনেই অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তার মানে গত কয়েকদিনে যা হয়েছে সমস্ত কিছু ভুলে গিয়েছে তারিন, কিচ্ছু মনে নেই তার, সে পড়ে আছে সেই পার্টির দিনে। এটা কেবল সাজেদ না, তার শ্বশুরও বুঝতে পারছে। তার চোখে-মুখেও একরাশ বিস্ময় আর শঙ্কা। সাজেদ আর ব্যাপারটাকে ঘোলা করল না, চুপ করে রইল।

তারিন একটু দাঁড়িয়ে থেকে আবার চলে গেল কিচেনে। সাজেদের চিন্তা আরও বেড়ে গেল। রাতে আসলান থেকেছে এক অপরিচিত মানুষের সাথে, সকালে কিছু না বলে দুজনেই গায়েব হয়ে গিয়েছে। এদিকে তারিন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না সে।

তার চোখ গেল মাহার দিকে, মাহা সাজেদের দিকে ইশারা করে বলল, তার ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে। সাজেদ বসে থেকেই হাঁক দিল, "আর কতক্ষণ?"

তারিন জবাব দিল "পরোটা হয়ে গিয়েছে। ডিম নিয়ে আসছি।"

"পরোটা দিয়ে যাও। ঘি আছে। ঘি দিয়ে খাব। তোমার মেয়ের আর তর সইছে না," সাজেদ বলল।

তারিন পরোটার ঝুড়ি এনে ডাইনিংয়ে রেখে মাহার দিকে তাকিয়ে বলল, "মাখন দেব?"

মাহা মাথা নেড়ে সম্মতি দিল। তারিন আবার চলে গেল কিচেনে। একটি কাচের বোতল নিয়ে এগিয়ে এসে ডাইনিং টেবিলের সামনে দাঁড়াল। বোতলটি হাত থেকে রাখবে ঠিক এমন সময় সেটি নিচে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল কাঁচের টুকরা। সাজেদ লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সকলে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তারিনের দিকে। কাঁচ ভাঙার শব্দটা যেন তাদেরকে জমিয়ে দিয়েছে। তারিন পাথরের মতো দাঁড়িয়ে মুখ হাঁ করে হলরুমের দিকে তাকিয়ে আছে।

"আসসালামু আলাইকুম।" হলরুম থেকে আওয়াজ আসল।

সালামের শব্দ শুনে সংবিৎ ফিরে পেল সাজেদ, ঘাড় ফেরাল হলরুমের দিকে, দেখল আসলান আর জাফর দাঁড়িয়ে আছে। সাজেদের আর জাফরের চোখাচোখি হতেই জাফর হাসল, তার শুভ্র দাঁত ভেসে উঠল, তারা এখন এদিকেই আসতে লাগল।

হঠাৎ করেই শহিদ চিৎকার দিয়ে উঠল। সাজেদ চমকে দেখল শহিদ তারিনের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তারিন কাঁচের টুকরোগুলোর উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে খিলখিল করে হাসছে। কাঁচের টুকরোগুলো তারিনের

পায়ে বিঁধে গিয়েছে, তার পা থেকে রক্ত ঝরছে, সে রক্তে ফ্লোর ভেসে যাচ্ছে। সাজেদ চেয়ার থেকে উঠেই তারিনকে জড়িয়ে ধরে এক টানে সরিয়ে ফেলল। তারিনকে জড়িয়ে ধরতেই সে বেহুঁশ হয়ে গেল, লুটিয়ে পড়ল সাজেদের উপর। সাজেদ তারিনকে জড়িয়ে ধরে বসে পড়ল। ওদিক থেকে জাফর আর আসলান ছুটে আসল।

জাফর এসেই বলল, "অবস্থা যা ভেবেছিলাম তার থেকে খারাপ। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান। ড্রেসিং করতে হবে।"

শহিদ কেঁদে উঠল, নিজের মেয়ের এমন দশায় এবার ভেঙে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমার গাড়ি বাইরে আছে।"

সাজেদ তারিনকে কোলে তুলে নিল। তারিনের পা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। মেঝের উপর প্রতিটি রক্তবিন্দু পড়ে টপটপ করে শব্দ করছে। সে শব্দ যেন পাগল করে দিচ্ছে সাজেদকে। সে বাইরে নিয়ে গেল তারিনকে, তার সামনে দিয়ে আসলান ছুটে গেল। গাড়ি লনেই দাঁড়িয়ে ছিল, আসলান এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলল। সাজেদ ভিতরে নিয়ে সিটে শোয়াল তারিনকে।

"সামনে একটি হাসপাতাল আছে। আমি সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি। চাবি দিন," শহিদের দিকে তাকিয়ে জাফর বলল।

ইতোমধ্যে শহিদ এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে। সে চাবি ছুড়ে মারল জাফরের দিকে। জাফর তা মুঠোবন্দি করে ড্রাইভিং সিটে বসল।

পাশে এসে বসে পড়ল আসলান। সাজেদ পিছনে তারিনকে ধরে রাখল। ইগনিশনে চাপ দিতেই ধোঁয়া ছেড়ে ছুটতে লাগল গাড়িটা। শহিদ পিছনে দাঁড়িয়ে থেকে চোখে এক সমুদ্র কষ্ট নিয়ে ছুটে যাওয়া গাড়িটিকে দেখতে লাগল। এত ক্ষমতাশালী মানুষ সে, অথচ নিজের মেয়েকে বাঁচাতে কিছুই করতে পারছে না। মাহা এসে শহিদের পাশে দাঁড়িয়েছে, শহিদ মাহার দিকে তাকাল, মাহাও শূন্য দৃষ্টিতে সবকিছু দেখছে।

মাহা হাসছে। খুব অদ্ভুতভাবে হাসছে, হাসিটা খুব অপার্থিব লাগছে। তার এই হাসি কেউ দেখল না। শহিদ দাঁড়িয়ে না থেকে ভিতরে এসে বসল, মাথায় চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে, সেই চিন্তা দূর করারও কোনো উপায় পাচ্ছে না সে। ভাবছে নিজের মেয়েকে দেশে রাখবে না, পাঠিয়ে দেবে অন্য দেশে। হ্যাঁ, তা-ই করবে।

****

ঝিমাতে ঝিমাতে কখন যে চোখ লেগে গিয়েছে জানে না শহিদ। ঘুম ভাঙল হঠাৎ করেই। ঘুম ভাঙার পর মাহার কথা মনে পড়ল। এসে যে শুয়ে পড়ল তারপর তো আর মাহার খবর নেওয়া হয়নি, এমনকি নিজের মেয়েরও খবর নেওয়া হয়নি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল বারোটা পনেরো বাজে। অনেক্ষণ ঘুমিয়েছে। ঘুম থেকে উঠে হাই তুলে উপরের দিকে তাকিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ল সে। মাহাকে নিয়ে খোঁজ নেওয়া যাক ওরা কোথায় আছে।

তার আগে জানতে হবে তারিন কেমন আছে, তারপর সেখানে গিয়ে মেয়ের পাশে থাকবে সে, এই পরিকল্পনা করে ফেলল শহিদ। আজ কয়েকদিন যাবৎ সমস্ত কাজ সামলাচ্ছে তার পিএস। সে সমস্ত ঝামেলা নিজের কাঁধে তুলে নিতে জানে তাই সে নিশ্চিন্তে নিজের মেয়ের এখানে থাকতে পারছে।

শহিদ জুতো পরে নিল, চশমা চোখেই ছিল, তাই আর কষ্ট করে আর চশমা খুঁজতে হলো না। তা না হলে চশমা খুঁজতে খুঁজতে তার দিন চলে যেত। তার রুম মাহার রুমের পাশে। বের হয়ে আস্তে আস্তে মাহার রুমে দেখল। এদিক-ওদিক তাক্কেই বুঝল যে মাহা নেই, তাই বের হয়ে আসল সাজেদের বেডরুমে। সেখানেও নেই। চিন্তায় পড়ে গেল শহিদ।

শহিদ ডাক দিল, "নানাভাই! নানাভাই! তুমি কোথায়?"

তার ডাক তার কানেই ফিরে এলো। মাহা কথা বলতে পারে না দেখে কী হয়েছে, ডাক শুনে ঠিকই ছুটে আসবে। এই আশায় আবার ডাক দিল শহিদ। সাজেদের রুম থেকে বের হয়ে এসে করিডোরের দুইপাশ দেখল। না, এখানেও মাহা নেই। কোথায় গেল মেয়েটা! বাইরে যায়নি তো? নানা রকম প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে তার মাথায়। শহিদ সিঁড়ির রেলিং ধরে আস্তে আস্তে নিচে নামতে লাগল। বুড়ো হয়ে গিয়েছে, চট করে কোনো কাজ করতে পারে না, আস্তে আস্তে করতে হয়, তাই রেলিং ধরে আস্তে আস্তে নামছে আর মাহাকে ডাকছে।

ডাকতে ডাকতে হলরুমে এসে সোফায় বসল সে। বসে হাঁপাতে লাগল। তার অ্যাজমার সমস্যা আছে। এখন আবার হাঁপানি শুরু হলো নাকি! বসে জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল সে।

খানিক শ্বাস নেওয়ার পর তার কানে একটি শব্দ এলো। চটচট করে শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে কেউ কিছু চেটে খাচ্ছে। কুকুর পানি চেটে খেলে যেরকম শব্দ হয় ঠিক তেমন শব্দ তার কানে আসছে। আওয়াজটা এত জোরালো না, তবে মৃদুও না যে ইগনোর করবে। কান খাড়া করল আওয়াজটা দিকে। সে খেয়াল করল আওয়াজ রান্নাঘরের দিক থেকে আসছে।

শহিদ উঠে সেদিকে পা বাড়াল। সে যত সামনে যাচ্ছে আওয়াজ তত জোরালো হচ্ছে। আওয়াজের উৎস ধরতে পেরেছে। ডাইনিং টেবিলের কাছ থেকে আসছে। আস্তে আস্তে ডাইনিংরুমে এসে উঁকি দিল। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দেখার জন্য আরও সামনে গেল। এবার ডাইনিং টেবিলের কাছে এসে উঁকি দিল আবার। এবার একটি ছায়া দেখা গেল। তারিন যেই জায়গায় পা কেটেছিল সেই জায়গায় ছায়াটি নুয়ে আছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না কী ওখানে।

শহিদ আরেকটু সামনে গিয়ে ডাক দিল, "কে?"

কোনো জবাব এলো না। ছায়াটা নিচু হয়ে কী যেন চাটছে। সেই চাটার শব্দই তার কানে এসেছে। সে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল সেদিকে। এবার স্পষ্ট দেখতে পেল ছায়াটিকে। ছায়াটা সম্পূর্ণরূপে ফুটে উঠল তার চোখের সামনে। ছায়াটা একটি মানুষের। মানুষটি আর কেউ নয়, মাহা! স্বয়ং মাহা! মাহা নিচু হয়ে তারিনের রক্তগুলো চাটছে। চেটে চেটে ফ্লোর থেকে রক্ত খাচ্ছে। মাহার জিহ্বা অনেক বড়, সাধারণ মানুষের জিহ্বা এত বড় হয় না। জিহ্বার মাথাটা সরু, সাপের জিহ্বার মতো কালো কুচকুচে লিকলিকে বীভৎস একটি জিহ্বা। ভয় পেয়ে গেল শহিদ।

সে ডাইনিং টেবিলের কাছে রাখা একটি চেয়ার শক্ত করে ধরে আস্তে করে ডাক দিল, "মাহা!"

নিজের গলা শুনে নিজেই অবাক হলো শহিদ। শব্দগুলো যেন ভিতর থেকে বের হতে চাইল না, আটকে গেল গলায়। মাহা রক্ত চাটা বন্ধ করে দিল, মাথা নুয়ে আছে এখনও, সে মাথা নিচু রেখেই দাঁড়াল। মাহার মুখ থেকে দুই ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল নিচে। টপ করে শব্দ হলো, সেই শব্দ কানে আসার সাথে সাথে শহিদ যেন ভয়ে জমে গেল। মাহা শহিদকে পিঠ দেখিয়ে রেখেছে তাই মাহার পিছনটাই দেখতে পেল।

মাহা দাঁড়ানোর পর শহিদ আবার ডাক দিল, "মাহা!"

মাহা এবার দেহ স্থির রেখে শুধুমাত্র পিছন দিকে ঘাড় ঘুরাল। এই দৃশ্য দেখে শহিদ নিজের বুকে হাত রাখল। বুকে চাপ বেড়েছে তার। ফুসফুসের উপর কী যেন বসে আছে, শ্বাস নিতে পারছে না, শ্বাস নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। সে বুঝতে পারল যে তার হাঁপানি বেড়ে গেছে। মাহার মুখটার দিকে নজর পড়ল তার। মাহার ঠোঁটের চারপাশে রক্ত লেগে আছে, চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে, কপালের মাঝখানে একটি চোখ, মুখে আর কোনো চোখ নেই। মাহা জিহ্বা বের করল, সেটি লাল হয়ে আছে। মাহা ঠোঁটের চারপাশে লেগে থাকা রক্ত চেটে খেল।

শহিদ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে বুকে হাত দিয়ে এসব দেখছে। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, ধপাস করে পড়ে গেল নিচে। তার মাথা ফ্লোরে ঠুকে গেল, ব্যথায় কোঁকিয়ে উঠল। তার সমস্ত দেহ অবশ হয়ে গেছে, মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে, শুধু চোখ দুটি কাজ করছিল ঠিকভাবে। চোখ দিয়ে সে দেখল মাহা এগিয়ে আসছে তার দিকে। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে, হেঁটে নয়, উড়ে উড়ে!

মাহার ঠোঁট বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। মাহা উড়ে এসে তার মাথার কাছে দাঁড়াল, মাহার ঠোঁট থেকে গড়িয়ে দুই ফোঁটা রক্ত শহিদের গালে এসে পড়ল, সেই রক্তের উষ্ণতা অনুভব করল গালে। মাহা দাঁড়িয়ে কী যেন বলছে। শহিদ বুঝতে পারল না। কথাগুলো বলেই একটি হাসি দিল, কী বীভৎস হাসি। মাহা আস্তে আস্তে তার দিকে ঝুঁকে আসতেই সে বিকট একটি দুর্গন্ধ পেল।

তার মনে হলো তার ভিতর থেকে সমস্ত কিছু বুঝি এবার বের হয়ে যাবে। মাহা ঝুঁকে সাপের মতো কালো লকলকে জিহ্বা বের করে শহিদের গাল থেকে রক্তের ফোঁটা চেটে নিল, তারপর দাঁড়িয়ে একটি ক্রূর হাসি দিল, তা দেখা মাত্রই জ্ঞান হারাল শহিদ।

দূর থেকে জোহরের আজানের শব্দ ভেসে আসছে। আসলান আর সাজেদ বসে আছে কম্পাউন্ডে, তারিনের জ্ঞান ফেরেনি, তাকে ড্রেসিং করে স্যালাইন দিয়েছে জাফর। বেশি দেরি হয়নি হাসপাতালে আনতে, দেরি হলেই অঘটন ঘটে যেত। রক্ত বেশি যায়নি, তবে তারিন অনেক দুর্বল হয়ে নেতিয়ে পড়েছে। খুব কষ্ট হচ্ছে সাজেদের, চোখের সামনে নিজের ভালোবাসার মানুষকে তিলে তিলে শেষ হতে দেখার মতো কষ্ট হয়তো আর নেই। প্রত্যেক সেকেন্ড যেন তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

বাড়িতে মাহা আর তার নানাকে রেখে এসেছে। কোনো খোঁজ নেওয়া হয়নি তাদের। এই প্রথমবার এতিম হওয়ার জন্য প্রচণ্ড দুঃখ হচ্ছে তার। কেউ নেই সাজেদের আগে-পিছে, কেউ একজন থাকলে এখন মাহার খবর রাখত। হাসপাতালে বসে মাহার চিন্তা করতে হতো না তাকে, সে শুধু তারিনকে নিয়েই পড়ে থাকতে পারত। মাহার নানার শরীরও ভালো যাচ্ছে না। মাহাও ছোট, অনেক ছোটাছুটি করে, কোন দিকে না কোন দিকে ছুটে যায় তার ঠিক নেই। তাদের জন্য চিন্তা হচ্ছে।

রফিককে বাসায় পাঠিয়েছে কিছুক্ষণ হলো। রফিকের সাথে রাস্তায় দেখা হলো, গলির রাস্তা থেকে বাঁক নিয়ে যখন মেইন রোডে উঠবে ঠিক তখনি দেখল মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে রফিক। সাজেদ জাফরকে গাড়ি স্লো করতে বলল, গাড়ি স্লো হতেই রফিককে ডেকে হাসপাতালের নাম বলে দিল সে। সাজেদরা আসার কিছুক্ষণ পর রফিক এসে উপস্থিত হয়েছে, এতক্ষণ রফিক তার সাথেই ছিল। রফিকের কোনো কাজ নেই, তাই সে রফিককে একটু আগে পাঠিয়ে দিয়েছে।

পাশেই বসে আছে আসলান। ছেলেটি অনেক করেছে তারিনের জন্য, ছোটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি সব করেছে, এমনকি তারিনকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের

কপালও ফাটিয়েছে। সাজেদ প্রথমদিকে আসলানকে ভেবেছিল পুলিশের ভয়ে এসে এখানে লুকিয়ে আছে, নিজের স্বার্থের জন্য পড়ে আছে, কিন্তু এখন আর তেমন ধারণা নেই। ছেলেটি মোটেও স্বার্থপর নয়। স্বার্থপর হলে এত বিচিত্র সব বিষয় দেখার পরও এ বাড়িতে থাকত না, পালিয়ে যেত, মায়া থেকেই এখানে পড়ে আছে।

মায়া তারিনের প্রতি, না মাহার প্রতি, না এই বাড়ির প্রতি তা বুঝতে পারছে না সাজেদ। কী মায়া থেকে এত কিছু করছে তা সাজেদ দূরের কথা, হয়তো আসলান নিজেও জানে না, তবে ছেলেটা যা করছে তাতে সাজেদ তার ঋণ শোধ করতে পারবে না। পায়ের আওয়াজে চিন্তা ভাঙল সাজেদের। জাফর এগিয়ে আসছে। সে নিজেকে সামলে নিল।

জাফর আসতেই সাজেদ প্রশ্ন করল, "কী অবস্থা এখন ওর?"

জাফর সাজেদের সামনের চেয়ারে বসে ঘাড় ঘুরাল তার দিকে। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না, দীর্ঘ একটা শ্বাস জাফরের অজান্তেই তার ভিতর থেকে ভেসে আসল। শঙ্কায় দুঃখ দানা বাঁধতে শুরু করল সাজেদের মনে। ইদানীং একটু চিন্তা করলেই তার হাত-পা কাঁপা শুরু করে। এখন তার দুই হাত হালকা কাঁপছে।

জাফর সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "ওর শরীরে দুর্বলতা ছাড়া কোনো রোগ আমরা পাইনি। জ্ঞান ফিরেছে। এখন বাড়ি নেয়া যাবে। এই হলো আমার ডাক্তারি বক্তব্য। এবার শুনুন আমার অন্য বক্তব্য। আপনাদের উপর সিহর করা হয়েছে। আপনাদের পরিবারের উপর মারাদাহ পড়ে আছে। সাক্ষাৎ শয়তান। আপনার স্ত্রীর হাতে কয়েকদিন আছে।"

"কয়েকদিন আছে মানে?" সাজেদ উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল।

"চলুন আমার সাথে," বলে জাফর উঠে দাঁড়াল।

হাঁটতে লাগল কেবিনের দিকে। সাজেদ পিছন পিছন রওনা দিল। বাকি থাকল না আসলানও, অনুসরণ করল দুজনকে। হাঁটতে হাঁটতে তারিনের কেবিনের সামনে আসল জাফর, থেমে সাজেদের দিকে একবার তাকাল, তারপর কেবিনে ঢুকে গেল। পিছন পিছন সাজেদ আর আসলান ঢুকল। সাজেদ ভিতরে গিয়ে দেখল তারিন জেগে আছে।

জানালার দিকে তাকিয়ে আছে সে। সাজেদ তারিনের পাশে দাঁড়াল। তারিন তার দিকে ঘুরল। কিছুক্ষণ চুপ করে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। কিছুক্ষণ পরই

তার দুচোখ বেয়ে পানি পড়তে লাগল। সাজেদ নিজের হাত দিয়ে তারিনের গালের পানি মুছতে মুছতে বলল, "আমি আছি না? কাঁদছ কেন? আমি তো আছি।"

"আমার কী হয়েছে? বলো না আমার কী হয়েছে?" তারিন কাঁদতে কাঁদতে বলল।

সাজেদ জবাব দিল না। কী উত্তর দেবে তারিনকে? সে নিজেই তো জানে না তারিনের কী হয়েছে। সে মুখ অন্যদিকে ফেরাল। সে নিজেকে আটকাতে পারল না, গাল বেয়ে পানি পড়তে লাগল।

অপর দিকে আসলান দেখল জাফর তার ব্যাগ নিচে নামাল। সেখান থেকে একটি আয়না বের করল, চারকোণা একটি আয়না, আয়নাটি পাথরের উপর বসানো। অনেক আগের আয়না, এমন আয়না আগে দেখেনি আসলান, আয়না বের করে ব্যাগ বন্ধ করে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল।

"সাজেদ সাহেব আপনি সরে দাঁড়ান," জাফর এগিয়ে এসে বলল।

সাজেদ তারিন থেকে সরে দাঁড়াল। তারিন অদ্ভুতভাবে জাফরকে দেখতে লাগল, একটু আগের নিরীহ চোখ দুটির বদলে ফুটে উঠেছে হিংস্র দুটি চোখ। বাঘিনির মতো চোখ দুটি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জাফরের দিকে।

"আসলান, জানালার পর্দা সরাও," জাফর নির্দেশ দিল।

আসলান এগিয়ে গিয়ে পর্দা সরাতেই কেবিন আলোকোজ্জ্বল হয়ে গেল।

"আসলান, তুমি জানালার মাঝ বরাবর এসে দাঁড়িয়ে থাকো," জাফর বলল।

আসলান জানালার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকল। আসলানের ছায়াটার দিকে তাকিয়ে জাফর চোখ বুজে বিড়বিড় করে কী যেন পড়ছে। পড়া শেষ করেই আয়নায় ফুঁ দিল। জাফর ঘুরে দাঁড়াল জানালার দিকে। আসলান জানালার রেলিংয়ের দিকে পিঠ ঠেকিয়ে আছে, আসলানের সম্পূর্ণ ছায়া ফ্লোরে ফুটে উঠল। জাফর ছায়ার মাথায় এসে দাঁড়াল জানালার দিকে পিঠ দিয়ে আয়নাটি নিজের মাথার উপরে ধরল যাতে আসলানের সম্পূর্ণ ছায়া আয়নায় আসে। একটু নেড়েচেড়ে ঠিক করতে লাগল।

আয়নায় পুরো ছায়া আসতেই জাফর চিৎকার করে সাজেদকে ডাক দিল, "এদিকে আসুন।"

সাজেদ ছুটে এসে জাফরের পাশে দাঁড়াল। জাফর এখনও আয়না উঁচু করে ধরে আছে। সাজেদ দাঁড়াতেই জাফর বলল, "আয়নায় দেখুন।"

সাজেদ উঁকি দিয়ে আয়নায় তাকাল। আসলানের পুরো ছায়া আয়নায় দেখতে পেল।

"আসলান তুমি তারিনকে তুলে জানালার পাশে হুইলচেয়ারে বসাও," জাফর সেভাবে দাঁড়িয়ে থেকেই বলল।

বিছানার কাছেই হুইলচেয়ার ছিল। জাফরের কথা শুনে তারিন নিজেই উঠে বসল বিছানায়, তারপর আসলান তারিনকে ধরে চেয়ারে বসাল। আসলান স্ট্যান্ড থেকে স্যালাইন খুলে হাতে নিল। দুজনেই জানালার পাশে আসতেই ফ্লোরে দুজনের ছায়া লম্বালম্বি ভাবে ফ্লোরে পড়ে থাকতে দেখল সাজেদ।

জাফর বলল, "এবার আয়নায় দেখুন।"

সাজেদ জাফরের দৃষ্টি অনুসরণ করে আয়নার দিকে তাকাল। আয়নায় আসলানের ছায়া সম্পূর্ণ দেখা গেলেও তারিনের ছায়ার শুধু পা দেখা যাচ্ছে, তা-ও সম্পূর্ণ পা নয়, গোড়ালি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। শরীরের বাকিটুকু অদৃশ্য। সাজেদ অবাক হয়ে গেল। একজন মানুষের ছায়া পড়লে তো সম্পূর্ণ ছায়া পড়বে, কিন্তু এখানে তারিনের শুধু পায়ের গোড়ালি দেখা যাচ্ছে। আর সবচেয়ে অদ্ভুত হলো তারিনের পাশে আসলানের সম্পূর্ণ ছায়াটি ফুটে উঠেছে।

"তার শরীরের মাত্র সিকিভাগ দেখা যাচ্ছে।" জাফর এতটুকু বলেই থেমে গেল। আর কিছু বলল না।

সাজেদ কী বলবে কিছুই বুঝতে পারছে না। জাফর আয়না নামিয়ে ব্যাগে ঢুকিয়ে নিল। আসলান এখনও তারিনের সাথে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, তারিন ভাবলেশহীন হয়ে জাফরের কর্মকাণ্ড দেখছে।

"আসুন আমার সাথে।" জাফর ব্যাগ কাঁধে নিয়ে বের হয়ে গেল।

সাজেদ জাফরকে অনুসরণ করে বের হয়ে গেল। আসলান তারিনকে বিছানায় এনে শুইয়ে দিল। শুয়ে চোখ বুজে ফেলল তারিন। আসলান স্ট্যান্ডে স্যালাইন লাগিয়ে দিয়ে বের হতেই দেখল সাজেদ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সাজেদের মুখোমুখি জাফর।

"কী হয়েছে?" জাফরকে উদ্দেশ করে সাজেদ প্রশ্ন করল।

জাফর বলল, "আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। আমি আজকেই চাচ্ছিলাম রুকইয়া করতে।"

"কী সময় নেই?" সাজেদ বুঝতে না পেরে জাফরকে প্রশ্ন করল।

জাফর গম্ভীর গলায় জবাব দিল "তারিনকে সিহর করা হয়ে..."

"সিহর কী?" জাফরকে থামিয়ে আসলান বলল।

জাফর বিরক্ত হলো না, বরং উৎসাহিত হয়ে বলতে লাগল, "সিহর হলো শয়তান আর সাহিরের মধ্যে চুক্তি যেখানে সাহির (জাদুকর) কুফরী করে শয়তানের সান্নিধ্য লাভের জন্য, যাতে সে তার ইচ্ছা পূরণ করতে পারে। সাহির হলো সেই মানুষ যে সিহর করে। সিহরের বাংলা প্রতিশব্দ জাদু করা, কালো জাদুও বলতে পারো, যে কালো জাদু করে সে শয়তানের সাথে চুক্তি করে। শয়তান কিছু কাজ দেয়, কাজগুলো তাকে সম্পন্ন করতে হয়।"

সাজেদ ভয় পেয়ে গেল। চেহারায় একটা যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠল।

"এখন উপায়?" কাঁপা কাঁপা গলায় বলল সাজেদ।

জাফর কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, "একটি রুকইয়া করে দেখতে হবে, কিন্তু সে অনেক দুর্বল। আমি জানি না তার শরীরের সহ্য ক্ষমতা এখন কেমন।"

"ডাক্তার আপনি যেটা ভালো মনে করেন। দয়া করে আমার স্ত্রীকে বাঁচান," সাজেদ হাতজোড় করে কাঁদতে কাঁদতে বলল।

জাফর দুই হাত দিয়ে বাধা দিয়ে বলল, "সে কী! আমি কি আল্লাহ নাকি, যে আপনার স্ত্রীকে বাঁচাব? এসব শিরকী কথাবার্তা আর বলবেন না। তওবা করুন। আমি চেষ্টা করব, দেখি কিছু করতে পারি কি না। তারিন একটু ভাল বোধ করলে আমাকে ফোন দেবেন। এই সন্ধ্যা নাগাদ দিলেই হবে।"

সাজেদ মাথা নেড়ে সায় দিতেই জাফর সালাম দিয়ে বিদায় নিল।

রফিক বাজার নিয়ে বাড়ির সামনে এসে দেখল সদর দরজা খোলা। সকালে বাজার করে সে চায়ের দোকানে চা খেতে বসেছিল। প্রত্যেকদিন বাজার থেকে ফেরার পথে গলির চা দোকানদার মনসুর মিয়ার হাত থেকে গরুর দুধের সর দিয়ে ঘন করে এক কাপ চা খায় সে, মনসুর মিয়ার সাথে গল্পগুজব করে, যদিও তার আজ চা খাওয়ার কোনো ইচ্ছা ছিল না। মনসুর মিয়াকে পাশ কাটিয়ে চলে আসছিল কিন্তু এমন সময় মনসুর মিয়া তাকে ডাক দিল। তার দোকানে বসতেই সে রফিকের খোঁজ নিল, সেখানে গল্প করল কিছুক্ষণ।

বাজার নিয়ে মেইন রোড থেকে গলিতে আসবে এমন সময় দেখল শহিদের গাড়ি ছুটে আসছে। রফিক মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকল। গাড়ি তার কাছে আসতেই দেখল তারিনকে কোলে নিয়ে আছে সাজেদ, কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সাজেদ হাঁক দিয়ে জানিয়ে দিল ক্লিনিকের কথা, তারপর গাড়িটি ছুটে চলে গেল। রফিক তড়িঘড়ি করে বাজারের ব্যাগ মনসুর মিয়াকে গছিয়ে দিয়ে সোজা একটি বেবিট্যাক্সি নিয়ে হাজির হলো ক্লিনিকে।

সেখান থেকে ফিরল এখন। রফিক থাকতে চেয়েছিল কিন্তু সাজেদ বলল চলে আসতে। সে মনসুর মিয়ার কাছ থেকে বাজারের ব্যাগ নিয়ে এখন বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাজার অনেক কিছুই করেছে, কিন্তু সে বুঝতে পারছে না এই বাজার দিয়ে এখন কী করবে। বাজারের ব্যাগটা একটু নাড়া দিয়ে গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকল রফিক।

ভিতরে ঢুকেই বাড়ির দিকে তাকাল রফিক। বাড়ি এমনভাবে খাঁ খাঁ করছে, যেন বাড়িটির উপর একটি কালো ছায়া ঘুরছে। তাই আজ হয়তো সূর্য ঢেকে গেল মেঘের আড়ালে। সে সরু রাস্তা ধরে হেঁটে সামনে এগোল, সামনে গিয়ে দেখল ঘরের সদর দরজা খোলা, বাইরে থেকে হলরুম দেখা যাচ্ছে।

অবাক হলো রফিক। দরজা কখনো খোলা থাকে না, বাড়িতে শহিদ আর মাহা আছে এটা তাকে জানিয়ে দিয়েছিল সাজেদ। শহিদের তো দরজা খোলা রাখার প্রশ্নই আসে না, সে নিজের জীবন নিয়ে বরাবরই সংশয়ে থাকে। তাকে হত্যা করার হুমকি দেওয়া হয়েছিল, তারপর থেকে সে একা ঘোরে না, কিংবা একা থাকে না। যেখানেই থাকে আগে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, আর আজ সবকিছু খোলা রেখে দিয়েছে। মেয়ের চিন্তায় হয়তো আজ ভুলে গিয়েছে সে।

খোলা দরজা দিয়েই প্রবেশ করল রফিক। ঢুকতেই কেমন যেন অদ্ভুত অনুভূতি হলো তার। অশুভ, অসংজ্ঞায়িত একটি অনুভূতি। যে অনুভূতি ভয়, আশঙ্কা আর ক্ষোভ মিশ্রিত। যে অনুভূতি পেলে মানুষের লোম দাঁড়িয়ে যায়, শিরদাঁড়া জমে যায়, ভয়ে আর উত্তেজনায় কাঁপুনি হয়, সেই অনুভূতি রফিক পাচ্ছে।

রফিক পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তার মন বলল সামনে এগিয়ে না যাওয়াই ভালো, যেভাবে এসেছে সেভাবে বের হয়ে যেতে, কিন্তু মাহা আছে। শহিদ না হয় নিজের খেয়াল রাখতে পারবে, কিন্তু ছোট মাহার পক্ষে তো আর সম্ভব নয়, তাছাড়া বৃদ্ধ শহিদ কতক্ষণ আর নাতনির পিছনে ছুটতে পারবে। এসব কথা ভেবে নিজের মনের বিরুদ্ধেই বাজারের ব্যাগ নিয়ে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ায় রফিক।

হলরুমে আসার পর রফিক বুঝতে পারল সবকিছু কেমন নীরব হয়ে আছে। চারদিকে পিনপতন নীরবতা। দরজা দিয়ে শোঁ শোঁ করে আসা মৃদু বাতাসের শব্দটাও যেন কয়েকগুণ বেড়ে রফিকের কানে আসছে। কানের লতি ঠান্ডা করে দিয়ে সে বাতাস আবার মিলিয়ে যেতে লাগল। বাড়ি কোনোদিন এতটা নীরব থাকেনি। শেষরাতে যখন সবাই গভীর ঘুমে মগ্ন ঠিক তখনও বাড়িটিকে এত নির্জন আর নীরব মনে হয়নি রফিকের।

আজ কী এমন নীরবতা যে রফিকের গা ছমছম করছে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বারবার নির্দেশ করছে আর সামনে না এগোতে, কিন্তু সে নিজের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কে গ্রাহ্য করল না, বাজারের ব্যাগ টেনে টেনে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে। নিজের পায়ের শব্দ তার কানে আসতে লাগল, নিজের পায়ের শব্দকে সহ্য করতে পারল না সে। নিজের গতি কমিয়ে নীরবে পা ফেলে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে।

সাজেদ বলে দিয়েছে সব সামলাতে, মাহা আর শহিদের খেয়াল রাখতে, দুপুরে দুজনের খাবারের ব্যবস্থা করতে। সে কাজের অংশ হিসেবে রফিক আসার সময় পাশের বিরিয়ানির দোকান থেকে দুই প্যাকেট বিরিয়ানি নিয়ে এসেছে। সে

জানে না শহিদ বিরিয়ানি খাবে কি না, যদি না খায় তাহলে শহিদের জন্য ভাতের হোটেল থেকে খাবার আনতে হবে, তবে সে জানে শহিদ কিছু ব্যবস্থা করে ফেলবে। এত বড় মন্ত্রী হয়ে এক বেলা খাবারের ব্যবস্থা করতে পারবে না, তা হয় না।

সে দিকে অবশ্য রফিকের কোনো খেয়াল নেই। মাহা খেলেই যথেষ্ট। মাহা বিরিয়ানি খুব পছন্দ করে। সে ব্যাগ নিয়ে ডাইনিং টেবিলের সামনে এসে সেটি নিচে রাখল, তারপর ব্যাগ থেকে দুই প্যাকেট বিরিয়ানি বের করে ডাইনিং টেবিলের উপর রাখল।

বাজার ভর্তি ব্যাগটি নিয়ে রান্নাঘরের দিকে হাঁটছে সে। সোনাকান্দার হুজুর মারা গিয়েছে, রফিক এলাকায় গিয়ে সবার মুখোমুখি কী করে হবে তাই ভাবছে। চোখের সামনে একজন মানুষ মরে গেল কোনো কারণ ছাড়া। আসার পথে তার সাথে হুজুরের তেমন কোনো কথা হয়নি, হুজুর সমস্ত রাস্তায় চুপ থেকে তসবিহ জপছিলেন। এমন একজন মানুষের হুট করে মৃত্যু হয়ে গেল, তা মানতে পারছে না সে। এসব ভাবতে ভাবতে সে হাঁটছিল, খেয়াল নেই কোনদিকে হাঁটছে, অন্যমনস্ক হয়ে আছে সে। ডাইনিং টেবিল পার হতে গিয়ে কীসে যেন পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

বাজারের ব্যাগ উড়ে গিয়ে অনেক দূরে পড়ল। ব্যাগ থেকে সবজিগুলো বের হয়ে আসল। কয়েকটা আলু গড়িয়ে রফিকের সামনে আসল, আছাড় খেয়ে আলুকেও পাহাড়সম বড় লাগছে। রফিক উপুড় হয়ে সামনে পড়ে থাকা আলুর দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। পড়ে যাওয়ার কয়েক সেকেন্ড পর সে বুঝতে পারে প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে ডান হাতের কনুইয়ে, কোমরও নড়ে উঠেছে।

রফিক উঠে দাঁড়াল। দাঁড়ানোর পর বুঝল হাঁটুতেও ব্যথা পেয়েছে, টনটন করছে হাঁটু। হাঁটুতে একটু মালিশ করে নিল। কনুইয়ের দিকে তাকিয়ে দেখে কনুই কালো হয়ে আছে, রক্ত জমে গিয়েছে, সম্ভবত কনুইও থেতলে গিয়েছে। নিজের সমস্ত শরীরটাকে ঝেড়ে নিল রফিক।

রফিক পিছন ফিরে তাকাল, কীসে লেগে পড়েছে দেখার জন্য তা। পিছন ফিরতেই দেখে ডাইনিং টেবিলের পাশে পড়ে আছে শহিদের নিথর দেহ। ভাঙা কাঁচ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে শহিদের শরীরের চারদিকে। সে কিছুক্ষণের জন্য জমে গেল, কিন্তু তার স্থবিরতা কাটতেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল শহিদের কাছে।

শহিদের কাছে গিয়ে তার মাথা নিজের কোলের উপর তুলে বলল, "চাচা! চাচা! কী হয়েছে আপনার?"

শহিদ কোনো জবাব দিতে পারছে না। শহিদের মুখে শুকনো লালা লেগে আছে। শহিদ নিজের চোখ দিয়ে দেখছে রফিককে, চোখের পাতা ফেলছে কিন্তু কিছু বলতে পারছে না। রফিকের মনে হলো শহিদ কিছু বোঝাতে চাচ্ছে, কিন্তু সেটা এখন বোঝার সময় নেই, তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে নিতে হবে, এটা না করতে পারলে বড় দুর্ঘটনা ঘটে যাবে।

রফিকের মাথায় চট করে এলো তার নোটবুকের কথা। নোটবুকে সে কিছু হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্সের নাম্বার টুকে রেখেছিল। সে ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছিল, বাংলা পড়তে ও লিখতে জানে। ঢাকায় আসার পর টেলিফোন ধরতে ধরতে টেলিফোনের সবকিছু রপ্ত করে ফেলেছে। সে শহিদকে বসানোর চেষ্টা করল কিন্তু শহিদের সেরকম কোনো শক্তি নেই, সে পড়ে যাচ্ছে।

শহিদকে ফ্লোরে শুইয়ে দিয়ে রফিক এক দৌড়ে নিজের রুমে গিয়ে নোটবুকটা খুঁজছে। দড়িতে ঝুলানো শার্টগুলো থেকে শুরু করে বিছানার নিচে পর্যন্ত খুঁজল, কোথাও পেল না। অস্থির হয়ে গেছে সে। হঠাৎ করেই তার মাথায় আসল নিজের পকেটেই তো নোটবুক নিয়ে বের হয় সে। কোথাও বের হলে নোটবুক নিতে ভুলে না, নিজের পরনের শার্ট দুদিন আগের, তার মানে সেদিন নোয়াখালী যাওয়ার সময় এই শার্টে নোটবুকটি নিয়ে বের হয়েছিল রফিক।

রফিক নিজের শার্টের পকেটে হাত দিয়ে টেনে বের করে কালো রঙের কভারের নোটবুকটি। সেটি হাতে নিয়ে বের হয়ে এলো। শহিদকে পার হয়ে চলে গেল হলরুমে। হলরুমে টেলিফোন রাখা। সে টেলিফোনের সামনে গিয়ে নোটবুক খুলে এক এক করে পাতা উলটাতে লাগল, অনেকক্ষণ পাতা উলটানোর পর একটি অ্যাম্বুলেন্সের নাম্বার পেল। ডায়াল করেই অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিয়ে ফোন রেখে ছুটে গেল শহিদের কাছে।

এবার শহিদকে কোলে তোলার চেষ্টা করল, রফিকের শক্তিতে কুলাল না, অনেক ভারী শহিদ। দেখতে শুকনো হলেও শহিদের ওজন অনেক। রফিক কোলে তুলতে গিয়ে সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারল। কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। তার চোখ পড়ল ডাইনিংয়ে রাখা বিরিয়ানির প্যাকেটের দিকে। বিরিয়ানির প্যাকেটের দিকে তাকাতেই মনে পড়ল মাহার কথা। শহিদ যদি এখানে থাকে তাহলে মাহা কোথায়? মাহাকে কে দেখাশোনা করছে? মাহার কী হয়েছে?

রফিকের পেট মোচড় দিয়ে উঠল। শহিদকে আবার ফ্লোরে রেখে দৌড় দিল দোতলার দিকে। ধপধপ করে পা ফেলে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল, একটু উঠার পর হাঁপিয়ে গেল, এবার দৌড় থামিয়ে হেঁটে উপরে উঠতে লাগল। সিঁড়ি বেয়ে সাজেদের রুমের সামনে এসে দেখে তার রুমের লাইট জ্বলছে। তার মানে মাহা এই রুমে। রফিক দরজায় দাঁড়িয়ে 'মাহা' বলে ডাক দিল।

কোনো সাড়াশব্দ নেই, তাই রফিক ভিতরে উঁকি দিল, কিন্তু মাহা নেই। সাজেদের বেডরুম খালি, তাহলে মাহা মাহার রুমে। মাহার রুমের সামনে গিয়ে দেখল বরাবরের মতো দরজা হালকা ফাঁক করা।

রফিক দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকেই দেখল মাহা ঘুমিয়ে আছে। রফিক হাঁপ ছেড়ে আস্তে আস্তে পা ফেলে বিছানার কাছে চলে আসল। মাহাকে ঘুম থেকে তুলতে হবে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই অ্যাম্বুলেন্স এসে পড়বে, তার আগেই মাহাকে তুলে নিচে নিয়ে যেতে হবে। মাহাকে এই নির্জন বাড়িতে একা রেখে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না।

রফিক মাহার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার বাহু ধরে ডাক দিল, "মাহা!"

ডাক দিয়ে কয়েকবার ধাক্কা দেওয়ার পর মাহা উঠল, উঠেই চোখ কচলাতে লাগল। রফিক মাহাকে বলল, "আমাদের যাওয়া লাগবে। এসো।"

মাহা ধাতস্থ হয়ে রফিককে জিজ্ঞেস করল তারিনের কথা। প্রশ্ন করে ঘুমঘুম চোখে তাকিয়ে থাকল রফিকের দিকে।

রফিক জবাব দিল, "তোমার মা ঠিক আছে। এসো, মায়ের কাছে নিয়ে যাব।"

মাহা বিছানা থেকে নামল, রফিক মাহার হাত ধরে বাইরে এসে করিডোরে দাঁড়াল, এমন সময় অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনের শব্দ শুনতে পেল। সে মাহাকে কোলে তুলে তাড়াহুড়ো করে পা ফেলে নিচে নামল। নিচে নেমেই মাহাকে নামিয়ে চলে গেল বাইরে। বাইরে এসে দেখল গেটের সামনে অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়ানো, তাই অ্যাম্বুলেন্স উদ্দেশ্য করে দৌড় দিল রফিক।

অ্যাম্বুলেন্সের সামনে আসতেই ড্রাইভার রফিককে বলল, "রোগী কোথায়?"

"আপনার লোক কোথায়? তাদেরকে বলুন আমার সাথে আসতে।" রফিক জবাব দিল।

রফিকের কথা শুনে ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে গেল। নেমে গিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের পিছনে এসে ধাক্কা দিল দরজায়। দরজা খুলে দুজন নেমে আসল।

ড্রাইভার এবার রফিকের দিকে ফিরে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "এদের নিয়ে যান।"

রফিক ড্রাইভারের মেজাজ গরম করল না। এখন ড্রাইভারের বেয়াদবির জন্য রাগ দেখানোর সময় না। আগে আগে হাঁটতে লাগল আর লোকগুলো তার পিছন পিছন। বাড়ির ভিতর ঢুকে রফিক মাহাকে কোলে নিল। লোকগুলো তার পিছনে এসে জড়ো হলো।

রফিক আঙুল দিয়ে ডাইনিং টেবিলের দিকে ইশারা করে লোকগুলোকে বলল, "ওই টেবিলের পাশে দেখুন রোগী পড়ে আছে।"

লোকগুলো স্ট্রেচার নিয়ে চলে গেল। শহিদকে নিয়ে বের হলো একটু পর। রফিকও পিছন পিছন যেতে লাগল। মাহা তার কোলে থেকে সবকিছু অবাক দৃষ্টিতে দেখছে। লোকগুলো শহিদকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের সামনে এসে দাঁড়াল। ড্রাইভার অ্যাম্বুলেন্সে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সে শহিদকে একনজর দেখে লোক দুটোকে চোখ দিয়ে ইশারা করল। শহিদকে ঢুকানো হলো অ্যাম্বুলেন্সে। লোকগুলোও অ্যাম্বুলেন্সের ভিতর ঢুকতেই ড্রাইভার দরজা লাগিয়ে দিল।

অ্যাম্বুলেন্সের দরজা লাগানোর পর ড্রাইভার রফিককে জিজ্ঞেস করল, "কোন হাসপাতালে নেবেন? "

"আপনি চালাতে শুরু করুন, আমি রাস্তা দেখাচ্ছি," রফিক বলল।

ড্রাইভার গাড়িতে চড়ে স্টিয়ারিং হুইল ধরল। রফিক মাহাকে নিয়ে ড্রাইভারের পাশে বসল। ড্রাইভার অ্যাম্বুলেন্স ছেড়ে দিল।

মাহাকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার নানাভাইয়ের কী হয়েছে?"

মাহা ইশারা করে জবাব দিল সে ঘুমিয়ে ছিল। কিছু জানে না। সে আর কিছু জিজ্ঞেস করল না মাহাকে। মেয়েটিকে চিন্তায় ফেলার কোনো মানে হয় না। অ্যাম্বুলেন্স দ্রুত ছুটে চলল হাসপাতালের দিকে।

মাহাকে নিয়ে প্রবেশ করল সাজেদ, পায়ের আওয়াজে মাথা তুলে তাকাল আসলান। সাজেদকে অনেক বিধ্বস্ত আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে, চোখ দুটি অসার হয়ে আছে। চোখের নিচে কালো দাগ পড়ে গিয়েছে, মুখ কালো হয়ে আছে, অনেক শুকিয়েছে সে। এক রাতের মধ্যে সাজেদের এমন পরিবর্তন দেখে সত্যিই বিস্মিত হলো সে।

সাজেদ আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকেই আসলানকে জিজ্ঞেস করল, "এখন ওর কী অবস্থা?"

"ঘুমাচ্ছে," আসলান জবাব দিল।

মাহা তার বাবার হাত ছেড়ে ছুটে গেল তারিনের কাছে, মাথার কাছে দাঁড়িয়ে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন সে তার মাকে অনেকদিন পর দেখেছে। আসলানের চোখ দুটি তারিনের দিকে পড়তেই তার ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ভেসে আসল। এটুকু একটা মেয়ে নিজের মায়ের কাছে থাকতে পারছে না, তার মা-ও নিরুপায়, সে-ও যেন দুনিয়া এক করেও তার মেয়ের ভালোর জন্য তার সাথে থাকতে পারছে না।

আসলান সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সাজেদকে বলল, "কোথায় ছিলেন আপনি?"

সাজেদ ছোট করে একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জবাব দিল, "হাসপাতালেই ছিলাম।"

আসলানের মেজাজ গরম হয়ে ছিল। সেই সন্ধ্যায় তারিনের কেবিনে এসে দেখে সাজেদ নেই। পুরো হাসপাতাল তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। কোথাও পায়নি। এখন রাত নয়টা পার হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যা বললে ভুল হবে। রাত হয়ে গিয়েছে।

ইশা পড়ে এসেছে আধাঘণ্টার বেশি হবে। সাজেদের জন্য সে অপেক্ষা করেছে মাগরিব থেকে। মাগরিবের নামাজ পড়ে এসে জাফরকে ফোন দিয়েছিল। জাফর বলেছে সাজেদ এলেই তাকে খবর দিতে।

আসলান একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "আপনি কোন হাসপাতালে ছিলেন?"

সাজেদ এসে আসলানের পাশে বসল। তারপর উপরের দিকে তাকিয়ে বলল, "ঢাকা মেডিকেলে।"

আসলান অবাক হলো। তার স্ত্রী এখানে আর সে ঢাকা মেডিকেলে কী করে?

"ঢাকা মেডিকেলে কেন? " আসলান প্রশ্ন করল।

সাজেদ আসলানের দিকে তাকিয়ে বলল, "তারিনের বাবা আইসিইউতে।"

চমকে উঠল আসলান। দাঁড়িয়ে পড়ল। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে হাঁ করে থাকল। তাকে তো সকালেই সুস্থ দেখেছে। আজকের মধ্যে আবার কী হয়ে গেল যে আইসিইউতে ভর্তি করাতে হলো? মুখ হাঁ করে আসলান সাজেদের দিকে তাকিয়ে থাকল। কিছুক্ষণ পর সংবিৎ ফিরে পেল।

তারপর সাজেদকে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে তার?"

****

সাজেদ সন্ধ্যায় এসে দেখে তারিনের কেবিনের সামনে মাহাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রফিক। রফিককে অনেক বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। তার মুখটা অনেক কালো হয়ে ছিল। তাকে দেখে সাজেদের মন বলতে লাগল নিশ্চয়ই কোনো বিপদ ঘটেছে। তা না হলে সে এভাবে মাহাকে নিয়ে ছুটে আসত না। তবুও সাজেদ জোর করে নিজের মন থেকে আশঙ্কাটা দূর করল। উল্টো সাজেদ ভাবল হয়তো রফিক মাহাকে নিয়ে তারিনকে দেখতে এসেছে। সেদিকে আর বেশিক্ষণ নিজের চিন্তাশক্তি ব্যয় করেনি সাজেদ।

মনোযোগ দিল নিজের মেয়ের দিকে। তারিনের জন্য মাহার খোঁজখবর নেওয়া হয় না কয়দিন ধরে। মাহা কী খায়, কখন ঘুমায় কিছুই জানা হয়নি সাজেদের। সে কষ্ট করে মুখে হাসি ফুটিয়ে মাহার দিকে গেল।

মাহার কাছে আসতেই রফিক বলল, "তারিনের আব্বা হাসপাতালে!"

কথাটা শোনার পর সাজেদের মনে হলো তার মাথায় বজ্রপাত হয়েছে। সে অস্ফুট স্বরে বলল, "কী?"

"হ্যাঁ, এই হাসপাতালেই। এসো আমার সাথে," রফিক বলল।

সাজেদ রোবটের মতো রফিকের পিছন পিছন হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের সামনে এসে দাঁড়াল রফিক। সাজেদও এসে তার পিছনে থামল। রফিক কিছু না বলে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের ভিতরে তাকিয়ে থাকল। সাজেদ দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখল ভিতরে শহিদ শুয়ে আছে। পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকল সে। হঠাৎ ডাক্তার ছুটে এসে বলল, ভালো কোনো হাসপাতালে নিয়ে যেতে।

সাজেদ সংবিৎ ফিরে পেয়ে সাথে সাথে শহিদকে নিয়ে গেল ঢাকা মেডিকেলে। সেখানেই আপাতত আছে। শহিদের অসুস্থ হওয়ার খবর মুহূর্তের মধ্যে জানাজানি হয়ে যায়। লোকজন এসে জড়ো হয় হাসপাতালে। কয়েকজন মন্ত্রীও আসে। কাল অথবা পরশু শহিদকে ভারতে নিয়ে যাবে। আপাতত তারিনের ঝামেলা থেকে মুক্তি পাক।

"ডাক্তার বলছে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে," সাজেদ আসলানের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল।

আসলান কিছু বলল না। বসে পড়ল সাজেদের পাশে। আসলানের ইচ্ছে হলো সাজেদের কাঁধে ধরে একটু সহানুভূতি জানাতে। কিন্তু পারল না। সে অকপটে কিছু করতে পারে না। লোকটির উপর দিয়ে কী যাচ্ছে একমাত্র সে-ই বলতে পারবে। যদি জাফরের কথা সত্যি হয় তাহলে কালো জাদু করেছে কেউ এই পরিবারটির উপরে। কেউ যদি করে তাহলে কে করেছে? কেন করেছে? কীভাবে করেছে? এসব প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে আসলানের মাথায়।

"জাফর সাহেব কোথায়?" সাজেদের প্রশ্নে তার ধ্যান ভাঙল।

"তিনি বলেছেন আপনি এলে তাঁকে ফোন দিতে।"

আসলান জবাব দেওয়ার পর বুঝল তার গলাটা কেঁপে উঠেছে।

"যাও। তাঁকে বলো তিনি যা করার তা করতে পারেন।" সাজেদ ঠান্ডা গলায় বলল।

আসলান উঠে বের হয়ে গেল। নিচে হাসপাতালের পাশে মুদি দোকানের সামনে একটি ফোন বুথ দেখেছিল। ওই বুথ থেকে জাফরকে কল করে নিবে।

সাজেদ মাহার দিকে তাকিয়ে ডাক দিল, "মাহা!"

মাহা তার মায়ের মাথার কাছেই ছিল। ডাক শুনে সাজেদের কাছে দৌড়ে আসল। মেয়েটার দিকেও ঠিকমতো তাকাতে পারছে না। মাহার চোখে তো চোখ রাখতে পারছেই না। এত অপরাধ করা লোক হয়েও তার স্ত্রীকে রক্ষা করতে না পারার অপরাধে সে আজ তার মেয়ের চোখে চোখ রাখতে পারছে না। চক্ষুলজ্জা কাজ করছে। মাহা এগিয়ে আসতেই দুই হাত দিয়ে মুখ মুছল।

সাজেদ মাহাকে কোলে তুলে নিয়ে বলল, "তোমার নানাভাইয়ের কী হয়েছিল?"

মাহা সাজেদের প্রশ্ন শোনার পর হেসে দিল। হিহি করে হাসতে লাগল। সাজেদ কিছুই বুঝতে পারল না। মাহা হাসছে কেন?

সাজেদ মুখ শক্ত করে বলল, "হাসছ কেন?"

মাহা হাসি থামিয়ে দিল। মুখ কালো করে ফেলল।

সাজেদ আবার বলল, "তোমার নানাভাইয়ের কী হয়েছিল?"

মাহা ইশারা করে বলল সে জানে না।

সাজেদ আবার বলল, "আমরা যাওয়ার পর কেউ বাসায় এসেছিল?"

মাহা মাথা নেড়ে না বলল। সাজেদ এবার তারিনের দিকে তাকাল। দুপুরে জাফর যা দেখিয়েছে তার কথা ভেবে সাজেদের মন হু হু করে উঠল।

****

আসলান টেলিফোন হাতে ধরে আছে। পকেটে কয়েকটি খুচরো পয়সা ছিল। হাত দিয়ে সেগুলো বের করে নিল। বুথের মধ্যে একটি কয়েন ফেলে ডায়াল করল।

টেলিফোনের ওপাশ থেকে আওয়াজ এলো, "হ্যালো!"

"আমি আসলান বলছি। জাফর স্যার আছেন?"

"অপেক্ষা করো। আর সালাম দাও না কেন?"

বুঝতে পারল নাসির সাহেব ধরেছেন। আসলান সুন্দর করে সালাম দিল। নাসির সাহেব শুধু জবাব দিলেন। ওপাশ কিছুক্ষণ চুপ রইল।

তারপর আবার আওয়াজ আসল, "সাজেদ এসেছে?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা আমি আসছি," এই বলে জাফর ফোন কেটে দিল।

আসলান ফোন রেখে দিল। তার মন খারাপ হয়ে গেল। কেন হলো সে বুঝতে পারল না বরং পনেরো বছরের কিশোরীদের মতো হঠাৎ করেই মন খারাপ হয়ে গেল। অন্ধকার হয়ে আছে চারপাশ। ফোন বুথ থেকে অন্ধকারের মধ্যে হেঁটে গেল সামনের মুদি দোকানটির দিকে। একটি সিগারেট খেতে হবে। আজ সারাদিন সিগারেট ধরানো হয়নি। এখন একটি ধরিয়ে কিছুক্ষণ ফুঁকা যাবে।

আস্তে আস্তে পা ফেলে মুদি দোকানের সামনে গেল। মুদি দোকানের মধ্যে মিটমিট করে একটি কুপি জ্বলছে। দোকানদার একজন মধ্যবয়সি লোক। আসন করে বসে সুপারি কাটছে।

"একটি সিগারেট দিন তো," আসলান বলল।

আসলানের কথা শুনে মুদি দোকানদার মাথা তুলে তাকাল। তারপর নিজের সুপারি আর জাঁতি তুলে একটি ঝুড়িতে রেখে জিজ্ঞেস করল, "কোনটা?"

"ক্যাপস্ট্যান," আসলান জবাব দিল।

মুদি দোকানদার সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটি সিগারেট বের করে আসলানের হাতে দিল। আসলান বাম হাতে সিগারেট নিয়ে ডান হাত পকেটে দিল ম্যাচ বক্স বের করার জন্য। ম্যাচ বক্স কোথাও খুঁজে পেল না।

"দিয়াশলাই আছে?" আসলান মুদি দোকানদারের দিকে তাকিয়ে বলল।

মুদি দোকানদার দিয়াশলাই এগিয়ে দিল আসলানের দিকে। সে সিগারেট ঠোঁটে লাগিয়ে দিয়াশলাই ধরাল।

সিগারেট ঠিক এমন সময় আসলান তার কানের কাছে শুনল, "সিগারেট ফেলে দে।"

আসলান চমকে উঠল। হাত থেকে দিয়াশলাই নিচে পড়ল। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকল আসলান।

"কী হয়েছে মিয়া?" দোকানদারের গলা শুনে আসলান আবার স্বাভাবিক হলো।

"কিছু না," বলে আসলান ঝুঁকে দিয়াশলাই তুলতে গেল।

দিয়াশলাই কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। দিয়াশলাই কোথায় গেল? এখানেই তো থাকার কথা। আবছা আলোয় মাটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে অথচ মাটির উপর দিয়াশলাইটি দেখা যাচ্ছে না। অনেকক্ষণ খুঁজল। কোথাও পেল না। সিগারেট এখনও ঠোঁটের কোণায়। আসলান সিগারেটটি মুখ থেকে হাতে নিল। তারপর ছুড়ে ফেলে দিল রাস্তায়।

দোকানদারের দিকে তাকিয়ে বলল, "কত হয়েছে দিয়াশলাই সহ?"

দোকানদার বলল, "দুই টাকা।"

আসলান মানিব্যাগ বের করে দোকানদারকে টাকা দিয়ে হাসপাতালের দিকে হাঁটা শুরু করল। কী ঘটল তা সে আর বুঝতে চায় না। কিছু ব্যাপার না বোঝাই ভালো। থাকুক ব্যাখ্যাহীন। একটু হাঁটার পর তার নাকে একটি সুগন্ধ আসল। এই সুগন্ধ সে আর পায়নি কখনো। কড়া গন্ধ। মনে হলো তার খুব কাছ থেকে

আসছে। সে হাঁটা থামাল। হাসপাতালের মেইন গেটে লাগানো বৈদ্যুতিক লাইটের আলোয় অনেকটা আলোকিত এই জায়গা।

আসলান চারপাশে চোখ ঘুরাল। কোথাও কেউ নেই। রাস্তা একদম ফাঁকা। তার গা ছমছম করতে লাগল। গন্ধ এখনও তীব্র। পাশ দিয়ে যদি কেউ সুগন্ধি মেখে পার হয়ে যেত তাহলে গন্ধ চলে যেত। কিন্তু সে এখনও সেরকমই গন্ধ পাচ্ছে, যেরকম গন্ধ প্রথমবার পেয়েছিল। ভয় পেয়ে আর লাভ নেই। ভয় পেতে পেতে এখন ভয় পাওয়ার অনুভূতি চলে গিয়েছে তার। মুখে একটি হাসি ঝুলিয়ে সে হাসপাতালের দিকে রওনা দিল।
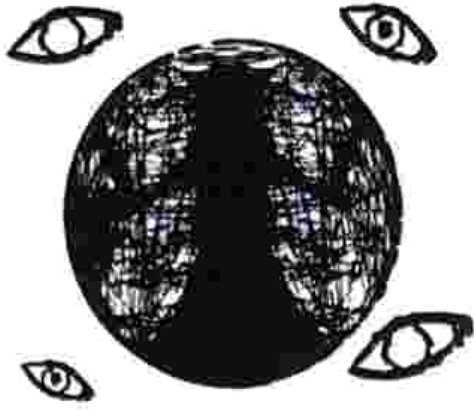
কেবিন থেকে বিছানা ব্যতীত সবকিছু সরিয়ে নেয়া হলো। তারিন এখনও ঘুমিয়ে আছে, কেউ জাগায়নি তাকে, জাফর নিজেই তারিনকে জাগাতে বারণ করেছে। ফোন পাওয়ার আধঘন্টার মধ্যেই জাফর এসে হাজির, চা খেয়ে তিনজন কেবিনে এসেছে। মাহাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে তারিনের খালার কাছে। তারিনের নিকটাত্মীয় যদি কেউ থাকে তাহলে তিনিই আছেন। তারিনের ব্যাপারে সাজেদ কিছু শোনায়নি তাঁকে, কিন্তু আজ বাধ্য হয়ে তাঁকে টেলিফোন করেছে। তিনি বেশি দেরি করেননি, রান্নাবান্না করে অল্প সময়ের মধ্যে এসে হাজির। তাঁর সাথে আরও অনেকেই দেখতে এসেছে তারিনকে।

তারিনের সবচেয়ে কাছের মানুষ হলেন তার ছোট খালা। তাঁর কাছে মাহাকে দিয়ে দিয়েছে সাজেদ। ভদ্রমহিলা এসেই কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। সাজেদ অনেক কষ্ট করে তাঁকে সামাল দিয়েছে। রাত প্রায় নয়টার দিকে তিনি মাহাকে নিয়ে গুলশানে নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

তিনি জেদ ধরেছিলেন হাসপাতালের থাকার জন্য, বোন জামাইয়ের অসুস্থ হওয়ার কথা শুনে তিনি মোটেই বিচলিত হননি, কিন্তু তারিনের বেলায় একদম উল্টো চিত্র। তিনি কোনোমতেই যেতে চাচ্ছিলেন না। সাজেদ তাঁকে জোর করে পাঠিয়েছে। আসার সময় তিনি অনেক খাবার রেঁধে নিয়ে এসেছিলেন, আসলান সেখান থেকেই রাতের খাবার খেয়ে নিয়েছে, জাফরকে অনেক সাধার পরও সে কিছু খায়নি।

জাফরের হাতে ছোট একটি ব্যাগ, ব্যাগটিকে নিজের কাছেই রাখছে সে, তাই ব্যাগের মধ্যে কী আছে তা দেখার অনেক কৌতূহল আসলানের। চামড়ার একটি ছোট কালো ব্যাগ, ব্যাগের উপরের চামড়া খসখসে, কিছু জায়গায় মোচড়ানো; তা দেখে আন্দাজ করা যায় ব্যাগটি অনেক পুরানো। সেই ব্যাগের

সাথে কাঁধে ঝুলানোর জন্য সাদা একটি বেল্ট লাগানো, জাফর সেই বেল্ট পেঁচিয়ে ধরে আছে।

জাফর ব্যাগ নিয়ে বসে আছে। সাজেদ হাসপাতাল থেকে স্টাফ আনার জন্য বাইরে গিয়েছে। দুজন লোক দরকার। জাফর সাজেদকে দুজন লোক আনতে বলেছে, প্রয়োজন হবে, এটাও বলে দিয়েছে কাদের আনতে হবে। সাজেদ তৎক্ষণাৎ বের হয়ে গিয়েছে। সে গিয়েছে অনেকক্ষণ হলো। তার ফেরার কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে না আসলান। অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে, ধৈর্য একদম যায় যায় অবস্থা, তার এখন বেশ বিরক্ত লাগছে।

আসলান চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থেকে ঝিমাচ্ছে। দাঁড়িয়ে ঝিমানোর কাজটি আপাতদৃষ্টিতে যত কঠিন দেখা যায় আসলে তত কঠিন নয়। সে এটি রপ্ত করেছে হলের ছাদে গিয়ে, পুলিশের দৌড়ানি খেয়ে অনেকদিন ঘুমানোর মতো জায়গা পেত না, তাই সে সময় দাঁড়িয়ে ঝিমাত। একটু পর সে চোখ খুলে দেখল জাফর মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

আসলান জাফরের দিকে তাকিয়ে গলা খাঁকারি দিল। উদ্দেশ্য ছিল জাফরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, উদ্দেশ্য সফল হলো, জাফর চোখ মেলে আসলানের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী?"

আসলান নিচু স্বরে বলল "একটা ব্যাপার জানার ছিল।"

জাফর আবার চোখ বুজল। তারপর বলল, "কী?"

"কালো জাদু কীভাবে করে?" আসলান ভয়ে ভয়ে বলল।

জাফর খোঁচা দিয়ে বলল, "কেন, শিখতে চাও নাকি?"

জাফরের প্রশ্নে কাঁচুমাচু হয়ে আসলান বলল, "নাহ, শুধুমাত্র কৌতূহল নিবারণের জন্য।"

এমন সময় সাজেদ দুজন লোককে নিয়ে প্রবেশ করল। দুজনের বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। একজন সাদা শার্ট আর কালো প্যান্ট পরে আছে, তার ঠোঁটের উপর আবার কালো গোফ, কপাল বেয়ে সরিষার তেল পড়ছে, গায়ের রং এই তেলের মতোই কালো। আরেকজন বেশ স্বাস্থ্যবান, শ্যামবর্ণ, ক্লিন শেভড, পরনে সিল্কের শার্ট আর সাদা লুঙ্গি। দেখে মনে হচ্ছে সদরঘাটের আশেপাশের লোক।

তাদেরকে আসতে দেখে জাফর হেসে বলল, "এখন না, পরে বলব ইনশাআল্লাহ। সাজেদকে বলো তারিনকে ঘুম থেকে জাগাতে।"

সাজেদ আসলানের পাশেই ছিল, জাফরের কথা শুনে তারিনের কাছে চলে গিয়ে তারিনের বাহু ধরে ধাক্কা দিয়ে বলল, "তারিন! তারিন!"

তারিন সাড়া দিল। চোখ মেলে সাজেদের দিকে তাকিয়েছে। তারিনের ঘুম ভেঙেছে। অনেক দুর্বল দেখাচ্ছে তারিনকে। তার ঠোঁট নড়ে উঠল। সাজেদ এগিয়ে গিয়ে তারিনের বিছানার কাছে দাঁড়াতেই তারিন উঠে বসল। সে তারিনের কাঁধে ধরল, যাতে তারিন হেলে পড়ে না যায়। তারিন নিজের ওড়না ঠিক করে মাথায় দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, "কী হচ্ছে এখানে? মাহা কোথায়?"

তারিনের কথাগুলো থেমে থেমে আসছিল, অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে তারিন, কথা বলতে পারছে না ঠিকমতো। সাজেদ তারিনকে আবার বিছানায় শুয়ে দিল। মাথার উপর মিটমিট করে লাইট জ্বলছে, সেই আলোতে তারিনকে ভীষণ ফ্যাকাশে লাগছে, রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছে সে।

তারিন ছাড়াও রুমে পাঁচজন পুরুষ আছে, তিনজনকে তারিন চেনে, কিন্তু দুজনকে চেনে না। তিনজন হলো সাজেদ, আসলান আর জাফর। বাকি দুজনকে তারিন চিনতে পারল না। সেই দুজন দাঁড়িয়ে আছে তারিনের মাথার কাছে, সাজেদ আর আসলান পায়ের কাছে, আর জাফর নিচে কী করছে তারিন দেখতে পাচ্ছে না।

জাফর আগেই আসলান আর সাজেদকে তারিনের পায়ের কাছে থাকতে নির্দেশ দিয়েছে, আর বাকি দুইজনকে মাথার কাছে থাকার জন্য ইশারা করল। দুজনও বাধ্য ছেলের মতো তারিনের মাথার কাছে এসে দাঁড়াল। জাফর সবাইকে আগেই বলেছে অজু করে নিতে, তারপর আয়াতুল কুরসি, সূরা নাস, সূরা ফালাক্ব আর সূরা কাফিরূন পড়ে– 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর' ১০০ বার পড়তে বলল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তারিন ছাড়া সবাই সেগুলো পড়ল।

জাফর ব্যাগ থেকে একটি কালো কাপড় বের করে নিল, কাপড়ের গায়ে আরবীতে কী যেন লেখা, আসলান ঠিক সেটা বুঝে উঠতে পারল না। একটি কালো বোতলও দেখল জাফরের হাতে। সে কালো কাপড়টি বিছানায় রেখে তারিনের মাথার কাছে এসে বলল, "মুখ খুলে বিসমিল্লাহ বলে এই সেন্নাটা (শরবত) খেয়ে নাও। যতটুকু পার ততটুকু খাও।"

তারিনের মুখের কাছে বোতলটি ধরে জাফরের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল। জবাবে জাফর শুধু মুচকি হেসে মাথা নাড়িয়ে তারিনকে আশ্বস্ত করল। তারিন একটু উঠে আধ শোয়া অবস্থায় আস্তে আস্তে পান করে শুয়ে পড়ল, সেটা দেখে জাফরও দেরি না করে বোতলটি ব্যাগে ঢুকাল।

জাফর দাঁড়িয়ে সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, "এখানে যা আমি করব তা হলো রুকইয়া। শরীয়তসম্মত চিকিৎসা। আমি যখন রুকইয়া করব তখন অনেককিছু ঘটবে। লাইট চলে যাবে, অন্ধকার হয়ে যাবে, তারিনের শক্তি কয়েক গুণ বেড়ে যাবে, কিন্তু আপনারা ভয় পাবেন না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা আমাদের সাথে আছেন। আমি তিন ধাপে রুকইয়া সম্পূর্ণ করব। আস্তে আস্তে চূড়ান্ত পর্যায়ে যাব। প্রথম ধাপে আমি যে জিন বা জিনরা তার ক্ষতির জন্য কাজ করছে তাকে বা তাদের ডাকবো। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমি আলাপ আলোচনা করব, চূড়ান্ত পর্যায়ে ওদের সাথে বোঝাপড়াসকরার চেষ্টা করব। সবাই প্রস্তুত হোন।"

সবাই রুদ্ধশ্বাসে জাফরের কথা শুনল। জাফর কালো কাপড়টি বিছানা থেকে সেটি নিয়ে তারিনের সামনে গেল। তারিন ভয়ার্ত দৃষ্টিতে জাফরের দিকে তাকিয়ে রইল।

জাফর তারিনকে আশ্বস্ত করে বলল, "ভয় পাবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা আছেন তোমার সাথে।"

কথা শেষ করে কালো কাপড়টা দিয়ে ঢেকে দিল তারিনের মুখ। তারপর পড়তে লাগল।[২] কী পড়ছে আসলান বুঝতে পারছে না, কিন্তু ভাষাটাকে চিনতে পারছে। আরবী ভাষা। জাফর বেশ জোরে জোরে আরবীতে সূরা পড়ছে। তারিন কেমন যেন শব্দ করছে, অস্পষ্ট। জাফরের গলার সামনে সে শব্দটা বারবার হারিয়ে যাচ্ছে। তবে তারিন জোরে জোরে মাথা নাড়ছে। এত জোরে নাড়ছে যে কাপড়টা প্রায় সরে যাওয়ার উপক্রম।

হুট করে আসলানের কানের লতি ছুয়ে কী যেন চলে গেল। আসলান চমকে উঠল, সাথে সাথে ভয় পেয়ে তারের মতো সোজা হয়ে দাঁড়াল। ভ্যাপসা গরম, ভারী বাতাস, অজানা এক ভয় – সব মিলিয়ে যেন একদম দমবন্ধ হওয়া পরিবেশ। ভয়ে বাকিদের দিকে চোখ ফেরানো দায় হয়ে গিয়েছে। এদিকে জাফর মাথা নাড়িয়ে একের পর এক সূরা পড়ে যাচ্ছে।

তারিন এত জোরে মাথা নাড়াচ্ছে, মনে হচ্ছে, এই বুঝি মাথাটা ছিটকে পড়ে যাবে। তার উপর থেকে কালো কাপড়টা প্রায় পড়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে সেটি বাম দিকে হেলে যাচ্ছে। আর কিছুক্ষণ, তারপর হয়তো তারিনের ভয়ানক, রাগান্বিত চেহারাটা দেখা যাবে। বেশি দেরি হলো না, জাফর মিইয়ে গেল। সূরা পড়া বন্ধ করে হাঁপাতে লাগল সে।

জাফর শেষ করা মাত্রই তারিন মুখের উপর থেকে কাপড়টি ছুঁড়ে মারল, কাপড়টা গড়িয়ে আসলানের পায়ের কাছে পড়ল, আসলান চমকে উঠে পিছিয়ে

গেল। তারিনের চেহারার উপর সবার চোখ পড়ল। একটু আগের তারিন আর নেই, অনেক বদলে গিয়েছে। মুখ শক্ত হয়ে আছে তার, চোয়াল দেখা যাচ্ছে, চোখ দুটি তীব্র লাল, মনে হচ্ছে আগুন ঝরছে তার চোখ দিয়ে।

আসলান জাফরের দিকে তাকাল। তার কপালে ঘাম, চোখে ক্লান্তি। একটু পরপর ঢোক গিলছে সে। মনে হচ্ছে গলা শুকিয়ে উঠছে তার। তার নিঃশ্বাস নেওয়ার শব্দ এত দূর থেকেও শুনতে পাচ্ছে আসলান। কাপড়টার দিকে তাকাল, কী যেন ভাবল জাফর। তারপর জাফর নিজের ডান হাত তারিনের মুখের উপর রাখল, লম্বা করে দম নিয়ে আবার পড়া শুরু করল।[৩]

জাফর এক টানে সূরা পড়ে যাচ্ছে, পাশপাশি তারিনের মুখ আর মাথায় হাত বুলাচ্ছে। তারিন জাফরের হাত থেকে ছোটার জন্য ছটফট করছে, কিন্তু পারছে না। অবাক করার বিষয় হলো, জাফর বেশ আলতো করে তারিনের মাথায় হাত বুলাচ্ছে। তারিন চাইলেই সেখান থেকে বের হতে পারে, জাফরের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারত কিন্তু তারিন পারছে না। সে নিজের জায়গা থেকে নড়তে পারছে না। কেবল অনরবরত মাথা নাড়ছে।

পুরো ঘর ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে, বাতাসটা কেমন যেন অদ্ভুত হয় গেল। ভারীও না, আবার হালকাও না। এরকম বাতাস আর কখনো অনুভব করেনি আসলান। এই বাতাসের মধ্যে নিঃশ্বাস নিতেও কেমন যেন কষ্ট হচ্ছে। সবার মধ্যে কেমন ভয় লাগতে শুরু করল, অজানা এক ভয়, আচমকা কোনো কিছু এসে যেন ভয় লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছে। আসলানের শরীর ভারী হয়ে গেল। মনে হচ্ছে আসলান শুধু আসলান নেই, তার সাথে কেউ একজন জড়িয়ে গিয়েছে। সে বাকিদের দিকে তাকাল। তাদেরও বোধহয় একই অবস্থা।

কিন্তু এত কিছুর মধ্যেও জাফর তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, তারিনের মুখের উপর নিজের হাত রেখে পড়ে যাচ্ছে। তারিন বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে, কিন্তু জাফর থেমে নেই। সবাই নির্বাক হয়ে সবকিছু দেখছে। আসলানের কানে শুধু জাফরের গলার মিষ্টি সুর আসছে।[৪]

সময় চলে যাচ্ছে তার নিজের গতিতে। কিন্তু আসলানের মনে হলো সময় যেন যাচ্ছে না। তার জন্য সময় যেন সেই প্রথম প্রহরে আটকে আছে। জাফর সূরা পড়ছে আর তারিন ছটফট করছে। কিছুই যেন বদলাচ্ছে না। নাকি বদলাচ্ছে? জানে না আসলান। সে যে এক অদ্ভুত ঘটনার মুখোমুখি হচ্ছে, সেটা সে নিশ্চিত জানে, মানতে শুরু করেছে। আসলানের বেশিক্ষণ আর অপেক্ষা করতে হলো না। জাফর রুদকইয়া থামিয়ে ফেলল।

আসলান তারিনের দিকে তাকাল। তারিন শোয়া থেকে উঠে গেল। খিঁচুনি উঠেছে তারিনের, তার সমস্ত শরীর নড়ে উঠল, সাথে তার বিছানাও। একদম দি এক্সোরসিস্ট সিনেমার মতো। জাফরও আর দেরি না করে তারিনের মুখ থেকে হাত সরিয়ে কয়েক কদম পিছিয়ে গেল। দমকা একটি গরম বাতাস এসে সবাইকে জমিয়ে দিল, ঘটনার আকস্মিকতায় হতবিহ্বল হয়ে গেল সবাই, কেউ বুঝতে পারল না যে সেই বাতাসের আড়ালে তাদের অজান্তেই আরেকটি গরম বাতাস দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছে। বাতাসের ঝাঁকুনি খেয়ে দরজার পাল্লা ঠকঠক করে বাড়ি খাচ্ছে।

জাফর কাঁপা কাঁপা স্বরে বলে উঠল, "সে এসেছে। সে এসেছে।"

তারিন চুপ করে বিছানায় মাথা নিচু করে বসে আছে। তার পিছনে যে দুজন লোক ছিল তারা ভয় পেয়ে এখন সাজেদ আর আসলানের কাছে চলে এসেছে। সবাই কাঁপছে, কেউ কাঁপছে ভয়ে, কেউ বা উত্তেজনায়। সবার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। সবাই জাফরের পিছনে তারিনের পায়ের কাছে জড়ো হয়েছে। তাদের দেখে মনে হচ্ছে যেন তারা জাফরকে প্রতিরক্ষা বেষ্টনী হিসেবে ব্যবহার করছে।

"আসসালামু আলাইকুম," জাফর এগিয়ে গিয়ে বলল।

তারিন এখনও বসে আছে, মাথা নিচু করে আছে, তার চুলগুলো খোলা, সেগুলো দুই পাশে সামনের দিকে পড়ে আছে, যার ফলে তার মুখ ঢেকে আছে।

তারিন নিশ্চুপ দেখে এবার জাফর নিজেকে সামলিয়ে বলল, "আসসালামু আলাইকুম। আপনি কে?"

তারিন এখনও নিশ্চুপ। এবার জাফর নিজের পকেট থেকে একটি স্বচ্ছ কাঁচের বোতল বের করল, ভিতরে পানি দেখল আসলান। কাঁচের বোতলে ফিলামেন্টের আলো পড়ে কেমন অদ্ভুত রং ধারণ করেছে। জাফর বোতলটি খুলে সেটা থেকে কয়েক ফোঁটা পানি নিয়ে তারিনের মাথার উপর ছিটাতেই সে গগনবিদারী চিৎকার দিয়ে উঠল। তার আর্তনাদে এই ইট-পাথরের রুমও যেন থরথর করে কাঁপতে লাগল। সে এবার মাথা তুলে জাফরের দিকে তাকাল, তাকে এখন একদম স্বাভাবিক লাগছে, যেটা আরও ভয় পাইয়ে দিয়েছে সবাইকে। কিন্তু এই ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে আসলান এই ভেবে স্বস্তি পেল যে সব ঝামেলা চুকেছে।

"আপনাকে সালাম দিলাম, আপনি জবাব দিলেন না। আপনি কি অন্য ধর্মের?" জাফর আবার তারিনকে জিজ্ঞেস করল।

তারিন মাথা নেড়ে হ্যাঁ-বোধক জবাব দিল।

"আপনার নাম কী?" জাফর আবার প্রশ্ন করল।

তারিন নিরুত্তর, মাথা নিচু করে বসে আছে। জাফর এবার তারিনকে দেখিয়ে বোতল থেকে পানি হাতে নিল। তারিন মুহূর্তেই কাঁদতে শুরু করল, তার চোখ বেয়ে ঝরঝর করে পানি পড়ছে। আসলান বুঝতে পারছে না, তারিন অভিনয় করছে, না তার সাথে আসলে এরকম কিছু হচ্ছে যার ফলে তার মানসিক অবস্থা সেকেন্ডেই বদলে যাচ্ছে, সবাই হতভম্ব হয়ে তারিনের দিকে তাকিয়ে আছে।

সাজেদ এতক্ষণ চুপচাপ সব দেখছিল কিন্তু এবার তারিনের চোখে পানি দেখে সত্যিই সহ্য করতে পারল না। চিৎকার করে বলল, "এনাফ! জাফর সাহেব আপনি আসতে পারেন।"

জাফর মাথা ঘুরিয়ে সাজেদের দিকে তাকিয়ে শান্ত সুরে বলল, "শয়তান অনেক রকমের নাটক জানে, ঢং জানে, ছলনা জানে। শয়তানের কাজই এগুলো। এসব করে মানুষকে বিপথে নেয়। এখানে আপনার স্ত্রী নেই। শয়তান আছে। আমাকে সময় দিন আর আপনি একটু অপেক্ষা করুন।"

সাজেদ চুপ হয়ে গেল, আর কিছু বলল না। দাঁড়িয়ে শুধু কাঁপছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে যে হয় সে রাগে ফেটে পড়বে, না হয় মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে বেহুঁশ হয়ে যাবে। আসলানের কপাল জুড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম। গলা শুকিয়ে একদম কাঠ হয়ে আছে। পেট কেমন মোচড় দিয়ে আছে। এরকম তার সাথে দ্বিতীয়বারের মতো হচ্ছে। ভয়ে কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। বাতাসটাই এত ভারী হয়ে গিয়েছে, এখন শ্বাস নিতে কয়েকগুণ বেশি কষ্ট হচ্ছে।

"আপনি নাম বলুন, না হয় জ্বালিয়ে দেব। এই আমার হাতের পানি দেখছেন? এটি দিয়ে আপনাকে জ্বালাব।" জাফর তার হাতটা তারিনের চোখের সামনে এনে বলল। তারিন ভয় পেয়ে মাথা সরিয়ে নিল।

"কথা বলুন!" জাফর চিৎকার করে বলল।

কিন্তু তারিন নিরুত্তর, জাফর এবার নিজের হাতের পানি ছিটিয়ে দিল তারিনের উপর। পানি পড়তেই তারিন বেদনায় চিৎকার দিয়ে উঠল ঠিকই কিন্তু কোনো শব্দ হলো না। সবাই অবাক হলো। তারিনের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে, সে কাঁদছে কিন্তু কান্নার কোনো শব্দ হচ্ছে না। জাফর নিজের মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। হতবুদ্ধি হয়ে কাঁপতে কাঁপতে তারিনকে দেখছে।

জাফর বোতল পকেটে রেখে বলল, "আচ্ছা, বলতে হবে না। ইশারা দিয়ে জবাব দিন। এখন বলুন আপনি কি একাই এই মেয়ের সাথে আছেন? "

তারিন মাথা নেড়ে না বলল। জাফরের মুখে কেমন একটি চিন্তার রেখা ফুটে উঠল তারিনের জবাব পাওয়ার পর। সে নিচের ঠোঁট কামড়িয়ে কিছুক্ষণ ভাবল। ভাবনা শেষ করে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে নাকটা চুলকে নিল একটু।

জাফর আবার প্রশ্ন করল, "আপনারা কয়জন?"

তারিন এবার তার ডান হাত তুলে পাঁচটি আঙুল দেখাল।

"পাঁচজন?" জাফরের কথা শেষ করতেই তারিন তার বাম হাত তুলে আরও পাঁচ আঙুল দেখাল।

এবার জাফর বলল, "দশ জন?"

তারিন মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বোধক জবাব দিল। জাফর খানিকক্ষণ চুপ থেকে আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কোন জাতির? যদি জিন্নি হন তাহলে একটি আঙুল দেখান। মারিদ হলে দুটি আঙুল। গয়লান হলে তিনটি আঙুল আর... ।"

কথা শেষ করতে পারল না জাফর, তারিন দুটি আঙুল দেখাল।

জাফর আবার প্রশ্ন করল, "আপনারা কথা বলতে পারছেন না। কেউ আপনাদের বাধা দিচ্ছে। তাই নয় কি?"

তারিন মাথা নেড়ে হ্যাঁ-বোধক সম্মতি জানাল।

"সে কি মানুষ?"

তারিন মাথা নেড়ে না করল।

"সে জিন?"

তারিন মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

"সে কি আপনাদের সর্দার?"

তারিন মাথা নেড়ে না করল।

"আপনাদের বাধ্য করেছে তারিনকে ধরতে?"

তারিন নিরুত্তর।

জাফর এবার বোতলটি বের করে নিয়ে হাতে অনেকখানি পানি ঢেলে নিয়ে বলল, "আপনারা কেন লেগেছেন এই মেয়েটির পিছনে?"

তারিনকে নীরব দেখে জাফর পানি ছিটাল। সে যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠল। জাফর আবার তার চোখের সামনে বোতল থেকে হাতের মুঠোয় পানি নিল, কিন্তু এবার তারিনের মধ্যে কোনো ভাবান্তর হলো না। জাফর বুঝতে পারল পানি ছিটিয়ে লাভ হবে না।

জাফর বোতলটা রেখে বলল, "তারিনকে ছেড়ে দিন। আপনারা যা চান তাই দেওয়া হবে।"

তারিন চুপ।

জাফর বলল, "ছাড়বেন না?"

তারিন এবার জাফরের দিকে তাকিয়ে একটি হাসি দিল, এমন ভয়াবহ হাসি আসলান দেখেনি কখনো। তারিনের মুখে এমন হাসি দেখে জাফর ছাড়া সবাই পিছিয়ে গেল। সাজেদের মতো লোক যে এতক্ষণ নড়াচড়ার শক্তি হারিয়ে কেবল তারিনের দিকে ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, সেও এক লাফ দিয়ে কয়েক কদম পিছনে গিয়ে হাঁপাতে লাগল। বাকি দুজনের দিকে আসলান তাকাল, তারা ভয় পেয়েছে, কিন্তু তাদের দেখে মনে হচ্ছে তারা এমন ঘটনার সাথে অভ্যস্ত। জাফরের মতো তাদের চেহারায়ও কোনো ভাবান্তর নেই।

"দেখুন আপনারা যেই ধর্মেরই হোন তা কেন তা ভাববার বিষয় নয়। আপনারা ইসলাম গ্রহণ করুন। এক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। আর হযরত মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন তাঁর প্রেরিত রসূল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তাঁকে মানুষ ও জিনদের কাছে পাঠিয়েছেন সঠিক পথ দেখানোর জন্য। আমি চাইলে আপনাদের শাস্তি দিতে পারি। কিন্তু আমার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তা করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা পবিত্র কুরআনের সূরা আল ইসরার ১৭ নাম্বার আয়াতে বলেছেন, 'কোনো বার্তাবাহক না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকে শাস্তি দিই না।'

আপনাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া আমার দায়িত্ব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার আশ্রয়ে আসলে আপনারা লাভবান হবেন। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা কিন্তু আপনাদের কাছেও নবী পাঠিয়েছিলেন। তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা পবিত্র কুরআনের সূরা আনআমের ১৩০ নাম্বার আয়াতে বলেছেন, 'হে জিন ও মানব সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে কোনো রসূল আগমন করেননি? যাঁরা তোমাদেরকে আমার বিধানাবলি বর্ণনা করতেন এবং তোমাদেরকে আজকের এ দিনের সাক্ষাতের ভীতি প্রদর্শন করতেন? তারা বলবে, আমরা স্বীয় গুনাহ স্বীকার করে নিলাম। পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে। তারা নিজেদের বিরুদ্ধে স্বীকার করে নিয়েছে যে, তারা কাফির ছিল।'

হাশরের ময়দানে আপনাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। আপনারা যা করছেন তা সম্পূর্ণ অন্যায়। আপনাদের সেই

অন্যায়ের শাস্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা দেবেন। আপনাদের কাছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা অনেক নবী পাঠিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে আপনাদের সম্পর্কে একটি সূরাও আছে। আপনারা চাইলে সেই সূরা পড়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার মহত্ত্ব দেখতে পারেন। এখন আপনারা কি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে আগ্রহী?"

জাফরের কথা মনোযোগ দিয়ে সবাই শুনছিল। আসলান অবাক হলো এরকম একটা সময় দ্বীনের দাওয়াত কী করে দিচ্ছে? তারিনও শুনছিল, কিন্তু সে কোনো জবাব দিল না। জাফর বুঝে গেল যে মারাদাহকে জ্বালানো ছাড়া উপায় নেই।

জাফর সূরা পড়ার জন্য মুখ খুলবে এমন সময় তারিন হাত তুলে বাধা দিল। জাফর থেমে বলল, "কিছু বলবেন?"

তারিন মাথা নেড়ে সায় দিল।

"আপনারা বোবা?"

তারিন আবার মাথা নেড়ে সায় দিল।

"খাতা-কলম এনে দেব?"

তারিন মাথা নেড়ে সায় দিল। জাফর আসলানের দিকে তাকিয়ে বলল, "রিসিপশন থেকে খাতা-কলম আনো, কুইক।"

জাফরের হুকুম শুনে আসলানের মধ্য থেকে ভয় আর জড়তা একদম কেটে গেছে। সে এক দৌড়ে বের হয়ে গেল। এই ফাঁকে জাফর তারিন থেকে মনোযোগ সরিয়ে সবার দিকে একবার তাকাল। সবাই চিন্তিত। সাজেদের মুখ কালো হয়ে আছে। বাকি দুজন বরাবরের মতো ভাবলেশহীন। আসলান খাতা আর কলম নিয়ে ফিরে আসল। খাতা-কলম জাফরের হাতে দিতেই সে সেগুলো তারিনের দিকে এগিয়ে দিল।

তারিন ছোঁ মেরে নিয়ে দ্রুত কী যেন লিখল। লেখা শেষ করেই খাতা জাফরের দিকে ছুঁড়ে মারল। খাতাটা জাফরের পেটে পড়তেই ধরে ফেলল সে। আসলান উঁকি দিয়ে দেখল, আরবীতে কী যেন লেখা। জাফর মনোযোগ দিয়ে সবকিছু পড়ে তারিনের দিকে ফিরে বলল, "তোরা চলে যা।"

তারিন মাথা নেড়ে না করল। তার মুখও কঠিন হয়ে গেল। তারা যে তারিনকে ছেড়ে যাবে না, তা তারিনের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে আছে তারিন। তার দুই চোয়াল শক্ত। চোখ দুটো বাঘিনির ন্যায় সরু।

জাফর বলল, "তাহলে তো তোদের পোড়ানো ছাড়া আমার কোনো রাস্তা নেই।"

তারিন মুখ শক্ত করে জাফরের দিকে তাকিয়ে এক কুৎসিত হাসি দিল। হাসি দেখে আসলানের শরীরের লোম দাঁড়িয়ে গেল। সাজেদও একটু নড়ে উঠল।

জাফর বলল, "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা পবিত্র কুরআন পাঠিয়েছেন রোগমুক্তির জন্য। মানসিক, শারীরিক সব রোগ এই পবিত্র কুরআনের আয়াতে মজিদ দিয়ে সারানো যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার কসম দিয়ে বলছি তোরা বের হ। নাহয় জ্বালিয়ে দেব তোদের।"

জাফর চিৎকারের শব্দে পুরো কামরা নড়ে উঠল। জাফরের কথা শোনার পর তারিন সেই কুৎসিত হাসি আবার দিল।

জাফর এবার দাঁড়িয়ে ওই দুজনের কাছে গিয়ে চোখ দিয়ে ইশারা করল। ইশারা করতেই ওই দুজন অপরিচিত লোক তারিনের মাথার কাছে আসল। তাদের দুজনের দিকে কেবল তারিন চোখ পাকিয়ে তাকাল। তাতেও তাদের মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না।

জাফর আসলানের কাছে এসে বলল, "এখন যা-ই ঘটুক, ভয় পাবে না।"
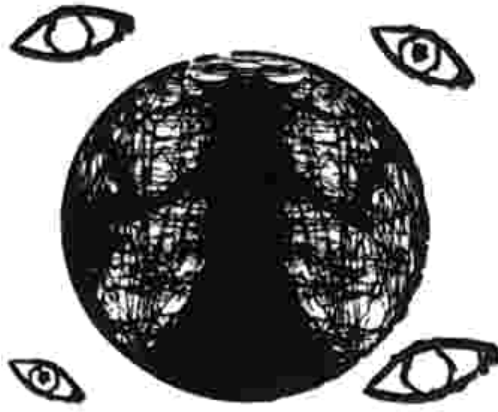
জাফর কাঁপছে, তার শরীর বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে, বাকি চারজন নীরবে দেখছে। সবাই নড়াচড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। নিস্তব্ধ সমস্ত কিছু। পিনপতন নীরবতা, শুধু তারিনের গোঙানির শব্দ কানে আসছে। তারিন আগের মতোই মাথা নিচু করে আছে। গোঙানির শব্দটা সবাই নিবিষ্ট মনে শুনছে। আসলানের গায়ের পাঞ্জাবি ঘামে ভিজে গিয়েছে। ঘাম শুকিয়ে গিয়েছে ঠিকই কিন্তু ভেজা পাঞ্জাবির শীতলতা তার গায়ের লোমগুলোকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তা যে ভয়ের একটি ছাপ তা সে ভালোই বুঝতে পারছে।

জাফর আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে ফ্লোর থেকে কালো কাপড়টি তুলে নিল। সেটা এক হাতে নিয়ে আরেক হাতে ব্যাগ থেকে একটি সাদা চক বের করল সে। তারপর চক দিয়ে বিছানার চারপাশে একটি বৃত্ত আঁকতে আঁকতে বিড়বিড় করে কী যেন পড়তে লাগল। বৃত্ত আঁকা শেষ করে চকটি দুই টুকরো করে সেই টুকরো দুটিকে চকগুলোকে আবার কয়েক টুকরো করল। হাতে মুড়িয়ে গুঁড়ো করে নিল টুকরোগুলোকে। অবশেষে গুঁড়োগুলো ডান হাতের কবজিতে মেখে নিল।

তারপর সবাইকে উদ্দেশ্য করে কাঁপা গলায় বলল, "আপনারা সবাই বৃত্তের বাইরে যান।"

সবাই পা ফেলে বৃত্তের বাইরে চলে আসল, শুধু তারিন রয়ে গেল বৃত্তের ভিতরে। হঠাৎ করে তারিন মুখ তুলল, তার মুখ দেখে সবাই ভয়ে কেঁপে উঠল। তারিনের মুখ একদম সাদা, রক্তশূন্য হয়ে আছে, চোখের জায়গায় লাল দুটি অগ্নিকুণ্ড দেখল সবাই। তারিন সবকিছু দেখছে, কিন্তু ভাবলেশহীনভাবে। লাল চোখদুটি একবার করে সবার দিকে গেল, যার দিকে তাকায় তার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে, এই বুঝি চোখ দিয়ে ভস্ম করে দেবে।

জাফর কাপড়টি নিয়ে তারিনের সামনে এসে দাঁড়াল। জাফরও বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছে। তাকে দেখেও মনে হচ্ছে সে অনেক ক্লান্ত। তারিন জাফরকে দেখে একটি কুৎসিত হাসি দিল। সবাইকে চমকে দিয়ে পালটা হাসি দিল জাফর। তার হাসি দেখে তারিনের মুখ থেকে হাসি চলে গেল। সে কেবল সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করছে।

জাফর এবার রুক্ষ সুরে বলল, "শয়তানের দল। আল্লাহকে ভয় কর।"

তারিন হাসছে আবার। জাফর বিড়বিড় করে কী যেন পড়ছে। পড়া শেষ করে জাফর কাপড় দিয়ে তারিনকে ঢেকে আবার পড়তে লাগল।[৫] এবার আগের মতো পড়ছে না। জাফরের গলার শব্দ যেন কয়েকগুণ বেড়ে গেল, সাথে সাথে তারিনের গোঙানি। জাফর এত জোরে সূরা পড়ছে যে, দেয়ালগুলোও কেঁপে উঠছে।

সময় বয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে সবকিছু কেমন হালকা হয়ে আসছে। জাফরের গলায় খানিক ক্লান্তি ভর করেছে। একটু পরপর হাঁপিয়ে উঠছে সে। আসলান বুঝতে পারছে এভাবে জাফর আর বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না। কী হচ্ছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। ঘটনায় মানিয়ে নিয়েছে আসলান, নাহয় এরকম অবস্থায় যেকোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ অসুস্থ হয়ে যাবে।

ঠাস করে একটি আওয়াজ হলো, অন্ধকার হয়ে গেল সমস্ত কিছু। চমকে উঠল সবাই। উপরে জ্বলতে থাকা বিদ্যুতের লাইট ফেটে গিয়েছে। সবাই ভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠল। আবছা আলোয় আসলান দেখল তারিন কোঁকাচ্ছে। তার উপর অনেকগুলো ছায়া, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ছায়াগুলো। ছায়াগুলো বৃত্তাকারে ঘুরছে তারিনের মাথার উপর, সেগুলোর কোনো আকৃতি নেই। ধোঁয়ার মতো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। আসলানের মনে হলো তারিনের সমস্ত মাথা কালো ছায়াগুলো দ্বারা ঢাকা। ভয়ে আর উত্তেজনায় সবাই জমে গেল। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সবাই ছায়াগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। তারিন প্রচণ্ড কোঁকাচ্ছে।

জাফর চিৎকার দিয়ে বলল, "সাজেদকে বাইরে নিয়ে যাও।"

মুহূর্তেই অপরিচিত দুজন লোক এসে সাজেদকে ধরে বাইরে নিয়ে গেল সাজেদ কোনো কিছু বলার আগেই। আসলানের মনে হলো সাজেদকে উড়িয়ে বাইরে নিয়ে গেল লোকগুলো। বের হয়ে কেবল একটা অস্পষ্ট চিৎকার শোনা গেল তার।

জাফর কেন তাকে বাইরে নিতে বলল সেটা বুঝল না আসলান। ঐ লোক দুটিকে সাজেদ এনেছিল তারিনের জন্য, অথচ ওই লোক দুটি সাজেদকে ধরে নিয়ে বের হয়ে গেল। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে জাফরের দিকে তাকাল আসলান।

বুঝতে পারল, ঘটনা আর আগের মতো নেই। এবার জাফর বিপদে পড়েছে। আসলান কিছু বলতে যাবে, কিন্তু পারল না। তার গলা যেন জমে আছে।

জাফর দেরি না করে কাপড়টি মুখের উপর ধরে রেখেই পড়তে লাগল। সবকিছু বেশ দ্রুত ঘটছে। জাফর চিৎকার দিয়ে পড়ছে। তারিনও এবার স্রেফ গোঙাচ্ছে না, চিৎকার করছে। তার চিৎকার জাফরের গলা ছাড়িয়ে গিয়েছে। চিৎকারের শব্দে কানে তাক লাগা অবস্থা। তারিনের চিৎকার দেখে মনে হচ্ছে, তার ভিতরে হাজার মানুষের কষ্ট জমিয়ে রেখেছে। আর এখন যেন সেই কষ্টগুলোকে স্রোতের মতো বের করে দিচ্ছে।

এবার জাফরের কোঁকানোর শব্দ আসছে। বেশ অবাক হলো আসলান। কোঁকানোর শব্দ শুনে মনে হচ্ছে জাফরের কিছু হচ্ছে। প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে জানালায়। বাইরে থেকে কোনো কিছু এসে এত জোরে আছড়ে পড়ছে, মনে হচ্ছে এই বুঝি জানালা ভেঙে ভিতরে এসে পড়বে। পুরো কেবিনে একরকম ভূমিকম্প হচ্ছে। আসলান আর নিতে পারল না। কানে হাত দিয়ে নিচে বসে পড়ল। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে সে।

জাফরের কী হচ্ছে সে জানে না। সে এখন নিজের জীবন নিয়ে ভাবছে। তার মনে হচ্ছে শীঘ্রই কোনো কিছু হবে, যেটা তার জন্য মোটেও ভালো হবে না। এখানে আসার জন্য নিজেকে গালাগাল দিচ্ছে। না, এভাবে ভয় পেলে হবে না। তার সামনে যে আছে, সে তো ভয় পাচ্ছে না। তাহলে সে কেন ভয় পাবে?

ছোটবেলায় আয়াতুল কুরসী শিখেছিল। চোখ বন্ধ রেখে পুরো আয়াতুল কুরসী পড়ে শেষ করল। এবার চোখ মেলে জাফরের দিকে তাকাল। তাকিয়ে চোয়াল ঝুলে গেল আসলানের। জাফরের মাথার চারপাশে নীলাভ আলোর দ্যুতি, একদম জোনাকির মতো। সব ভুলে মুখ হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে রইল জাফর।

আর্তনাদে সমস্ত ঘর কেঁপে উঠছে, গগনবিদারী আর্তনাদ। আসলান তারিনের আর্তনাদ শুনে চমকে উঠল। জাফরের মাথার কাছ থেকে নীলাভ আলোগুলোও গায়েব হয়ে গেল। তারিন এমনভাবে চিৎকার করছে যেন তার শরীরের সমস্ত লোমের গোড়ায় কে যেন সুঁচ ফোটাচ্ছে। তারিনের ব্যথায় সাজেদের মন কেঁদে উঠছে। বাইরে থেকে চিৎকার করতে লাগল সে। ধপাস ধপাস শব্দও শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সে এখানে আসার জন্য ধস্তাধস্তি করছে, কিন্তু ওই দুজন লোকের কাছ থেকে ছুটে আসতে পারছে না।

তারিন নিজের দুহাত বুকে চাপড়ে কাঁদতে লাগল, যেন সে বিলাপ করছে। এত করুণ সুরে কাঁদছে যে আসলানের ভিতরটাও হু হু করে উঠল। তার ইচ্ছা

হলো তারিনের কাছে ছুটে যেতে। এসব থেকে রক্ষা করতে। কিন্তু সাহসে কুলাল না। উপরন্তু আবেগের বশে করা একটু ভুল সমস্ত কিছু নষ্ট করে দিতে পারে।

জানালাগুলো ঠাস ঠাস আওয়াজ করে নড়ছে। মনে হচ্ছে পুরো ঘরে টর্নেডো বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আসলান ভয় পেল না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল। সে বুঝতে পারছে যে তার জন্য বিপজ্জনক কিছু হলে জাফর আগেই তাকে নির্দেশ দিত বের হয়ে যাওয়ার জন্য। এসব কিছুর মধ্যেও জাফর থেমে নেই, সে চিৎকার করে পড়তে শুরু করল।[৬] সে নিজে সূরা পড়া বন্ধ করল না। তারিনের আর্তনাদ বন্ধ হয়ে গেছে। সে নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু জাফর থামল না। সেও ক্লান্ত। গলা ধরে আসছে। তবুও পড়ছে।

অবশেষে জাফর থামল। এখন তারিনও থেমে গিয়েছে। অনেকক্ষণ আগেই সে চিৎকার থামিয়েছিল, কিন্তু আসলানের কানে জাফর থামা অবধি তারিনের চিৎকারের শব্দ কানে আসতে লাগল। চিৎকার থামার পর সমস্ত কিছু ঠান্ডা হয়ে আছে, আবার পিনপতন নীরবতা, এখন রুমের মধ্যে সেই অদ্ভুত অস্বস্তিকর পরিবেশ আর নেই। পরিবেশ আবার স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। বাতাসটাও হালকা, দম নিতে বেশ আরাম লাগছে। সেই পরিচিত বাতাস আবার অনুভব করতে লাগল আসলান। অনেক হালকা বোধ করছে।

এখনও সমস্ত কিছু অন্ধকার হয়ে আছে, শুধু বাইরের নিয়ন আলো জ্বলছে, আর সেই আলোর ছটা কেবিনে এসে পড়ছে। গাঢ় অন্ধকারের রাজত্ব আর নেই, আবছা অন্ধকার, সবকিছু বোঝা যায়। সেই আবছা আলোয় বিছানার উপর একটি কালো অবয়ব দেখতে পেল, অবয়বটি বিছানার উপর শুয়ে আছে। আসলান বুঝতে পারল তারিন শুয়ে আছে।

"আসলান।" জাফরের ডাক শুনল আসলান।

আসলানের মনে হলো আওয়াজটা অনেক দূর থেকে এসেছে, কিন্তু আবছা আলোয় জাফরকে দেখতে পেল তারিনের বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

আসলান অন্ধকারে ছুটে আসল। জাফরের কাছে এসে বলল, "জি স্যার!"

"পানি নিয়ে এসো। আর সাজেদকে আসতে বলো," জাফর ক্লান্ত স্বরে বলল।

আসলান অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হেঁটে বাইরে চলে যাচ্ছে। এই অন্ধকারকেও তার ভয় লাগছে না। একটু আগে সৃষ্টিকর্তার আলো এই অন্ধকারেও আসলান দেখতে পেয়েছে। সেই আলোটা বাস্তবিক আলো নয়, হিদায়াতের আলো, জ্ঞানের

আলো। শয়তানের উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার গজব নিজ চোখে দেখেছে, ছায়াগুলোকে শেষ হতে দেখেছে।

পাথরের মতো দাঁড়িয়ে সমস্ত কিছু দেখেছে। পবিত্র কুরআনের বাণী কীভাবে শয়তানকে তিলে তিলে শেষ করে তা দেখেছে আসলান। বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছে সে, ভয় পেয়ে বিশ্বাসী হয়নি, পবিত্র কুরআনের আয়াত শুনে হিদায়াত হয়েছে। এখন ভালো মুসলমান হতে চায় আসলান, সেই পণ করে সে বাইরে পানি আনতে গেল।
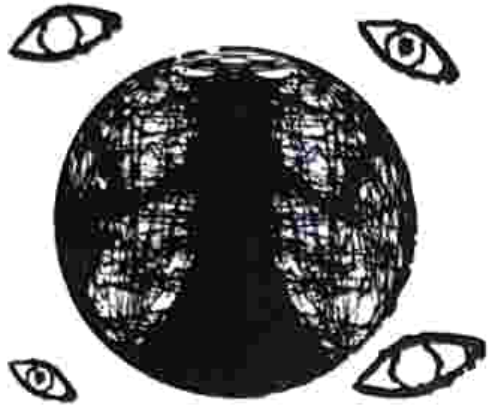
অবশেষে দরজা খুলে বের হয়ে আসল আসলান। সাজেদ এতক্ষণ শুধু কাঁপছিল আর কাঁদছিল। দুজন লোক সাজেদের দুই বাহু ধরে ঠেস দিয়ে চেয়ারে বসিয়ে রেখেছে। দুজনের গায়ে অসুরের শক্তি। একটুও নড়তে পারেনি। বরং কই মাছের মতো কেবল লাফিয়েছে। আসলান বের হতেই দুজন লোক সাজেদকে ছেড়ে দিল। সে এক দৌড় দিয়ে কেবিনে পৌঁছল।

সাজেদ কেবিনে ঢুকে দেখল আবছা অন্ধকার। জাফর দাঁড়িয়ে আছে তারিনের মাথার কাছে, দরদর করে ঘামছে সে আর বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছে। নিয়ন আলোগুলো বেশ শক্তিশালী। তাই সবকিছু বেশ ভালোভাবেই বোঝা যাচ্ছে। প্রতিটা লোমের গোড়ায় যেন ঘাম জমেছে জাফরের।

সাজেদের চোখ গেল তারিনের দিকে। তারিন চোখ বুজে পড়ে আছে, তার মুখ থেকে অন্ধকারটা মনে হয় চলে গিয়েছে, মুখে কেমন যেন একটা প্রাণ ফিরে এসেছে। তবুও চোখের নিচ কালো হয়ে আছে, চোয়ালগুলো বসে আছে। ঠোঁট দুটি কালো আর শক্ত হয়ে আছে। সাজেদ বাকরুদ্ধ হয়ে তারিনের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন কত জনম পর সে আবার তারিনকে দেখছে।

"ঝামেলা কমেনি। তারা আবার ফিরে আসবে যতক্ষণ না আমরা সাহির আর জিনদের করা চুক্তি নষ্ট করছি," জাফরের কথায় সাজেদের বিমূঢ়তা কাটল।

জাফর তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে যে তারিনের দিকে তাকিয়ে আছে সেটা জাফরের নজরে পড়ে। সাজেদ খানিক লজ্জা পেল, চোখ নামিয়ে ফেলল। জাফরের কথার মাথামুণ্ডু বুঝল না, তবে এটা বুঝেছে যে বিপদ এখনও কাটেনি।

সাজেদ আড়ষ্টতা কাটিয়ে বলল, "তারিন কি সুস্থ হয়নি?"

জাফর মাথার কাছ থেকে সরে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "জিন জাতির মধ্যে সবচেয়ে খারাপ জাতি হলো মারাদাহ। মানুষকে ক্ষতি করা এদের সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে পড়ে। এরা সবসময় সে সুযোগ খোঁজে।"

থপথপ শব্দ করে আসলান কেবিনে ঢুকল। আসলান ঢুকতেই জাফর থেমে গেল। আসলান পানির গ্লাসটা দিতেই জাফর পানির গ্লাস নিয়ে ফ্লোরে বসে বিসমিল্লাহ বলে এক ঢোক খেল। কিছুক্ষণ বিরতি নিয়ে বড় করে আরেক ঢোক খেলো আবার। এবার এক টানে পুরোটা পানি শেষ করে বলল, "যা বলছিলাম, যখন কোনো সাহির মারাদাহর সর্দারের সাথে চুক্তি করে তখন সেটা হয় সবচেয়ে ভয়ংকর চুক্তি। এক মারিদকে কখনো পাঠাবে না সেই সর্দার। এক দলকে পাঠাবে। সেই দল ব্যর্থ হলে নতুন এক দলকে। তবে তারিনের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় সবচেয়ে ভয়ংকর পন্থা অবলম্বন করেছে তারা।"

"সেটা কী?" আসলান প্রশ্ন ছুড়ল।

জাফর আসলানের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তারা বোবা জিন নিয়োজিত করেছে। যার জন্য আমি কোনো আলাপ-আলোচনায় যেতে পারিনি, কোনো শর্তে যেতে পারিনি, এমনকি শুধু একটি নাম ছাড়া কোনো কিছু উদ্ধার করতে পারিনি। তবে মাঝেমধ্যে তোমাকে ধমক দেওয়ার জন্য বা আমার সাথেও কথা বলার জন্য তারিন কথা বলত। সম্ভবত তখন সর্দার থাকত। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো তারিনকে যখন আমি রুকইয়া করি তখন সর্দার আসে না, চ্যালারা আসছে। তারমানে তারিনকে মানসিকভাবে ভেঙে দেওয়ার জন্য সর্দার আসত আর বাকি সময় ক্ষতি করার জন্য আসত চ্যালারা।"

কথা শেষ করে জাফর আবার মাথা নিচু করে কী যেন ভাবতে লাগল। ভাবা শেষ করে সাজেদের দিকে তাকিয়ে বলল, "অতসী কে?"

সাজেদ প্রশ্ন শুনে যেন থমকে গেল। অতসীকে তো অনেক বছর আগেই সাজেদ ধামাচাপা দিয়ে দিয়েছে। এই বিষয়টা সামনে আসলে শুধু যে তার রাজনীতির ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যাবে তা না, তার পরিবারও নষ্ট হয়ে যাবে।

সাজেদ বলল, "এর সাথে অতসীর কী সম্পর্ক?"

"সম্পর্ক আছে। যখন আমি প্রথম রুকইয়া করি তখন জিন অতসীর নাম নেয়। তারিনের এই অবস্থার পিছনে অতসীর হাত আছে," জাফর সাজেদের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে জবাব দিল।

তাহলে এসবের পিছনে অতসীর হাত? সে কি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সাজেদের পরিবারের উপর জিন লেলিয়ে দিয়েছে? কিন্তু অতসী এমন করবে

কেন? সাজেদ কাঁপতে কাঁপতে নিচে বসে পড়ল, দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে কেঁদে কেঁদে বলল, "অতসী এমন কেন করবে? ওকে পতিতালয় থেকে তুলে এনে আমি সম্মান দিয়েছি। যা চেয়েছে তাই দিয়েছি।"

"আমার মনে হয় সেরকম হয়নি। অতসী কালো জাদু করেছে। আমি যদি রুকইয়া করে জিনদের ভাগিয়েও দেই তারপরও নতুন জিন নিয়োগ করবে। যে জাদু করেছে তার সাথে কথা বলে এটা উঠাতে হবে। এই ক্ষেত্রে সরাসরি জাদুকরের সাথে কথা বলতে হবে না হয় যে জাদুকরকে দিয়ে করিয়েছে তাকে বলতে হবে।"

সাজেদ মুখ থেকে হাত সরিয়ে বলল, "মাহা আসার পর থেকে অতসীর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি শুধুমাত্র ওর গ্রামের ঠিকানা জানি।"

"চলবে, আমাকে ঠিকানা দিন।"

সাজেদ জাফরের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি কেন এত সাহায্য করছেন?"

জাফর মুচকি হেসে বলল, "কারণ এটা আমার কাজ। আমি না করলে আর কে করবে?"

সাজেদ মাথা নামিয়ে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইল। পকেট থেকে টাকার বান্ডিল বের করে বলল, "বিক্রমপুরের মুক্তারপুর গ্রামে অতসীর বাড়ি।"

জাফর টাকাটা নিয়ে বলল, "ধন্যবাদ। তারিন আশা করি এখন তেমন ঝামেলা করবে না, করলে বেঁধে রাখবেন।"

জাফর কথা শেষ করে বাইরের দিকে পা বাড়াল। আসলান চুপচাপ সবকিছু দেখছিল। জাফরের সাথে যাওয়ার জন্য ইচ্ছে হলো, অবশ্য এই ইচ্ছের পিছনে তীব্র কৌতূহল কাজ করছে।

আসলান সাজেদের কাঁধে হাত রেখে বলল, "আপার খেয়াল রাখবেন। আমিও তার সাথে যাচ্ছি।"

জবাবের অপেক্ষা না করে আসলান দ্রুত পা চালিয়ে জাফরের দিকে গেল। কেবিন থেকে বের হওয়ার আগে তারিনের মুখের দিকে তাকাল। মনে মনে বলল, *আল্লাহ আপাকে সুস্থ করে দিন।*

জাফর সিঁড়ি বেয়ে নামছে। আসলান পিছন থেকে বলল, "কীভাবে যাব আমরা?"

জাফর হাঁটা থামিয়ে বলল, "তুমি কোথায় যাবে?"

"আপনার সাথে।"

"না, আমার সাথে কোথাও তোমাকে নিচ্ছি না।"

কথাটা শুনে আসলানের মন খারাপ হয়ে গেল ঠিকই কিন্তু নিজেকে সামলে বলল, "কিছুদিন আগেও আমি সংশয়বাদী ছিলাম, এখন বিশ্বাসী হচ্ছি, আর তাতে আপনি বাধা দেবেন?"

জাফর ভ্রু কুঁচকে বলল, "এর সাথে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কী সম্পর্ক? পবিত্র কুরআন পড়ো, তাহলেই হবে।"

"হাতে-কলমে দেখার একটা ব্যাপার আছে না?"

"এটা জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার।"

"এ দুটিই আল্লাহর হাতে।"

জাফর কথা না বাড়িয়ে নেমে গেল। আসলান একে জাফরের মৌন সম্মতি ভেবে হেসে তাকে অনুসরণ করতে লাগল।
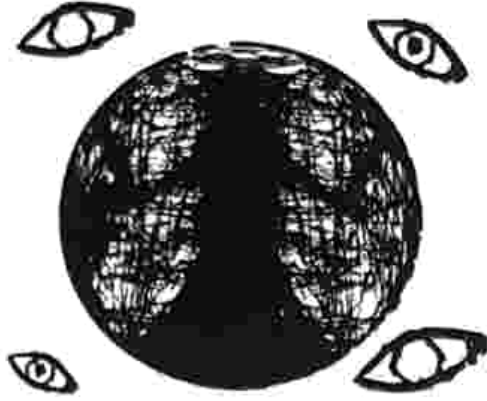
ঢাকা থেকে বিক্রমপুর আসতে তিন ঘন্টা লেগেছে। টিকাটুলি থেকে মাওয়ার বাসে উঠেছে দুজন, বাসে করে সোজা চলে এসেছে বিক্রমপুরে। বাস স্টেশনের পাশেই অনেক ভ্যান আর গরুর গাড়ি। জাফর আর আসলানকে দেখে কয়েকজন ভ্যান নিয়ে এগিয়ে আসল। যে সবার আগে এলো তাকেই ডাক দিল জাফর।

সেই ভ্যানওয়ালা আরও কাছে আসতেই জাফর বলল, "জাহাঙ্গীরনগর যাবে?"

আসলান চুপ হয়ে তাকিয়ে থাকল জাফরের দিকে। জাফরের মুখের ভাবভঙ্গির কোনো পরিবর্তন হলো না, কিন্তু আসলান ঠিকই কৌতূহলী হয়ে গেল। ভ্যানে বসে আসলান জাফরকে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, আমরা যাচ্ছি কোথায়?"

জাফর আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, সূর্য হেলে গিয়েছে পশ্চিম আকাশে, আসরের আজান দেবে কিছুক্ষণের মধ্যে। জাহাঙ্গীরনগর গিয়েই নামাজ পড়তে হবে। আসলান যে প্রশ্ন করল জাফর তা খেয়াল করেনি। বিক্রমপুরের সাথে এক বিষাদমাখা অতীত জড়িয়ে আছে। এত বছর পর এই শহরে পা দিতেই সবগুলো স্মৃতি আবার মস্তিষ্কে জড়ো হতে শুরু করল।

আসলান জাফরের কাঁধে ধাক্কা দিয়ে বলল, "স্যার!"

জাফর চমকে উঠে বলল, "কী?"

"আমরা যাচ্ছি কোথায়?"

"তা জানা কি জরুরি?"

আসলান মুচকি হেসে বলল, "জানলে ক্ষতি নেই। বলে ফেলুন।"

জাফর মুখ ফিরিয়ে বলল, "জাহাঙ্গীরনগর।"

আসলান প্রশ্ন করল, "অতসীকে খুঁজে বের করা মুশকিল না?"

"হ্যাঁ, তবে অসম্ভব নয়। আমরা বিক্রমপুরের চেয়ারম্যানের বাড়ি যাব।"

"পরিচিত নাকি?"

আসলানের প্রশ্নে জবাব দিল না জাফর। তারা যখন জাহাঙ্গীরনগরে পৌঁছল ঠিক তখনই দূর থেকে আজানের শব্দ ভেসে আসল। জাফরের মুখে এক কালো ছায়া নেমে আসল। আসলান ঠিকই দেখতে পেল সেই ছায়া। ভ্যান থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে জাফর সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

ভ্যান যেখানে থেমেছে তা একটি তিন রাস্তার মোড়। মোড়ের আশেপাশে কিছু মুদি দোকান, মনে হচ্ছে ছোটখাটো একটি গ্রাম্য হাট, হাটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সুবিশাল বট গাছ। এই বট গাছকে ঘিরে যেন সভ্যতা আর নগর পত্তন হয়েছে।

জাফর একটি দোকানের দিকে যেতে যেতে বলল, "অনেক কিছু বদলে গিয়েছে।"

আসলান জবাবে কিছু বলল না। জাফর দোকানের সামনে গিয়ে বলল, "রুকন সাহেবের বাড়ি কোন দিকে বলতে পারেন?"

দোকানি জাফরকে পালটা প্রশ্ন করল, "কোন রুকন?"

"চেয়ারম্যানের ভাই।"

"ব্যবসায়ী?"

"জি।"

দোকানি পশ্চিম দিকের রাস্তা দেখিয়ে বলল, "এই রাস্তা দিয়ে সোজা হাঁটলেই প্রাসাদের মতো যেই বাড়ি পাবেন তা-ই রুকন সাহেবের বাড়ি।"

জাফর ধন্যবাদ দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। লোকজন খুব অদ্ভুতভাবে দেখতে লাগল তাদের, কাউকে গ্রাহ্য না করে দুজনেই সামনের দিকে এগোতে লাগল। রাস্তার দুপাশে নারিকেল গাছ, গাছগুলোর পিছনেই ধানখেত। সদ্য ধান লাগানো হয়েছে, যদিও নানান জায়গায় পানি উঠেছে, তবুও সব জায়গায় ধান গাছ লাগানো।

দেখতে দেখতে দুজনেই এক প্রাসাদসম বাড়ির সামনে হাজির হলো। আসলানের মুখ হাঁ হয়ে গেল বাড়িটি দেখে। একটি রাজকীয় বাড়ি, সুবিশাল শ্বেত পাথরের গেট, গেটের ওপাশে দোতলার বিশাল বারান্দা দেখা যাচ্ছে। জাফর গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, আসলান তাকে অনুসরণ করল। লোহার গেটের ভিতর দিয়ে বাড়ির ভিতরটা দেখা যাচ্ছে। সুবিশাল উঠোন, আর সেখানে হরেক রকম গাছ লাগানো।

জাফর দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল, কেউ নেই, গেট থেকে রাস্তা চলে গিয়েছে বাড়ির দরজা অবধি। আস্তে আস্তে সামনে বাড়ল দুজন। জাফরকে একটু দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে হচ্ছে। দরজার সামনে আসতেই কোথা থেকে যেন একজন পুরুষ হাজির হলো। স্যান্ড গেঞ্জি গায়ে আর লুঙ্গি পরা, হাতে ছোট একটি কাস্তে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে মালি।

"এই মিয়া কোথায় যান?" মালি কঠিন সুরে বলল।

"রুকন সাহেব আছেন? তাঁকে বলুন, ঢাকা থেকে লোক এসেছে তাঁর সাথে দেখা করতে," জাফর জবাব দিল।

মালি কিছু না বলে হনহন করে বাড়ির পিছন দিকে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর এক লোককে নিয়ে হাজির হলো। তাঁর গায়ে সাদা পাঞ্জাবি আর সাদা লুঙ্গি পরা, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, ঠোঁটের উপর এক গুচ্ছ গোঁফ যেন আভিজাত্যের চিহ্ন বহন করছে।

তিনি এগিয়ে এসে বললেন, "তোমাদের তো ঠিক চিনতে পারলাম না।"

জাফর মুখে জোর করে হাসি ফুটিয়ে সালাম দিয়ে বলল, "আসসালামু আলাইকুম। আসলে আমাকে আপনার মেয়ে চিনত।"

"তুমি নীরার বন্ধু?"

"বন্ধু বলা ঠিক হবে না, বরং পরিচিত বলা চলে। খালাম্মা আমাকে চেনেন।"

জাফরের কথা শুনে তিনি কী যেন ভাবতে লাগলেন। কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, "ঠিক আছে ভিতরে চলো। ভিতরে গিয়ে কথা বলা যাবে।"

রুকন সামনে সামনে চললেন, পিছন পিছন দুজন। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন তিনি। বিশাল হলরুমের নিচে তোশক পাতা, তার উপর বিভিন্ন আকারের বালিশ। তিনি নিচে একটা বালিশে হেলান দিয়ে বসে বললেন, "বসো।"

দুজনেই জুতো খুলে বসল। জাফরকে অনেকটা অস্থির দেখাচ্ছে, এই পর্যন্ত জাফরকে এতটা অস্থির হতে দেখেনি আসলান। এমনকি হাসপাতালের সেই ভয়ংকর রাতেও জাফর অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

ভদ্রলোক হাঁক দিলেন, "শেফালির মা!"

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এক মধ্যবয়সি মহিলা হাজির হয়ে বলল, "জি চাচা!"

"মেহমান এসেছে, চা-নাশতার ব্যবস্থা করো।"

মহিলা চলে গেল। ভদ্রলোক জাফরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি এত ঘামছ কেন? আরাম করে বসো।"

ভদ্রলোকের কথা শুনে জাফর যেন আরও অস্বস্তিতে পড়ে গেল। কয়েক মিনিট সময় নিল নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য। মুখ ছোট করে আমতা আমতা করে বলল, "সামি কেমন আছে?"

ভদ্রলোক আড়চোখে প্রশ্ন করল, "সামিকে চেনো নাকি?"

"না, নীরার মুখে শুনেছিলাম ওর কথা।"

"ও বিলেতে আছে।"

জাফর বলার মতো আর কিছু পেল না, তাই বলল, "আছরের নামাজ পড়ব।"

"এখানে কোনো কাজে এসেছ?" ভদ্রলোক কঠিন সুরে বললেন।

"জি," ছোট করে জবাব দিল জাফর।

"ঠিক আছে, যতদিন না কাজ শেষ না হয় ততদিন এখানে থেকে যাও। আর শোনো, বেলি গাছটায় ফুল এসেছে। একটু দেখে এসো। তোমার খালাম্মা ছাড়া আমিও নীরার মুখে তোমার কথা শুনেছি," তারপর একটি রুমের দিকে ইশারা করে বললেন, "এই রুমের সাথে বাথরুম আছে, জায়নামাজও আছে। নামাজ পড়ে নিও।"

জাফর কিছু না বলে মাথা নুইয়ে চলে গেল। আসলান জাফরকে অনুসরণ করল। রুমের ভিতরটা ছোটখাটো একটি মসজিদ, একপাশে বিশাল আলমারি ভর্তি বই, অধিকাংশ কুরআন আর হাদীসের বই, নিচে কার্পেটের উপর জায়নামাজ পাতা।

দেয়ালের আরেক পাশে কয়েকটা কল, তার নিচে ছোট একটা ড্রেন, ড্রেন ঘেঁষেই বসে অজু করার তিনটা পিলার। ব্যাগ নিচে রেখে জাফর অজু করতে বসে পড়ল, আসলানও তা-ই করল। অজু শেষ করে জাফর নিচু গলায় বলল, "নামাজ পড়ে নিই চলো।"

তারপর অজু সেরে দুজনেই রবের নিকট দাঁড়িয়ে গেল।
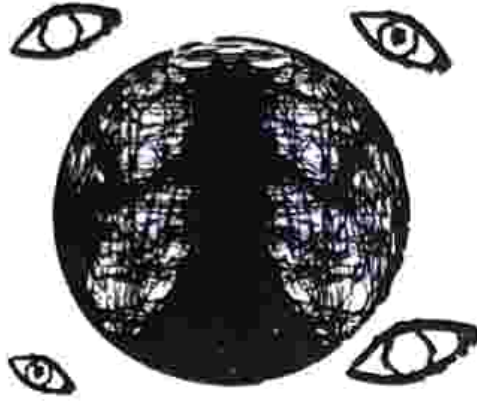
সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, যদিও হাফেজ মিয়ার মনে হচ্ছে আজ অন্যান্য দিন থেকে দ্রুতই সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। এটা মনে হওয়ার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে সময়ের আগে আসা অন্ধকারকে দায়ী মনে হচ্ছে, তবুও তিনি অন্ধকারের আড়ালে কিছু একটার আভাস পেলেন। তাঁর শরীরের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেল। কেমন একটা ভয়ও লাগল, অচেনা ভয়, সেজন্য হয়তো ভয়ের কারণে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি।

জনু কবিরাজের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি দোচালা ঘরের দিকে তাকিয়ে আছেন। ছোট একটি বাবলা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন যাতে কেউ তাকে দেখতে না পায়। দোচালা টিনের ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে হালকা আলো আসছে। ঘরের ভিতর থেকে থালাবাসন নড়াচড়ারও শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, প্রতিটি শব্দ কোনো এক অজানা কারণে ভয় জাগাচ্ছে হাফেজ মিয়ার মনে। হয়তো মনে কয়েকটি প্রশ্ন যেগুলোর উত্তর জানা বাকি, আর সেগুলোর সাথে জনু কবিরাজের ক্ষমতা সেই ভয়ের উৎস হিসেবে কাজ করছে। তিনি এসব কিছুই জানেন না, শুধু ভয় যে পাচ্ছেন তা তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন।

আসলে আজ বিকেলে হুজুরের বলা কথাগুলো তাকে এখানে আসতে বাধ্য করেছে। কালো জাদু করে অনেকের জীবন সহজে নষ্ট করা যায়, শুধু মানুষ নয়, এর শিকার জিনও। কোনো গ্রামে যদি এমন কোনো ব্যক্তি থাকে যে মুসলিম হওয়ার পরও কুফরী কালাম করে, তাহলে ওই গ্রামে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার রহমত আসা বন্ধ হয়ে যায়। হুজুর আরও একটি কথা বলেছেন, যা এখানে আসতে বাধ্য করেছে হাফেজ মিয়াকে।

একটি গ্রামে যদি নিরানব্বই জন লোক পাপী হয় আর একজন ভালো লোক হয় এবং সে যদি তার গ্রামের লোকদের দ্বীনের পথে দাওয়াত না দেয়, তাহলে ওই একজন ব্যক্তির পরিণতি বাকি নিরানব্বই জনের মতোই হবে।

হুজুরের এই কথা হাফেজ মিয়ার ভেতর নাড়িয়ে দিয়েছে। তাছাড়া দুপুরে হুজুর রান্না করতে করতে এটাও বলেছেন যে, একটি সম্প্রদায়, যেখানে সবাই মুসলিম, সেখানে যদি কেউ মুসলিম হয়ে কুফরী করে এবং তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেয়া হয় তাহলে ঐ গ্রামের উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার গজব নেমে আসে।

হাফেজ মিয়া বুঝতে পারলেন হুজুর কাকে নির্দেশ করেছেন। সরফরাজ আলী যাওয়ার পর জনু কবিরাজ গ্রামে এলো, তারপর থেকে গ্রামের মানুষের অধঃপতন শুরু হয়ে গেল। লোকজন মসজিদে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। সে যদি মসজিদে না আসত তাহলে হয়তো সারা বছর মসজিদে তালা লেগে থাকত। এই সবকিছুর মূলে একজন, সে হলো জনু কবিরাজ। যেকোনো মূল্যে জনু কবিরাজকে শায়েস্তা করতে হবে।

তাই তিনি অস্থির হয়ে এখানে ছুটে এসেছেন। জনু কবিরাজকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। মাগরিবের নামাজ পড়ে দেরি করেনি। দ্রুত পা চালিয়ে চলে এসেছেন, যদিও হুজুর জিজ্ঞেস করেছেন কোথায় যাচ্ছেন কিন্তু তিনি চুপ থেকে একটু হেসে জনু কবিরাজের কাছে চলে এসেছেন।

লোকমুখে শুনেছেন মাগরিবের সময় নাকি জনু কবিরাজ ভোগ দেয়। জিনদের ভোগ দেওয়ার ব্যাপারটার সাথে সে পূর্বপরিচিত। ছোটবেলায় হাফেজ মিয়ার বড় বোন রুকমণিকে জিনে ধরে। সন্ধ্যা হলেই রুকমণি বাড়ি থেকে চলে যেত, একেকদিন একেক জায়গায় থাকত, কোনো দিন আমবাগানে, কোনো দিন বিলের পাড়ে আবার কোনো দিন বাঁশবাগানের পায়খানার মাঝে শুয়ে থাকত।

এভাবে অনেকদিন চলল। রুকমণি দিনের পর দিন ভেঙে পড়তে লাগল, শুকাতে লাগল, একসময় দেখা গেল কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলল। কত কবিরাজ, খানকায় গিয়েছে আর পীর দেখিয়েছে হাফেজ মিয়ার বাবা, কিন্তু তেমন লাভ হয়নি। রুকমণির কোনো উন্নতি হলো না। সবাই ভেবেছিল রুকমণি মারা যাবে। হঠাৎ করে গ্রামে এক পীর বাবা এলেন। তাঁর কাছে যেতেই তিনি রুকমণির জিনকে ডাকলেন এবং তাকে ছাড়তে রাজি করালেন। পীরবাবা হাফেজ মিয়ার বাবাকে বলেছিল মধ্যরাতে তিন রাস্তার মোড়ে পাঁচ কেজি মিষ্টি আর একটা

খাসি দিয়ে আসতে। সেটাই করেছিল তার বাবা। মধ্যরাতে ভোগ দিয়ে এসেছিল রুকমণির জন্য। সেদিনের পর থেকেই রুকমণি সুস্থ হতে শুরু করে। এখন স্বামী আর ছেলে সন্তান নিয়ে সুখেই আছে।

হঠাৎ করেই দরজা একটু ফাঁক হয়ে গেল – সেই সাথে চিন্তার জগৎ বের হয়ে এলেন হাফেজ মিয়া। তিনি চট করে নিজেকে আরেকটু লুকিয়ে ফেললেন বাবলা গাছের আড়ালে। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ সামনের দিকে। একটি লণ্ঠন হাতে নিয়ে দরজা দিয়ে বের হলো জনু কবিরাজ। তার পরনে শুধু লুঙ্গি, উর্ধ্বাঙ্গ খালি। সে বের হয়ে লণ্ঠন মাটিতে রেখে বিড়বিড় করে কী যেন পড়তে লাগল। এত দূর থেকেও জনু কবিরাজের গলার শব্দ টের পেলেন হাফেজ মিয়া। দুর্বোধ্য শব্দগুলো তাঁর মাথার উপর দিয়ে গেল ঠিকই কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন জনু কবিরাজ মন্ত্র পড়ছে।

মন্ত্র পড়া শেষ করে জনু কবিরাজ নিজের লুঙ্গিটা খুলে ফেলল। একদম উলঙ্গ সে, লণ্ঠনের আবছা আলোয় কবিরাজের পিছনটা দেখা গেল। কী বিদঘুটে, শরীর রি রি করতে লাগল হাফেজ মিয়ার। নিচু হয়ে সিজদা করল জনু কবিরাজ। সিজদা দিয়ে প্রায় অনেকক্ষণ পড়ে রইল। পাথরের মতো বাবলা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলেন মুয়াজ্জিন। হাঁ করে সবকিছু দেখতে লাগলেন।

হঠাৎ করেই ভিতরে কেমন একটা আওয়াজ হলো। প্রথমে আওয়াজ ধরতে না পারলেও এবার ঠিকই ধরতে পারলেন হাফেজ মিয়া। থালাবাসন নড়াচড়ার শব্দ। ভয়ে আবার লোম দাঁড়িয়ে গেল তাঁর। আস্তে আস্তে ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। মনে হলো একটা বাতাস এসে কবিরাজের ঘরের দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিয়েছে। ভয়ে ঢোক গিললেন তিনি। মশাগুলো যে পায়ে বসে ক্রমাগত রক্ত চুষে যাচ্ছে তা-ও টের পেলেন না তিনি।

জনু কবিরাজ দাঁড়াল, লুঙ্গি পরে হাত জোড় করে কয়েক সেকেন্ড মন্ত্র পড়ে ভূঁইয়া বাড়ির দিকে হাঁটছে। হাফেজ মিয়া পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। ঘামতে শুরু করলেন তিনি। ভয়ের কিছু দেখেননি তিনি, তবুও তাঁর মনে ভয়ের যে অন্ধকার থাবা পড়েছে তা তিনি দূর করতে পারছেন না। ভয় যে তাঁর কাল হয়ে দাড়িয়েছে তা টের পাওয়ার আগেই ডান কাঁধে শীতল একটা স্পর্শ পেলেন।

ভয়ে চমকে উঠলেন তিনি। চিৎকার করতে চাইলেন, কিন্তু তাঁর গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হলো না। কাঁধের উপর শীতল নরম শুঁড়ের মতো কিছু একটা পড়ে আছে। স্যাঁতসেঁতে, নরম আর পিচ্ছিল কী যেন। *সাপ নয়তো?* প্রশ্নটা উঁকি দিল হাফেজ মিয়ার মনে।

তিনি কাঁধ ঝাড়া দিলেন। বস্তুটি পড়ল তো না-ই, উলটো নিচে নেমে আসতে লাগল। এবার তিনি মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন। দেখলেন লোমযুক্ত কিছু একটা নিচে নেমে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে সেটা শক্ত হয়ে যাচ্ছে। ভয়ে সিঁটিয়ে গেলেন তিনি। ডান হাত দিয়ে সরাবেন সেই শক্তিও পেলেন না। দৌড় দেওয়ার জন্য পা চালালেন, কিন্তু কী অদ্ভুত! তাঁর পা দুটি কোনো সায় দিচ্ছে না। অথচ লোমযুক্ত শুঁড়টা আস্তে আস্তে নিচে নেমে যাচ্ছে। প্রচণ্ড ঘামছেন তিনি।

হঠাৎ করে তাঁর কানের কাছে কে যেন ফিসফিস করে বলল, "তোকে আজ চিবিয়ে খাব।"

ব্যাস, আর নিতে পারলেন না তিনি। গড়িয়ে পড়লেন নিচে। কোনোকিছু বোঝার আগেই অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন। ছায়াগুলো যে তাঁর আশপাশে জমতে শুরু করছে তা যদি তিনি বুঝতে পারতেন তাহলে সৃষ্টিকর্তার কাছে মৃত্যু কামনা করতেন।
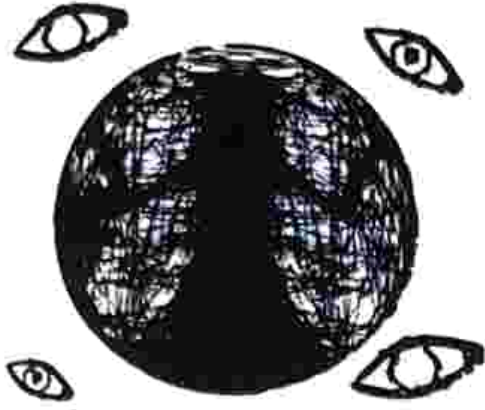
ইশার নামাজ পড়ে আসলান রুমে এসে দেখল, জাফর এক পায়ের উপর আরেক পা তুলে নাচাচ্ছে আর বাম হাতের বাহু দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছে। এই বাড়িতে আসার পর কোনো এক অজানা কারণে জাফর অদ্ভুত আচরণ করছে। যদিও আসলানের সাথে জাফরের কাটানো সময় খুব কম, তবুও জাফরের মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ করেছে আসলান; তা হলো আত্মবিশ্বাস, কিন্তু এখানে আসার পর তা যেন জাফরের চেহারা থেকে বিদায় নিয়েছে।

আসলান বিছানায় বসতেই জাফর বলল, "আমাদের হাতে সময় কম।"

আসলান কিছু বুঝতে না পেরে বলল, "মানে?"

"তারিনকে তারা আবার ধরবে এবং এবার বিপজ্জনক কিছু হবে।"

"আচ্ছা, আপাকে যদি মারতেই হয় তাহলে জিন সরাসরি কেন মারছে না?"

জাফর পা নাচানো থামিয়ে বলল, "বান মারা, তাবিজ করা বা কালো জাদু করা আমরা যা-ই বলি তা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হয়। জিন সরাসরি কাউকে মারতে পারে না। জীবন-মরণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার হাতে, তবে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। কোনো কোনো সময় তারা সফল হয় আবার কোনো কোনো সময় ব্যর্থ হয়। তবে নির্দিষ্ট দিন পার না হলে তারা কিছুই করতে পারে না। তারিনকে ৯০ ভাগ দখল করে ক্ষতি করে ফেলেছে, হয়তো আমার রুকইয়াতে তারিন একটু সুস্থ হয়েছে তবে তা বেশিদিন থাকবে না।"

আসলান বিছানায় শুয়ে বলল, "আচ্ছা, আপনি রুকইয়া করলেই তো হয় এখানে আসলেন কেন?"

আসলানের প্রশ্ন শুনে পা নামিয়ে চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে বলল, "সেক্ষেত্রে তোমাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে।" আসলানের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "তুমি সূরা নাস আর ফালাক্ব নাযিল হওয়ার কারণ জানো?"

আসলান মাথা নেড়ে না বলল। জাফর বিছানায় বসে বলল, "রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও জাদু করার অপচেষ্টা করা হয়েছিল। আর তা করেছিল বনু যুরাইক গোত্রের ইহুদি লাবীদ বিন আসেম। তার মেয়েকে দিয়ে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র চুল ব্যবহার করে সে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর জাদু করতে চেয়েছিল যার ফলে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তেমন কাজ করতে না পারলেও হালকা প্রভাব বিস্তার করে। এভাবে অনেকদিন চলল। একদিন রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে দেখলেন যে, দুজন লোক এসে তাকে বলে দিলেন যে তাকে জাদু করা হয়েছে। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুল ব্যবহার করে একটি চিরুনিতে এগারোটা গিঁট দেয়া হয়েছে এবং ওই চিরুনি খেজুরের খোসায় মুড়িয়ে বনু যুরাইকের খেজুর বাগানের একটি কুয়োর মধ্যে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিরুনিটি উদ্ধার করলেন এবং গিঁটগুলো খুলে দিলেন যার ফলে জাদুর ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেল। এই বিষয়ে হাদীস রয়েছে যেমন, বুখারীর হাদীস নম্বর- ৫৭৬৫ এবং ৬৩৯১, মুসনাদে আহমদ- ৪/৩৬৭।"

আসলান মুখ হাঁ করে প্রশ্ন করল, "রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও জাদু করার অপচেষ্টা করা হয়েছিল?"

"দেখো মুসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনের রাজসভায় জাদুকরদের জাদু দেখেছিলেন। আসলে যারা কালো জাদু সম্পর্কে জানে না তারা অবাক হয় এটা ভেবে যে কীভাবে নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর জাদু কাজ করে। আসলে কালো জাদু পানি, আগুন ইত্যাদি স্বাভাবিক উপাদানের মতো। জাদুর প্রতিক্রিয়া রয়েছে। আগুন যেমন পোড়ায়, পানি যেমন ঠান্ডা করে ঠিক তেমনিভাবে জাদুও কাজ করে। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীরেও তেমন প্রভাব বোঝা যেত। মূলত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা এই ঘটনার মাধ্যমে উম্মতকে জাদু কাটানোর উপায় শিক্ষা দিয়েছেন," জাফর মুচকি হেসে জবাব দিল।

আসলান কিছুক্ষণের জন্য চুপ থেকে আবার প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, প্রথমে যে প্রশ্ন করেছিলাম তার উত্তর পাইনি।"

জাফর উত্তর দিতে যাবে ঠিক এমন সময় দরজার বাইরে থেকে একজন ডাক দিয়ে বলল, "স্যার খেতে ডাকছে।"

গলার স্বর খসরু মিয়ার। বাড়ির কেয়ারটেকার, বয়স পঁয়ত্রিশ হবে, লম্বায় কম করে হলেও ছয় ফুট, মুখে বসন্তের দাগ, উজ্জ্বল শ্যামলা গায়ের রং। কথা শুদ্ধ করে বলার চেষ্টা করে। বিকেলে নামাজ পড়ার পর সে জাফরদের রুমে নিয়ে আসে এবং চা-নাশতার ব্যবস্থা করে।

জাফর বিছানা থেকে নেমে বলল, "চলো।"

আসলান নেমে জাফরকে অনুসরণ করছে। খসরু বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। জাফরদেরকে দেখেই সে নিচতলার দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। জাফর সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল, "দেখো রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে যা দিয়ে জাদু করা হয়েছে তা নষ্ট করতে, যদি রুকইয়া কাজ হতো তখন সেটাই নির্দেশ দেয়া হতো। সচরাচর বদনজর কিংবা জিনের আছর রুকইয়া দিয়ে সারানো যায়। এমনকি অনেক কালো জাদুও রুকইয়া করে কাটানো যায়, কিন্তু সেক্ষেত্রে জিন হার মানে অথবা উপায় বলে দেয়। কিন্তু তারিনের উপর একটি জিন আছর করেনি, মারাদাহ আছর করেছে। যার ফলে আমি বারবার রুকইয়া করে ঠিক করলেও তারিন আবার আক্রান্ত হবে যতক্ষণ না আমরা জাদুর জিনিসটা নষ্ট করছি অথবা সাহিরের সাথে কথা বলে তা তুলে না নিচ্ছি।"

কথা শেষ করেই জাফর খসরুর পিছন পিছন ডাইনিংয়ে চলে এলো। আসলানের মাথায় একটা প্রশ্ন ঘুরছে কিন্তু তার আগেই দেখল ডাইনিংয়ে রুকন সাহেব বসে আছেন এবং তার কাঁধে হাত রেখে এক ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। পরনে সালোয়ার-কামিজ, মাথায় হিজাব পরে আছেন আর চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। মুখে আভিজাত্য এবং কর্তৃত্বের চিহ্ন।

জাফর এগিয়ে গিয়ে লম্বা করে সালাম দিল, "আসসালামু আলাইকুম খালাম্মা। কেমন আছেন?"

ভদ্রমহিলার নাম রিনা, তিনি রুকন সাহেবের স্ত্রী। জাফরকে দেখে প্রথমে একটু অবাক হলেও, মুহূর্তের মধ্যে তা দূর করে মুচকি হেসে বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ বাবা। তুমি কেমন আছো?"

জাফর হাসি দিয়ে জবাব দিল, "আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় ভালো আছি।"

আসলান কী বলবে বুঝে পেল না। জাফরের পিছনে দাঁড়াল।

ভদ্রমহিলা আসলানের দিকে ইশারা করে বললেন, "এ কে? তোমার ছেলে?"

জাফর ইতস্তত করে বলল, "না, খালাম্মা। ও আমার ছাত্র।"

"ভূত তাড়ানোর ছাত্র?"

জাফর জবাব দিল না। ভদ্রমহিলা চেয়ারের দিকে ইশারা করে বললেন, "বসো।"

জাফর চেয়ার টান দিয়ে বসল, আসলানের দিকে তাকিয়ে আসলানকে ইশারা করতেই আসলানও বসে পড়ল। ভদ্রমহিলা জাফরের মুখোমুখি চেয়ারে বসেছে। আসলান টেবিলের দিকে চোখ বুলাল। খাবারের আয়োজন দেখে চোখ কপালে

উঠে গেছে। কী নেই তাতে? পোলাও, বিরিয়ানি, গরুর কাবাব, চিংড়ি ভুনা, গরুর গোশতের ঝোল, মুরগির রোস্ট, ইলিশ ভাজা। খাবারের আয়োজন দেখে জিভে পানি এসে গেছে।

ভদ্রলোক প্লেট উল্টিয়ে ইশারা করলেন। তাঁর দেখাদেখি সবাই প্লেট উল্টিয়ে খাবার নিল। ভদ্রমহিলা বেশি কিছু না নিয়ে শুধু একটু বিরিয়ানি নিলেন। খাবারের মাঝখানে আড়চোখে তাকাতে লাগলেন আসলান আর জাফরের দিকে। জাফর মাথা নিচু করে খেতে লাগল, বেশি কিছু খেল না, সবার আগেই খেয়ে উঠল। আসলান বাদ দিল না, পেট পুরে খেতে লাগল।

আসলানের খাবার শেষ হয়নি দেখে জাফর বসে রইল। সবাই চুপচাপ খাচ্ছে। জাফর হঠাৎ করে বলল, "খালাম্মা আপনি নীরার মতো করে খান।"

ভদ্রমহিলা জাফরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কেমন?"

"ধীরেসুস্থে।"

ভদ্রমহিলা একটু বিরিয়ানি মুখে দিয়ে বললেন, "নীরার এত ছোট ছোট বিষয় এতদিন পরও মনে রেখেছ দেখে খুশি হলাম। বিয়ে করেছ?"

জাফর জবাব দিল না। ভদ্রমহিলা আড়চোখে তাকিয়ে বললেন, "না কি আগের মতো ভূত তাড়িয়ে বেড়াচ্ছ? শুনলাম ঢামেকে চাকরি পেয়েছিলে। চাকরি কন্টিনিউ করোনি?"

"জি, এখনও আছি।"

"রেগুলার?"

"না, পার্টটাইম।"

ভদ্রমহিলা খাওয়া শেষ করে হাত মুছতে মুছতে বললেন, "নীরা তোমার কথা অনেক বলত। তোমাকে আমি সে বাইশ বছর আগে দেখেছি। তখন একটু মোটা ছিলে, চোখে চশমা ছিল। পরনে ছিল পায়জামা আর বাদামি রঙের পাঞ্জাবি।"

"আপনিও তো সেই বাইশ বছর আগের কাহিনি মনে রেখেছেন।"

"মস্তিষ্ক খুব অদ্ভুত জিনিস বুঝলে! বুড়ো হলে বোঝা যায় সময়ের কী দাম। জীবনে পার করে আসা প্রতিটি সেকেন্ড গুরুত্বপূর্ণ লাগে।"

জাফর কিছু বলল না। শেফালির মা ইতোমধ্যে ফিরনি দিয়ে গিয়েছে। আসলান ফিরনি নিয়ে মুখে দিতে লাগল।

ভদ্রলোকও খাবার শেষ করে হাত মুছতে মুছতে বললেন, "একাত্তরে যে গেলে আর খোঁজ পাওয়া গেল না তোমার। নীরা অনেক কেঁদেছে, তারপর হাল

ছেড়ে দিয়েছে। আমি বাধ্য হয়ে তোমার খোঁজ শুরু করলাম। কিন্তু তোমাকে আর পেলাম না। নীরার জেদের কাছে আমরাও হার মানতে বাধ্য হয়েছিলাম কিন্তু উপরওয়ালা চাননি তোমরা এক হও। তুমি ভেবেছিলে আমি হয়তো তোমাকে চিনব না। আসলে তোমাকে কোনোদিন দেখিনি আজকের আগে, তাই গেটে জিজ্ঞেস করতে হলো। অবশ্য নীরা বলেছিল তুমি একদিন না একদিন আসবে। আমি যা শুনেছি তা নীরার মা থেকেই শুনেছি। আশা করি আমাদের প্রতি আর তুমি কোনো ক্ষোভ রাখোনি।"

আসলান আগামাথা কিছুই বুঝল না। মুখ হাঁ করে ভদ্রলোকের কথা শুনল। তবে অনুমান করতে পারছে জাফরের অতীতের সাথে সম্পর্ক আর নীরা নামের সেই মহিলা নিশ্চয় জাফরের প্রেমিকা ছিল, যারা এখন অদৃষ্টের পরিহাসে আলাদা। পুরনো প্রেমিকার বাড়িতে এসে বেড়াচ্ছে, বিষয়টা বেশ অদ্ভুত লাগছে এখন। এরকম ইতিহাসে হয়ত জাফর প্রথমবার করছে।

জাফর মাথা নুইয়ে রেখে জবাব দিল, "কী লাভ আর পুরানো কথা মনে রেখে।"

ভদ্রলোক চেয়ারে বসে বললেন, "ঠিক বলেছ। আচ্ছা তুমি কেন এসেছ তা তো বলোনি।"

জাফর এবার মাথা তুলে তাকিয়ে বলল, "একটা মেয়ের খোঁজে এসেছি।"

জাফরের কথা শুনে রুকন সাহেব জাফরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কেন?"

"মেয়েটার সাথে একজন মুমূর্ষু রোগীর সম্পর্ক রয়েছে।"

রুকন সাহেব ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই মুখ হাঁ করে তাকালেন জাফরের দিকে।

জাফর জোর করে হেসে বলল, "নাম অতসী, মুক্তারপুর বাড়ি।"

"মুক্তারপুর!" ভদ্রলোক বললেন।

জাফর ছোট করে জবাব দিল, "জি।"

"এটা খসরুর এলাকা," ভদ্রমহিলা বললেন।

"তাই নাকি!"

"হ্যাঁ, দাঁড়াও খসরুকে ডেকে দিচ্ছি।" ভদ্রমহিলা কথা শেষ করে ছোট করে দুবার ডাক দিলেন, "খসরু! এই খসরু!"

কিছুক্ষণ পর খসরু ছুটে এসে বলল, "জি খালাম্মা!"

ভদ্রমহিলা বললেন, "তোমাদের গ্রামের অতসী নামে কাউকে চেনো?"

"কোন অতসী?"

"ঢাকায় থাকত। এই কয়েক বছর আগে এখানে এসে থাকা শুরু করেছে," জাফর জবাব দিল।

"ওমা! ঐ মেয়ে!" খসরু অবাক হয়ে বলল।

জাফর বলল, "অবাক হলে কেন?"

"সে তো মারা গিয়েছে।"

জাফর দাঁড়িয়ে বলল, "মারা গিয়েছে মানে?"

"হ্যাঁ, নিজের দুই বছরের মেয়ের গলা নিজেই কেটেছে, তারপর সেখানেই নিজের গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেছে।"

খসরুর কথা শুনে যেন সবার উপর বাজ পড়ল। আসলানের হাত থেকে ফিরনির চামচ নিচে পড়ে গেল, জাফর হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইল খসরুর দিকে। রুকন সাহেব আর তাঁর স্ত্রী বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন।

তাদের বিমূঢ়তা কাটানোর জন্য খসরু বলল, "এই খবর তো খবরের কাগজেও বের হয়েছে। ঢাকা থেকে অনেক সাংবাদিক এসেছিল।"

জাফর রুকন সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, "টেলিফোন কোন দিকে?"

রুকন সাহেব হাত দিয়ে ইশারা করল সিঁড়ির দিকে। জাফর সেদিকেই দৌড় দিল। সিঁড়ির পাশে একটা টেবিলের উপর টেলিফোন লাগানো। জাফর ডায়ালপ্যাডে দ্রুত আঙুল চালালো। ওপাশ থেকে ধরতেই জাফর বলল, "আমি ডাক্তার জাফর বলছি। সতেরো নাম্বার কেবিনের সাজেদকে খবর দিন প্লিজ।"

কথা শেষ করেই কয়েক সেকেন্ড ধরে রাখল। ওপাশ থেকে সাজেদের গলা ভেসে আসল, "জি বলুন।"

"অতসী কি আপনার বাচ্চার মা ছিল?"

"কী বলছেন এসব?"

"আগে আমার কথার জবাব দিন।"

"না, ছিল না।"

"দয়া করে আল্লাহর ওয়াস্তে সত্য কথা বলুন।"

"আল্লাহর কসম কেটে বলছি ভাই। এটা সম্ভব না, আমি অক্ষম।"

জাফর কিছু না বলেই ফোনটা রেখে দিল। ধীরপায়ে এগিয়ে এসে হেলান দিয়ে বসল আসলানের পাশে। সবাই জাফরের দিকে তাকিয়ে রইল, চোখে আঙুল রেখে জাফর কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রাখল।

আসলান জাফরের কাঁধে আলতো করে হাত রেখে বলল, "কী হয়েছে স্যার?"

জাফর চোখ খুলে বলল, "হুঁ!"

আসলান কিছু বলল না।

রুকন সাহেব বললেন, "তুমি কোন কারণে এসেছ বলো তো।"

জাফর এক গ্লাস পানি ঢকঢক করে গিলে সংক্ষেপে পুরো ঘটনা বলল। জাফরের কথা শুনে আসলান ছাড়া সবাই তাজ্জব বনে গেল। কিছুক্ষণের জন্য যেন সবাই পাথর হয়ে গেল। জাফর দাঁড়িয়ে বলল, "খসরু সাহেব। কাল আমাদের একটু মুক্তারপুরে নিয়ে যাবেন।"

কথা শেষ করেই শোয়ার রুমে যেতে লাগল। আসলানও উঠে দাঁড়াল। ফিরনি অর্ধেক খাওয়া হয়েছে, অনেক সুস্বাদু হয়েছে কিন্তু চামচ পড়ে যাওয়ায় আর খাওয়া হয়নি, তাই মন খারাপ করেই জাফরের পিছু নিল।
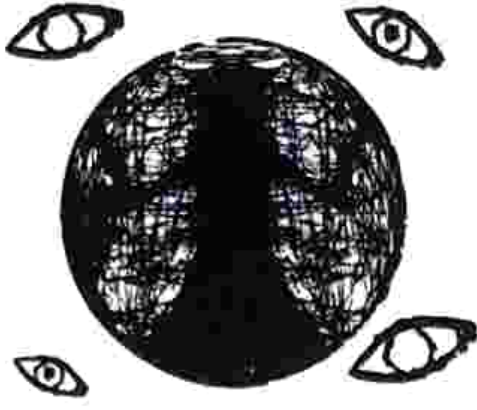
হাসপাতালে কাটানো সময়গুলো আসলেই কষ্টের। হাসপাতালকে ফাইভ স্টার হোটেলের মতো সাজানো হলেও তার দেয়ালগুলোতে বিষাদের ছাপ থেকেই যাবে। বিছানা যতই আধুনিক হোক, সেই বিছানায় কারো মৃত্যুর ছাপ রয়েছে। প্রতিটি হাসপাতালের কেবিন মৃত্যুর সাক্ষী। এই মৃত্যুগুলো হাসপাতালকে বড়ই অসহ্য করে ফেলে। না কেউ ঘুমাতে পারে, না জেগে থাকতে পারে, তবে কিছু মানুষ ব্যতিক্রম, যারা হাসপাতালেও স্বাভাবিকভাবে দিন কাটাতে পারে, কিন্তু সাজেদ মোটেও সে দলের নয়।

সে সংখ্যাগরিষ্ঠদের দলে, তাই এই আবদ্ধ কক্ষ তার কাছে জেলখানা মনে হচ্ছে। যদিও তার কাছে জেলখানা কোনো কষ্টের জায়গা মনে হয়নি, এই হাসপাতালের কেবিনটাকে মনে হচ্ছে। রুমে একটা ডিম লাইট জ্বলছে। তারিন স্বপ্ন দেখছে কি না জানে না তবে সাজেদ একটু আগে একটা স্বপ্ন দেখল। আধো ঘুমে মানুষ খুব স্বাধীনভাবে স্বপ্নে বিচরণ করতে পারে। মানুষের চাওয়া-পাওয়াগুলো স্বপ্নের মাধ্যমে উঠে আসে।

সাজেদও দেখল সমুদ্র পাড়ে তারিনের হাত ধরে হাঁটছে। মাহা বালির মধ্যে খেলছে। তারিনের কোলে একটি ফুটফুটে বাচ্চা। সমুদ্রের বাতাসে তারিনের চুলগুলো উড়ছে। তারিন বাচ্চা নিয়ে চুলগুলোকে ঠিক করতে পারছে না। বারবার তারিনের চোখের সামনে এসে পড়ছে। সাজেদের দিকে তারিন চোখ পাকিয়ে তাকাতেই সাজেদ তারিনের মুখের উপর থেকে চুল সরিয়ে দিচ্ছে।

স্বপ্নটা যেন একটা ঝাঁকুনি খেয়েই ভেঙে গেল। ছোট একটা চেয়ারে হাতের উপর গাল রেখে ঝিমুচ্ছিল সাজেদ। গালের উপর থেকে হাত একটু সরে যেতেই ঝাঁকুনি খেল। যার ফলে আধো ঘুমটা ভেঙে গেল তার। তারিন ঘুমিয়ে আছে। তারিনের গলার শব্দ ভেসে আসছে। গভীর ঘুমে সে।

এভাবে জেগে বসে আছে অনেকক্ষণ যাবৎ। বিরক্ত লাগছে খুব। সিগারেটের প্যাকেট পকেটেই আছে। এখানে খাওয়া যাবে না, তাই সাজেদ আস্তে করে উঠে বাইরে চলে আসল। হলওয়েতে লাইট জ্বলছে, ক্লিনিকে বেশি রোগী নেই, খুব কম। হাঁটতে হাঁটতে রিসিপশনের সামনে যেতেই দেখল দুজন নার্স বসে আছে।

সে একজনকে ইশারা করে বলল, "একটু খেয়াল রাখুন। আমি সিগারেট খেয়ে আসি।"

নার্স মাথা নেড়ে সায় দিল। সাজেদ বাইরে বের হলো না, সিঁড়িতে বসেই সিগারেট টানতে লাগল। মধ্যরাত, সবকিছুই নীরব, একটু পরপর দূরে কোনো গাছে প্যাঁচা ডেকে উঠছে। নিয়ন আলোর জন্য চাঁদের আলো আছে কি না তা বোঝা যাচ্ছে না, অবশ্য চাঁদ উঠেছে কি না সেদিকে কোনো মনোযোগ নেই তার, একের পর এক সিগারেট টানায় মগ্ন সে। তবুও ভিতর থেকে শঙ্কা দূর হচ্ছে না। তারিনের হারানোর ভয়কে এই সিগারেটের ধোঁয়াও দূর করতে পারছে না।

"স্যার একটু উপরে আসুন," পিছন থেকে কে যেন ডেকে উঠল।

সাজেদ চমকে উঠে পিছন ফিরে দেখল নার্স দাঁড়িয়ে আছে। সে অঝোরে ঘামছে। সাজেদ সিগারেটটা ফেলে দাঁড়িয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

"ম্যাডামকে পাওয়া যাচ্ছে না," নার্স হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

"পাওয়া যাচ্ছে না মানে!" সাজেদ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল।

সে নার্সের কাছে আসতেই নার্স ভয়ে ভয়ে বলল, "আপনি বললেন ম্যাডামকে দেখতে। আমি ম্যাডামের রুমে চেক করতে গিয়ে দেখি ম্যাডাম নেই।"

সাজেদ চমকে উঠল। কিছুক্ষণ বাকরুদ্ধ হয়ে নার্সের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কেবিনের দিকে দ্রুত পা চালালো। নার্সও পিছন পিছন ছুটল। সাজেদ ছুটতে ছুটতে বলল, "সবখানে দেখেছেন?"

"জি স্যার। আমরা সবাই মিলে চেক করেছি। ম্যাডামকে কোথাও পাচ্ছি না," নার্স জবাব দিল।

সাজেদ কিছু বলল না, কেবিনের দিকে ছুটল। কেবিনের সামনে একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে, কাপড় দেখেই বোঝা যায় যে হাসপাতালের স্টাফ। কেবিনের ভিতর আলো জ্বলছে। সাজেদ লোকটিকে পাশ কাটিয়ে দরজা খুলল। না, আসলেই তারিন নেই।

সাজেদ পিছন ফিরে চিৎকার দিয়ে বলল, "কোথায় গিয়েছে? একজন রোগী কি হাওয়া হয়ে গেল নাকি?"

সে দৌড় দিয়ে হলওয়েতে চলে আসল, আরেকজন নার্স এসে উপস্থিত হয়েছে ইতোমধ্যে, সাজেদ তাদের দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বলল, "সব দিক দেখেছেন?"

পুরুষটি বলল, "স্যার আমরা প্রত্যেকটি রুম দেখেছি। আমাদের এখানে রুম কম। ক্লিনিকে যেহেতু মাত্র একটা কেবিন। দুটি জেনারেল ওয়ার্ড আর অফিস। সবখানেই দেখেছি।"

সাজেদ বুঝতে পারল না কী করবে। মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগল।

হঠাৎ করে বলল, "আচ্ছা ছাদে যাওয়ার রাস্তা খোলা?"

"না স্যার, তালা দেওয়া সিঁড়ির দরজা," পুরুষটি জবাব দিল।

"ছাদ কোন দিকে?" সাজেদ প্রশ্ন করতেই পুরুষটি হলওয়ের অন্ধকার দিকে নির্দেশ করে বলল, "সোজা গেলেই ছাদে যাওয়ার রাস্তা।"

সাজেদ সেদিকে যেতে যেতে বলল, "লাইটের কী হয়েছে?"

"স্যার এদিকে কিছু নেই, তাই লাইট লাগানো হয়নি," সাজেদকে অনুসরণ করতে করতে সে বলল।

পুরুষটির হাতে টর্চ। এগোতে এগোতে হলওয়ের শেষ মাথায় চলে আসল। হলওয়ে থেকে বাম দিকে একটা রাস্তা চলে গিয়েছে। রাস্তার মাথায় ছাদে যাওয়ার সিঁড়ি, যা লোহার একটা কলাপ্সিবল গেট দিয়ে বন্দি।

গেটের দিকে টর্চ ধরে বলল, "বললাম না স্যার গেট বন্ধ থাকে।"

সাজেদও বুঝতে পারল গেট বন্ধ। ফিরে যাবে ঠিক এমন সময় চোখ গেল গেটের তালার দিকে। তালাটি খোলা। সাজেদ গিয়ে তালাটি ধরল। তালা দেখে মনে হচ্ছে কেউ ভেঙে ফেলেছে।

সাজেদ গেট ফাঁক করে বলল, "তাড়াতাড়ি আমার সাথে আসুন।"

সাজেদ দৌড়ে সড়ি বেয়ে উপরে উঠল, পিছন পিছন লোকটি। বিশাল বড় ছাদ। ছাদের উপর পানির পাইপ এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কয়েকটা কাপড়ের তার বাঁধা, কিন্তু সেগুলো খালি, কোনো কাপড় নেই।

চারদিকে চোখ বুলিয়ে তেমন কিছুই দেখতে পেল না। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, আকাশের চাঁদও আজ মেঘের আড়ালে লুকিয়ে গিয়ে অন্ধকারকে সুযোগ করে দিয়েছে। এদিকে লোকটিও বোকার মতো টর্চ নিচের দিকে ধরে আছে।

সাজেদ চেঁচিয়ে বলল, "টর্চ ধরুন ভালো করে।"

লোকটি টর্চ উপর দিকে তুলবে ঠিক এমন সময় মনে হলো কে যেন পা টেনে টেনে হাঁটছে। তাদের সামনে থেকেই আওয়াজটা আসছে। টেনে টেনে হাঁটছে

বললে ভুল হবে, আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে কারও পায়ে বেড়ি বেঁধে দেওয়া হয়েছে আর হাঁটার সাথে সাথে সেই বেড়ি ছাদের সাথে ঘষা খাচ্ছে।

লোকটি ভয় পেয়ে বলল, "কে!"

সাথে সাথে আওয়াজ বরাবর টর্চ ধরল। টর্চের আলোয় যা দেখল তা দেখে লোকটির হাত থেকে টর্চ ছিটকে নিচে পড়ে গেল, সাজেদ বাকরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, নড়াচড়ার শক্তি যেন হারিয়ে ফেলল।

তারিনের হাতে আর পায়ে বেড়ি বাঁধা, মাথা নিচু করা, সেই বেড়ির শেকল ধরে রেখেছে এমন এক প্রাণী যার আকৃতি বর্ণনা করা কঠিন। মাথায় দুটি শিং জ্বলজ্বল করছে যা অন্ধকারে বোঝা না গেলেও টর্চের আলোয় বোঝা গিয়েছে। গায়ের রং সম্পূর্ণ নীল। সারা শরীরে যেন অসংখ্য লোম, তার চারপাশে অসংখ্য কালো লম্বা লম্বা ছায়া। বাকিটুকু বোঝার আগেই টর্চ বন্ধ হয়ে গেল।

হঠাৎ করেই সাজেদ থপথপ আওয়াজ শুনল। লোকটি সাজেদকে রেখে দৌড়ে বের হয়ে গিয়েছে। আওয়াজ শুনে সাজেদও নড়াচড়ার শক্তি পেল। ঢোক গিলে তারিনের দিকে তাকাল সে। ভয় পেলে হবে না। তাকে তারিনকে বাঁচাতে হবে এই শয়তানটির হাত থেকে। সে ছোটবেলায় শুনেছে আজানের শব্দ শুনলে নাকি শয়তান পালায়। এখন তাকে এটাই করতে হবে। সে দম নিল। বুকে সাহস আনল।

সাজেদ সময় নষ্ট করল না, কানে হাত দিয়ে জোরে চিৎকার করল, "আল্লাহু আকবার!"

কোন প্রতিক্রিয়া হলো না, কিন্তু সাজেদ হাল ছাড়ল না। দ্বিতীয়বারের মতো চিৎকার দিয়ে বলল, "আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"

এবার কাজ হলো। তারিন গুঙিয়ে উঠল, সাথে সাথে একটা বাতাস বইতে শুরু করল। সাজেদ বুঝতে পারল কাজ হচ্ছে তাই হাল ছেড়ে না দিয়ে জোরে জোরে আজান দিচ্ছে। আজান যত সামনের দিকে এগোচ্ছে বাতাস তত জোরে বইছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তারিনের চিৎকার। মনে হচ্ছে ছাদে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সাজেদ হাল ছাড়ল না, আজান দিতে লাগল। হঠাৎ করেই সব থেমে গেল।

সাজেদ আস্তে আস্তে তারিনকে ডাক দিল, "তারিন! তারিন!"

তারিন নিরুত্তর। সাজেদ অন্ধকারে কী করবে বুঝতে পারছে না, ঠিক তখনই দেখল সিঁড়ি দিয়ে টর্চের আলো ভেসে আসছে। সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল লোকটি ফিরে এসেছে, সাথে দুজন নার্সও এসেছে। সাজেদ সামনের দিকে তাকাতেই একটু আগে লোকটির হাত থেকে পড়ে যাওয়া টর্চটা দেখল। টর্চটা তুলে সামনের দিকে ধরতেই দেখল তারিন ছাদে উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

সাজেদ দৌড়ে গেল তারিনের কাছে। ইতোমধ্যে বাকিরাও সাজেদের পিছন এসে দাঁড়িয়েছে। সাজেদ তারিনের কপালে হাত রেখে ডাক দিল। তারিন উত্তর দিল না। জ্বরে তারিনের কপাল পুড়ে যাচ্ছে।

সাজেদ তারিনকে কোলে তুলে ঝাঁকি দিয়ে বলল, "তারিন!"

তারিন চোখ খুলে তাকাল না ঠিকই কিন্তু মুখ দিয়ে ছোট করে জবাব দিল, "হুঁ!"

সাজেদের চোখ দিয়ে পানি চলে এসেছে। এতদিন পর তারিন তার সাথে কথা বলেছে। তার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। গাল বেয়ে গড়িয়ে তারিনের উপর চোখের পানি পড়ছে। সাজেদ নাক টেনে চোখের পানি বন্ধ করল।

সাজেদ কাঁপা কাঁপা গলায় লোকটিকে নির্দেশ করল, "আপনি নামুন।"

একজন নার্স সাজেদের টর্চ তুলে নিল। লোকটি সামনে থেকে টর্চ ধরে নামছে, আর নার্স পিছন থেকে, মাঝখানে সাজেদ তারিনকে নিয়ে নিচে নামছে। কেবিনে এক দৌড় দিয়ে ঢুকল সাজেদ। এক নার্স ছুটে গেল রিসিপশনের দিকে আর বাকি দুজন তার পিছু পিছু ঢুকল। সাজেদ তারিনকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তারিনের ডান হাত দুই হাত দিয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

পিছন থেকে লোকটি বলল, "জাফর ভাইয়ার সাথে যোগাযোগ করেন।"

সাজেদ কিছু বলল না, তারিনের হাত ধরে কেঁপে কেঁপে কাঁদছে। নার্স ইনজেকশন নিয়ে এসে তারিনকে ইনজেকশন দিল। সাজেদ এখনও তারিনের হাত ধরে কাঁদছে, একে একে সবাই চলে গেল, কিন্তু সাজেদ কান্না থামাল না। মাঝরাতের কান্নাগুলোর আলাদা একটা মায়া আছে তাই মাঝরাতে কেউ কাঁদলে স্রষ্টাও তাকে ফিরিয়ে দেন না। সাজেদের কান্না স্রষ্টার জন্য না হলেও, এই রাত হয়তো তাকে স্রষ্টার কাছে ফিরিয়ে দেবে।
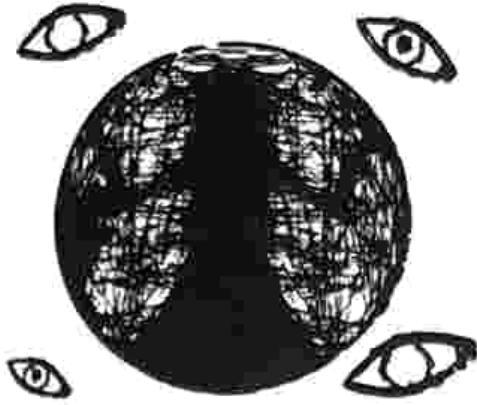
প্রচণ্ড ঘাড় ব্যথা নিয়ে ঘুম ভাঙল হাফেজ মিয়ার। 'ও মা!' বলে নিজের ডান ঘাড় আর কাঁধ চেপে ধরলেন তিনি। চোখ খুলে দেখলেন মাথার উপর ছিকে ঝুলছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখে তার মনে হলো ছিকেটা পরিচিত। হ্যাঁ, এটাই তাঁর ঘর। সন্ধ্যার কথা মনে গেল তাঁর। সাথে সাথে বিছানায় বসে জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগলেন।

"আরে শান্ত হোন," হুজুর এক গ্লাস পানি নিয়ে এসে বললেন।

হাফেজ মিয়া ছোঁ মেরে গ্লাসটা নিয়ে এক টানে পানি খেয়ে ফেললেন। জোরে শ্বাস ফেলে হুজুরকে বললেন, "আমি এখানে কীভাবে এলাম?"

"আপনাকে আমি ইশার সময় পাইনি। খুঁজতে লাগলাম। দেখলাম আপনি জনু কবিরাজের বাবলা গাছটার নিচে পড়ে আছেন," হুজুর জবাব দিলেন।

হাফেজ মিয়া ডান হাত দিয়ে চোখ মুছে ভালো করে দেখলেন। বিছানার পাশে নিচে মাটিতে মাদুর রাখা, মাদুরের উপর বালিশে কুরআন মজিদ রাখা। তিনি বুঝতে পারলেন হুজুর এখানে কুরআন মজিদ পড়ছিলেন।

হাফেজ মিয়া হুজুরকে জিজ্ঞেস করলেন, "কয়টা বাজে?"

"ফজরের সময় হয়ে গিয়েছে।"

হাফেজ মিয়া অবাক হয়ে বললেন, "আপনি সারারাত কুরআন মজিদ পড়েছেন?"

হুজুর মুচকি হেসে বললেন, "আমার অজিফা পূরণ করতে হবে।"

হাফেজ কিছু বুঝতে না পেরে বললেন, "কীসের অজিফা?"

"চলুন মসজিদে যাই," বলেই হুজুর দরজা খুলে বের হলেন।

হাফেজ মিয়া নিজের পাঞ্জাবি নিয়ে হুজুরের পিছনে রওনা হলেন। অন্ধকার অনেকটাই কেটে গিয়েছে, চারদিকে আলো ফুটে উঠছে, তাই লণ্ঠন ছাড়া চলতে কষ্ট হচ্ছে না। রাস্তায় উঠলেন দুজন।

হুজুর হাঁটতে হাঁটতে বললেন, "আচ্ছা আপনি সন্ধ্যারাতে জনু কবিরাজের বাড়িয়ে গিয়েছিলেন কেন?"

"দেখতে।"

"কী দেখতে?"

"জনু কবিরাজ কী করে।"

"তো কী দেখলেন?"

"খারাপ জিনিস। দেখলাম জনু কবিরাজ ঘর থেকে বের হয়ে উলঙ্গ হয়ে কাকে যেন সিজদা করছে।"

হুজুর মুচকি হেসে বললেন, "শয়তানকে।"

"শয়তানকে?"

"হ্যাঁ, সে তার নিজের প্রভু হিসেবে শয়তানকে বেছে নিয়েছে। তাই তাকে সিজদা করেছে।"

"যে কেউ শয়তানকে বশ করতে পারে?"

"হ্যাঁ, কালো জাদু যারা করে তারা শয়তানের কোনো একটি ইচ্ছা পালন করে যার ফলে শয়তান কিছু জিন দিয়ে দেয় তাকে। খারাপ জিন আর কি। সেই খারাপ জিনদের পোষার জন্য একটি চুক্তি করে। কেউ যদি সেই চুক্তি নষ্ট করে দেয় তাহলে কালো জাদুকরের সব শক্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং জিনরা মুক্ত হয়ে যায়।"

মসজিদের পুকুরের কাছে চলে এসেছেন তারা। হাফেজ মিয়া পুকুরপাড়ে এসে বললেন, "জনু কবিরাজেরও এমন কোনো কিছু আছে?"

"হ্যাঁ, সারাদিনে জনু কবিরাজ যেখানে বেশি বেশি যায় সেখানে মাটি খুঁড়বেন। মাটির নিচে কোনো বোতল পাবেন। সেটা ভেঙে দিলেই হবে," হুজুর কথা শেষ করেই মসজিদের পাশে দাঁড়িয়ে আজান দিতে লাগলেন।

হাফেজ এটা জিজ্ঞেস করতে পারলেন না যে হুজুর এত কিছু কীভাবে জানেন। যাইহোক, তিনি পুকুরে নেমে অজু করতে লাগলেন। যে করেই হোক গ্রামকে অভিশাপ মুক্ত করতে হবে। তাই তিনি পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে ভাবতে লাগলেন। তবে বসে থাকলে চলবে না। যা করার দ্রুত করতে হবে।

হুজুর আজান শেষ করে হাফেজ মিয়ার দিকে এগিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার সাথে কী ঘটেছে বলুন তো!"

হাফেজ মিয়া কিছুক্ষণ চুপ করে মাথা নুইয়ে ভাবতে লাগলেন। তারপর মাথা তুলে বললেন, "আমি জনু কবিরাজকে দেখতে গিয়েছিলাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। অন্ধকারে টের পেলাম ঘাড়ে কী যেন পড়ল। শুঁড়ের মতো, তাতে আবার লোম আছে। হঠাৎ করে পিছন থেকে কেউ একজন আমাকে খাওয়ার কথা বলল। ব্যাস, ওইখানেই পড়ে গেলাম।"

হাফেজের কথা শুনে হুজুর হা হা করে হাসতে লাগলেন। হুজুরের এমন হাসি হাফেজ মিয়া দেখেননি আগে, বিরক্ত হয়ে তিনি অজু করতে লাগলেন। অজু শেষ করেও দেখলেন হুজুর হাসছেন, তাই মুখ শক্ত করে ধমকের সুরে বললেন, "হাসার কী হলো?"

হুজুর হাসি একটু থামিয়ে টিটকারির সুরে বললেন, "এই সাহস নিয়ে আপনি জনু কবিরাজের বিরুদ্ধে কথা বলবেন?"

হুজুরের কথা শুনে মিইয়ে গেলেন হাফেজ মিয়া। আসলেই তো! এটুকুতেই যদি কুপোকাত হয়ে পড়েন তাহলে জনু কবিরাজকে কী করে শায়েস্তা করবেন? সে তো অনেক বড় জাদুকর। ডজনখানেক জিন তার পকেটে থাকে। হাফেজ মিয়া লজ্জায় মাথা নিচু করে রাখলেন। তিনি থাকতে গ্রামে এত বড় অন্যায়। মেনে নেওয়া যায় না।

হুজুর হাসি থামিয়ে তাঁর পাশে এসে কাঁধে হাত রেখে বললেন, "সূরা ইখলাস পারেন?"

হাফেজ মিয়া মাথা নাড়িয়ে সায় দিলেন। হুজুর তাঁর বাহু ধরে মসজিদের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, "যখনই এরকম ভয় পাবেন তখন সূরা ইখলাস তিনবার পড়ে বুকে ফুঁ দেবেন। আয়াতুল কুরসী পারেন?"

হাফেজ মিয়া মাথা তুললেন, তাঁরা মসজিদের দরজার কাছে চলে এসেছেন। হাফেজ মিয়া এবার মুখ ফুটে জবাব দিলেন, "না।"

হুজুর হাফেজ মিয়ার বাহু ছেড়ে মসজিদের ভিতর পা দিয়ে বললেন, "আয়াতুল কুরসীই একমাত্র আয়াত যা পড়লে শয়তান কাছে আসতে পারে না, শয়তান নিজেই তা স্বীকার করেছে।"

"বলেন কী?" হাফেজ মিয়া অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

হুজুর মুচকি হেসে বললেন, "তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হযরত আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সেই বিখ্যাত কাহিনি শোনেননি?"

"না তো! কী সেটা?"

হুজুর দম নিয়ে বললেন, "হযরত আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, একবার রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ফিতরা সামগ্রী রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করেন। এক রাতে আমি দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় দেখতে পাই যে, এক বৃদ্ধ আসে এবং ফিতরা সামগ্রী হতে কিছু গম চুরি করে পালাতে থাকে। আমি তাকে গ্রেফতার করি এবং বলি যে, তোকে রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে নিয়ে যাব। সে আমাকে আকুতি করে বলে, আমার পরিবার-সন্তানাদি আছে, আমি একজন দরিদ্র-অভাবী ব্যক্তি। অনাহারে এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছি। আজ আমাকে ছেড়ে দিন, আগামীতে এদিকে আর আসব না। তার কাতর কণ্ঠে আমার দয়া হয়। আমি তাকে ছেড়ে দিই।

ভোরে আমি রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার কয়েদির কী অবস্থা? আমি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে বলি, সে ভবিষ্যতে আর আসবে না বলে অঙ্গীকার করেছে এবং অনুনয়-বিনয় করায় আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার বর্ণনা শুনে বলেন, আজ রাতে সে আবার আসবে। হযরত আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলায় আমার বিশ্বাস হয় যে, সে অবশ্যই আসবে। সুতরাং রাতে আমি তার প্রতীক্ষায় থাকি। রাতের শেষ প্রহরে আবার সে আসে এবং কিছু গম উঠিয়ে নেয়। আমি তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলি। সে আবারও আমার কাছে অনুরোধ করে ছেড়ে দিতে এবং বলে যে, তার ছেলেপেলে আছে। অভাবের তাড়নায় সে এ কাজ করতে আসে। আগামীতে আর কখনো এ কাজ করতে আসবে না বলে দৃঢ় অঙ্গীকার করে। তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আমি এবারও তাকে ছেড়ে দিই।

ভোরে রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হলে তিনি আবারও প্রশ্ন করেন, আপনার বন্দীর কী হলো? আমি পূর্ণ ঘটনা আবার ব্যক্ত করি। রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে মিথ্যা বলে। আজ রাতে সে আবার আসবে। হযরত আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তৃতীয় রাতও আমি তার অপেক্ষায় থাকি। সে রাতেও সে আসে এবং সদকার মাল হতে কিছু গম উঠিয়ে নেয়। এ সময় আমি আটক করি এবং তাকে বলি যে, আজ তোকে যেভাবেই হোক রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হাজির করবই করব, আর তোর কোনো ভান করা চলবে না, তোর কোনো আপত্তি শুনব না, তোর কোনো ওয়াদা-অঙ্গীকার মানব না। সে বলে, আজ যদি

আমাকে ছেড়ে দেন, আমি আপনাকে এমন কিছু কালেমা বা বাক্য শিখিয়ে দেব যা সারা জীবন আপনার উপকারে আসবে। আমি বলি, সে কালেমাগুলো কী? সে বলে, রাতে শোয়ার সময় আয়াতুল কুরসী পড়ে নেবেন, আল্লাহ তায়ালা আপনার রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানে ফেরেশতাদের নিয়োগ করবেন এবং রাতে শয়তান আপনার নিকট আসবে না।

এক কথা শুনে আমি তাকে ছেড়ে দিই। ভোর হওয়ার পর আমি রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হই। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার কয়েদির কী খবর? আমি আয়াতুল কুরসীর বরাতে তার কথা উদ্ধৃত করি এবং সমগ্র ঘটনা বর্ণনা করি। তিনি বলেন, 'ছাদাকাকা ওয়া হুয়া কাযিবুন'— আপনাকে সে সত্য কথা বলেছে, আসলে সে মিথ্যাবাদী। অতঃপর তিনি বলেন, হে হযরত আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু! আপনি কি জানেন, তিনদিন যাবৎ আপনার নিকট আগত ব্যক্তি (বৃদ্ধ) কে ছিল? আমি বলি, হে রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার জানা নেই। তিনি বলেন, সে ছিল শয়তান।"

কাহিনি শুনে মুখ হাঁ করে হুজুরের দিকে তাকিয়ে থাকেন হাফেজ মিয়া। হুজুর মুচকি হেসে তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললেন, "চলুন নামাজ পড়ি।"

হাফেজ মিয়া কিছু বললেন না, চুপচাপ মসজিদের ভিতর প্রবেশ করলেন।

মুক্তারপুর গ্রামটা যেন ছবির মতো। যেদিকে চোখ যায় শুধু সবুজের সমারোহ। হরেক রকমের গাছ, গুল্ম, লতাপাতা দিয়ে চারপাশ ভর্তি। মানুষজনও তেমন নেই, অবশ্য এত সকালে মানুষ থাকার কথাও না, যদিও গ্রাম হিসেবে কিছু মানুষ এই সাতসকালে দেখা যাওয়ার কথা।

জাফর খসরুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "মানুষজন কম নাকি গ্রামে?"

খসরু সামনের দিকে চোখ নিবদ্ধ রেখে স্টিয়ারিং হুইল সাবধানে ধরে আছে। ফজর পড়েই বের হয়েছে জাফর, আসলান আর খসরু। রুকন সাহেব একটা গাড়ি দিয়ে দিয়েছেন চলাচলের জন্য। জাফর যদিও রাজি হয়নি কিন্তু রুকন সাহেবের জোরাজুরির কারণে কিছু বলতেও পারেনি। সূর্য উঠার সাথে সাথে রওনা দিয়েছে জাহাঙ্গীরনগর থেকে।

"হ্যাঁ ভাই, বাড়িঘর কম। বড়জোর বিশটা," খসরু জবাব দিল।

আসলান পিছন থেকে বলল, "আচ্ছা এখানে আমাদের কাজ কী? শয়তানের সাথে চুক্তি ভাঙা?"

"হ্যাঁ, জাদুকরকে পেলে আরও ভালো হবে।"

"জাদুকর মানে?" খসরু প্রশ্ন করল।

জাফর খসরুর দিকে তাকিয়ে বলল, "কবিরাজ আর কি।"

"আমাদের গ্রামে এক বড় কবিরাজ আছে, অতসী মারা যাওয়ার আগে ওই কবিরাজের কাছে যেত।"

জাফর অবাক হয়ে বলল, "বলো কী?"

খসরু ব্রেক কষল। জাফর তাকিয়ে দেখল তারা একটি খোলা মাঠে এসে উপস্থিত হয়েছে। খসরু গাড়ি থেকে নেমে বলল, "আপনারাও নামুন। অতসীর বাড়ি নিয়ে যাব।"

মাঠ থেকে সরু একটা রাস্তা ভিতরের দিকে চলে গিয়েছে, সে রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল খসরু। রাস্তা দিয়ে ঢুকতেই কাঁচা রাস্তা ধানি জমির মাঝখান দিয়ে চলে গিয়েছে। এবার কয়েকজনকে দেখল মাথায় ঝুড়ি নিয়ে কাঁচা রাস্তা দিয়ে এদিকে আসছে। ঝুড়িগুলোতে নানা রকমের সবজি।

"খোলা মাঠ, যেখানে গাড়ি রেখেছি সেখানে গ্রামের হাট বসে।" এই বলে খসরু সামনে হাঁটতে লাগল।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেকের সাথে খসরুর দেখা হলো, সে সবাইকে কুশল জিজ্ঞেস করল। হাঁটতে হাঁটতে এবার কিছু বাড়ি দেখতে পেল তারা, অধিকাংশই কাঁচা ঘর। ঘরগুলোর একটির দিকে খসরু যেতে লাগল। এখানে খসরুর বাড়ি।

সে ঘরের কাছে গিয়ে ডাক দিল, "শাহানা! শাহানা!"

খসরুর ডাক শুনে এক মহিলা ছুটে বের হয়ে এক দৌড়ে খসরুর সামনে চলে আসল। জাফর আর আসলানকে দেখে থমকে দাঁড়াল। লজ্জায় তার গাল লাল হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা দিয়ে আঁচল মুখের সামনে টেনে নিল।

খসরু হাসি দিয়ে বলল, "ভাইজান এ আমার স্ত্রী।"

জাফর হেসে সালাম দিল। খসরুর স্ত্রী লজ্জায় কিছু বলতে পারল না। লজ্জা কাটানোর জন্য খসরু বলল, "এ হলো ভাইজান। ঢাকা থেকে এসেছে। নাশতা বানাও।"

খসরুর কথা শুনে মাথা তুলে একটু তাকিয়েই আবার মাথা নিচু করে বলল, "মেহমানদের এনেছেন। একটু বসে যান।"

"তাঁদের কাজ আছে। তুমি পিঠা বানাও, আমি একটু তাদেরকে কাটারি বাড়ি থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।"

"হায় আল্লাহ! এ কী বলছেন? কাটারি বাড়ি যাবেন কেন? জানেন না ঐ বাড়িতে যারা পা দেয় তাদের কপালে শনি ঘোরে?" হঠাৎ করেই মুখ তুলে খসরুকে অভিযোগের সুরে বলল তার স্ত্রী।

খসরু মুচকি হেসে বলল, "এত ভেবো না তো। আম্মা উঠেছেন?"

"জি, রোদে বসে আছেন।"

"আম্মাকে বলো আমি এসেছি। এখন যাই," খসরু কথা শেষ করেই সামনের দিকে হাঁটা শুরু করল।

জাফর পিছনে পিছনে এসে বলল, "আর কতদূর?"

"কাছেই।"

আসলান পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল, "ভাবি ওই বাড়ি নিয়ে কী বোঝাতে চাইল?"

খসরু হেসে বলল, "ও কথায় কান দিয়েন না। গ্রামের মানুষ তো কত কথাই ছড়ায়।"

কেউ কিছু বলল না। রাস্তা পার হতেই একটি বাঁশবাগান, বাগানের ভিতর এখনও অন্ধকার। সূর্যের আলো ভালোমতো প্রবেশ করতে পারছে না। বাগানের মধ্য দিয়ে সরু একটি রাস্তা ভিতরের দিকে চলে গিয়েছে, সেই রাস্তার উপর শুকনো পাতা পড়ে আছে, পা রাখতেই মড়মড় করে সেগুলো ভেঙে যাচ্ছে। চারিদিক কেমন অদ্ভুত নিস্তব্ধ। মনে হচ্ছে অনেকদিন মানুষের পা পড়ে না এদিকে।

"অতসীর কেউ ছিল না। বাপ-মা মারা যাওয়ার পর সে ঢাকা চলে যায়। অনেকদিন আসেনি গ্রামে। হঠাৎ একদিন এক শহুরে বাবু অতসীকে নিয়ে আসল। অতসীর সাথে বাচ্চা ছিল একটা। বাবু অতসীকে অনেক টাকা দিল। গ্রামের মানুষ অতসীকে জায়গা দিল না। এই বাড়ির নাম কাটারি বাড়ি। মালিক ছিল এক হিন্দু। সে যুদ্ধের সময় ভারত চলে গিয়েছিল। এই জায়গা দখল করে খেত ভূঁইয়া। অতসী কীভাবে যেন ভূঁইয়াকে মানিয়ে এই বাড়িতে থাকা শুরু করে। এই বাঁশবাগান পর্যন্ত অতসী কিনে রাখে," বলতে বলতে খসরু বাঁশবাগান পেরিয়ে পলেস্তারা খসানো এক ভাঙা দেয়ালের কাছে এসে দাঁড়াল।

সামনের দিকে তাকিয়ে এক জরাজীর্ণ ভঙ্গুর বাড়ি চোখে পড়ল জাফরের। বাড়িটির দেয়ালগুলোকে শ্যাওলা আর পরজীবি গাছ দখল করে নিয়েছে। খসরু ভাঙা দেয়ালের উপর দিয়ে টপকালো। দেখাদেখি দুজনও পার হলো।

জাফর দেয়ালের ওপাশে নেমেই চিৎকার করে বলল, "আল্লাহু আকবার।"

আসলান কিছু বুঝতে পারল না। জাফর বিড়বিড় করে সূরা পড়তে লাগল। সূরা পড়ে নিজের গায়ে ফুঁ দিয়ে আসলান আর খসরুর গায়েও দিল। আসলান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"এখানেই সম্ভবত চাবিটা আছে।"

"কীসের চাবি?" আসলান পালটা প্রশ্ন করল।

"তারিনের মুক্তির," বলেই জাফর খসরুকে ডিঙিয়ে সামনে হাঁটতে লাগল।

পুরানো একটি দোতলা বাড়ি। উপরতলার পুরোটাই ভেঙে পড়ে গিয়েছে। কার্নিশ ঘেঁষে কিছু দেয়াল মাত্র অবশিষ্ট রয়েছে। বাড়ির সামনে একটি খোলা

বারান্দা। বারান্দার ছাদের অনেক জায়গা ফেটে পলেস্তারা ভেঙে আছে, ফেটে আছে। দেখে মনে হচ্ছে এক্ষুণি বুঝি মাথার উপর পড়বে।

"খসরু, এই বাড়ির ছোটখাটো একটা বর্ণনা দাও তো," জাফর বলল।

"উপরতলায় তো কিছু নেই। নিচতলায় ছয়টি রুম। তিনটি রুম সামনে আর তিনটি পিছনে। বাসার ভিতরের কোনোকিছু চুরি করতে চোর বাকি রাখেনি। ভিতরে আসুন," বলেই খসরু একটি ভাঙা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল।

অন্য দুজনও পিছনে পিছনে ঢুকল। স্যাঁতসেঁতে একটা গন্ধ নাকে লাগছে, সূর্যালোকও ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না তাই এরকম গুমোট হয়ে আছে সবকিছু। জাফর ব্যাগ থেকে টর্চ বের করে বলল, "সোজা সে রুমে নিয়ে যাও যেখানে সে তার মেয়েকে খুন করেছে।"

খসরু হাত বাড়িয়ে বলল, "টর্চ আমার হাতে দিয়ে পিছন পিছন আসুন।"

খসরু সে রুম পার করে অন্ধকার আরেকটা রুমে ঢুকল। সেখান থেকে বিচ্ছিরি গন্ধ আসতে লাগল। তিনজনেই সহ্য করতে না পেরে নাক চেপে ধরল। খসরু যত ভিতরে যাচ্ছে ততই সবকিছু অন্ধকার, গুমোট আর অসহ্য হয়ে উঠছে। টর্চ ধরে ধরে যাচ্ছিল সে। হঠাৎ করেই যেন তার চোখের সামনে একটা ছায়া পড়ল। সে দাঁড়িয়ে গেল। পিছনে দুজন হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার উপর। সে নিচে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলাল।

খসরুর কাঁধে হাত রেখে জাফর নিজের পতন ঠেকাল। বিরক্ত হয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

খসরু কিছু না বলে সে বরাবর টর্চ ধরল। কিছু নেই। চোখে ভুল দেখেছে নিশ্চয়ই।

"না, তেমন কিছু না," খসরু আমতা আমতা করে বলল।

জাফর কিছু বলল না। খসরু এই রুমের শেষে এসে একটা দরজার দিকে টর্চ ধরে বলল, "এই রুমে মেয়ের গলা কেটে তাকে মাটিতে রেখে নিজে ফাঁস নেয়।"

"কী?" অস্বাভাবিক গলায় চিৎকার দিয়ে বলল জাফর।

আসলান আর খসরু কিছুই বুঝতে না পেরে জাফরের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। জাফর দেরি না করে খপ করে টর্চটা হাত থেকে কেড়ে নিল। খসরুর গলা ধরে পিছনে টান দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, "বের হও এক্ষুণি।"

দুজনে কিছু বুঝল না। জাফর বাইরের দিকে ছুটতে ছুটতে জোরে সূরা পড়তে লাগল, দুজনেই অনুসরণ করতে লাগল, জাফর বের না হওয়া অবধি

চিৎকার করে সূরা পড়তে লাগল। বাড়ির বাইরে এসে সূরা থামিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল জাফর।

আসলান আর খসরু দুজনেই কেমন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। জাফর শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "আচ্ছা, অতসীর মেয়ের মাথাটা লাশের সাথে ছিল?"

"না," খসরু জবাব দিল।

জাফর চোখ বুজে বলল, "আল্লাহ রহম করুন," চোখ খুলে খসরুর দিকে তাকিয়ে বলল, "পাঁচ-ছয়জন কাজের লোক পাওয়া যাবে, যারা মাটি খুঁড়তে পারবে?"

"মাটি খুঁড়ব কেন?" খসরু তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করল।

জাফর ঘড়িতে দেখল দশটা বাইশ বাজে। ঘড়ি থেকে চোখ সরিয়ে বলল, "অতসী তার মেয়ের মাথাটা কোথাও পুঁতে রেখেছে। সেটা তুলে যদি জানাজা দিয়ে দাফন না করি তাহলে এই জাদু ভাঙা সম্ভব নয়। অতসী নিজের মেয়েকে কোরবানি করেছে শয়তানের নামে আর তার মেয়েই চুক্তি হিসেবে কাজ করেছে।"

খসরু কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "পুলিশ এই বাড়ির আনাচে-কানাচে খুঁড়ে দেখেছে, কোথাও মাথাটা পায়নি।"

"কী!" বিস্ফারিত গলায় জাফর বলল।

"হ্যাঁ।"

জাফর বিড়বিড় করে বলল, "সুফিয়া! সুফিয়া!"

"আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে সে মাথা অন্য জায়গায় পুঁতেছে," আসলান বলল।

খসরু চট করে জবাব দিল, "চলুন।"

"কোথায়?" জাফর জিজ্ঞেস করল।

"বিলের পাড়। অতসীর পুরানো বাড়িতে।"

"এবার কোদাল নিও।"

"হ্যাঁ, বাড়ি হয়ে যাব। বড় বড় সাতজন ভাতিজা আছে। তাদেরকে নিয়ে যাব," এই বলে খসরু হাঁটা শুরু করল।

তিনজন হেঁটে দেয়াল পার করে বাঁশবাগানে মধ্য দিয়ে হাঁটতে লাগল। তাদেরকে যে একটি ছায়া নিভৃতে অনুসরণ করছে তা তারা টের পেল না। ছায়াটির অন্ধকার চোখ রক্ত পিপাসায় একটু পরপর চিক চিক করছে।
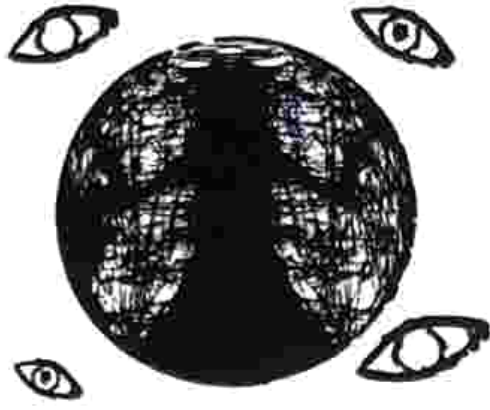
সারারাত শহিদ হোসেনের সাথে ছিল রফিক। রাতে ঠিক করে ঘুম হয়নি যার ফলে মাথাটা ঝিমঝিম করছে। রাতে বাড়িতে থাকার ইচ্ছে ছিল রফিকের কিন্তু ভয়ে বাড়িতে ফেরার সাহস হয়নি। হাসপাতালে যে আরামে ছিল, তাও কিন্তু নয়। একা থাকেনি। সারারাত চোখ পাকিয়ে এক লোককে নিজের সাথে রেখেছে। লোকটা শহিদের দলের লোক। আগে কখনো দেখেনি। পাওয়া গিয়েছে তাকে সেটাই বড় কথা। না হয় ভয়েই মরে যেত রফিক।

কী হচ্ছে সেসব কিছুই সে বুঝতে পারছে না। তার আজকাল মনে হচ্ছে এই পরিবার থেকে দূরে থাকলেই মঙ্গল, কিন্তু তা-ও পারছে না। যখনই যাওয়ার জন্য মনস্থির করছে, তখনই বিবেক বারবার খোঁচা দিচ্ছে তাকে। কঠিন সত্য হলো তার এই পরিবার ছাড়া কেউ নেই। এই সত্যের কারণেই সে কোথাও যেতে পারছে না। তাছাড়া রফিক নিমকহারাম নয়। এই পরিবারের নুন খেয়েছে, তার প্রতিদান দিয়ে যাবে।

দুই কাপ চা খেয়েছে এই অবধি, তবুও মাথা ধরাটা কমল না। পেটের ভিতর এখনও কিছু পড়েনি, পড়েনি বললে ভুল হবে কিছু ঢোকেনি। গিয়েছিল হোটেলে, সর-চিনি দিয়ে পরোটাও নিয়েছিল। খেতে পারেনি, খাবারটা যেন অসহ্য হয়ে গেল। অথচ কেউ মরলেও তার লাশের পাশে বসে খাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে রফিকের।

খাবারের সাথে সম্পর্কটা দুঃখ কিংবা কষ্টের না, আত্মার। আত্মা যখন কষ্টে থাকে তখন মানুষ খেতে পারে না। মনে কষ্ট নিয়েও মানুষ খেতে পারে, কিন্তু আত্মা যখন দুঃখ বিলাসে ব্যস্ত থাকে মানুষ বাইরে থেকে মরে যায়। খাওয়াদাওয়াসহ অন্যান্য কিছু তার আয়ত্তের বাইরে চলে যায়।

হোটেল থেকে সাজেদের জন্য খাবার নিয়ে নিয়েছে। হাসপাতালের গেটের সামনে এসেই লম্বা করে একটা শ্বাস ফেলল রফিক। এই ছোট একটা জিনিস যেটা মানুষের জন্ম এবং মৃত্যুর সবচেয়ে বড় সাক্ষী। আল্লাহ তায়ালার কী কুদরত, তার কাছে যে ফিরতে হবে এটা বোঝানোর জন্য হয়তো তিনি রোগশোক সৃষ্টি করেছেন। যার ফলে একজন সুস্থ মানুষ একজন মুমূর্ষু মানুষকে দেখে শিক্ষা নিতে পারে তাকেও একদিন যেতে হবে। হঠাৎ করে কোনো মৃত্যু এলে হয়তো মানুষ জীবনের মায়া বুঝতে পারে না, সময় কী জিনিস বুঝতে পারে না। হাসপাতাল কিংবা বিছানায় কাতরাতে থাকা ব্যক্তিই বুঝতে পারে সময়ের মূল্য, সুস্থ থাকার মূল্য।

রফিক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে। তার পা চলছে না, একরকম টেনেই তুলছে নিজেকে। হলওয়ে পার করে সোজা রুমে ঢুকে গেল। সাজেদ তারিনের হাত ধরে বসে আছে। তারিনের হাতে স্যালাইন লাগানো, তা শেষ হওয়ার পথে।

রফিক যে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তা সাজেদ খেয়াল করেনি। রফিক আলতো করে সাজেদের কাঁধে হাত রাখল। সাজেদ মাথা ঘুরিয়ে রফিকের দিকে তাকাল। রফিক কিছু বলার আগেই সে চট করে দাঁড়িয়ে রফিককে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, "ভাইজান, আমাকে মাফ করে দাও। তুমি আর তারিন ছাড়া আমার কেউ নেই। তারিনের...তারিনের অবস্থা ভালো না ভাইজান।"

ভাইজান!

সাজেদ রফিককে ভাই বলে স্বীকৃতি দিল অবশেষে? রফিকের চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। সাজেদকে শক্ত করে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরল। রফিক আর সাজেদ সৎভাই। তাদের বাবা দুই বিয়ে করেছিল। দ্বিতীয় স্ত্রীর ছেলে সাজেদ। সাজেদ জন্ম নেওয়ার আগেই তার বাবা তালাক দিয়ে রফিকের মায়ের সাথে সংসার করতে শুরু করেছিল।

সাজেদের মা হাল ছেড়ে দেয়নি, নিজের স্বামীর গ্রামেই জমি কিনে ঘর তুলে থাকতে শুরু করেছিল। সাজেদকে নিয়ে কষ্ট করে বাঁচতে শুরু করল। আস্তে আস্তে সাজেদ আর রফিক বড় হলো, তাদের মধ্যে দূরত্বও বাড়তে লাগল। দেখা গেল দুজনের প্রায় অনেক বছর কথা হয়নি। সাজেদ লেখাপড়ায় ভালো ছিল, রফিক ছিল উল্টো। সে টো টো করে বেড়াত। অবশ্য তার পিছনে তাদের বাবারও অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। বড় ছেলেকে লাই দিয়ে সেভাবেই তৈরি করেছে।

সাজেদ ঢাকা এসে টিউশনি করে লেখাপড়া করে ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করতে লাগল। ব্যবসার ব্যাপ্তি বাড়ার সাথে সাথে রাজনৈতিক প্রতিপত্তিও বাড়তে লাগল সাজেদের। সাজেদের বিয়ে হলো এমপির মেয়ের সাথে, যে পরে প্রতিমন্ত্রী হলো। তারপর ব্যবসার ব্যপ্তি আরও কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেল তার।

এদিকে সাজেদের মা মারা গেল। রফিকের মা আর বেশিদিন বাঁচেনি, মা মারা যাওয়ার কয়েকদিন পর বাবাও চলে গেল। বিয়ে করে খুব সুখী ছিল রফিক, কিন্তু সেটাও আর টিকল না। বাচ্চা জন্ম দেয়ার সময় রফিকের স্ত্রী মারা গেল। তারপর রফিকের অধপতন শুরু হলো। জুয়া আর মদের আড্ডায় বাবার থেকে পাওয়া সব সম্পত্তি খোয়াল। ঠিক তখনি সাজেদ হাজির হলো, প্রস্তাব দিল তার সাথে থাকতে।

রফিক রাজি হলো কারণ তার কাছে মদ খাওয়ার টাকা ছিল না। আস্তে আস্তে সাজেদের ডান হাত হয়ে উঠল রফিক। মদ আর জুয়ার নেশাও চলে গেল। এত বছর সাজেদের মুখে ভাইজান ডাক শোনেনি রফিক। আজ ভাইজান ডাক শুনে রফিকের ভিতর কেমন যেন এক প্রশান্তি বয়ে গেল।

রফিক সাজেদের পিঠে হাত রেখে বলল, "কাঁদছ কেন? তারিন ঠিক হয়ে যাবে। আমি আছি তো তোমার সাথে। মনে রেখো, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তোমার ভাই তোমার হাত ছাড়বে না।"

দুই ভাই অনেকক্ষণ কাঁদল। দুজনের মনে জমে থাকা এতদিনের ক্ষোভ আর অভিমান সব যেন চলে গেল। সাজেদ নিজেকে শান্ত করে বলল, "বাবার কী অবস্থা?"

"আগের মতোই। তারিনের কথা ভেবো না। জাফরের উপর ভরসা রাখো। ডাক্তার দেখিয়ে তো তেমন লাভ হবে না। এই অবস্থায় আমাদের সবচেয়ে বড় ভরসার জায়গা এখন জাফর।"

সাজেদ চোখের পানি মুছে বলল, "জাফর ভাইকে আজ সকালেও ফোন দিয়েছি। ফোন যাচ্ছে না। আমার অতীতের একটা পাপ এত বড় হয়ে দাঁড়াবে তা আমি ভাবিনি।"

রফিক নিরুত্তর। সাজেদ রফিকের দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা তুমি যখন অতসীকে তার বাড়িতে দিয়ে এসেছিলে তখন কি তার সাথে কোনো বাচ্চা দেখেছ?"

রফিক অবাক হয়ে বলল, "আরে না। বাচ্চা কোত্থেকে আসবে?"

"জাফর ভাই জিজ্ঞেস করল। তার কথা শুনে বুঝলাম অতসীর মেয়ে ছিল।"

"নটি না ঐ মেয়ে? কোন লোকের বাচ্চা পেটে ছিল তা তুমি কীভাবে বলবে?"

রফিকের কথায় মাথা নাড়িয়ে সায় দিল সাজেদ। রফিক খাবারের ব্যাগটি এগিয়ে দিয়ে বলল, "খেয়ে নাও। কাল থেকে তো কিছু খাওনি।"

"তুমি খেয়েছ?"

"হ্যাঁ," নিসংকোচে মিথ্যা বলে ফেলল রফিক।

সাজেদ দাঁড়িয়ে নিজের পাঞ্জাবি ঠিক করতে করতে বলল, "আমি বাবাকে দেখে আসছি আর পার্টির লোকদেরও সামলে আসছি। তুমি তারিনের সাথে থাকো," কথা শেষ করে তারিনের দিকে তাকিয়ে রফিককে বলল, "খবরদার এক মুহূর্তের জন্যও ওকে চোখের আড়াল করবে না।"

রফিক মাথা নেড়ে সায় দিল। বের হয়ে গেল সাজেদ। রফিক খাবারের ব্যাগটা র‍্যাকের উপর রেখে চেয়ারটা টেনে নিয়ে দূরে বসল। চোখ বুজে চিন্তা করতে লাগল। কপালের উপর চিন্তার রেখা দেখা গেল। তারিন চোখ খুলে মুচকি হেসে তা দেখতে লাগল।
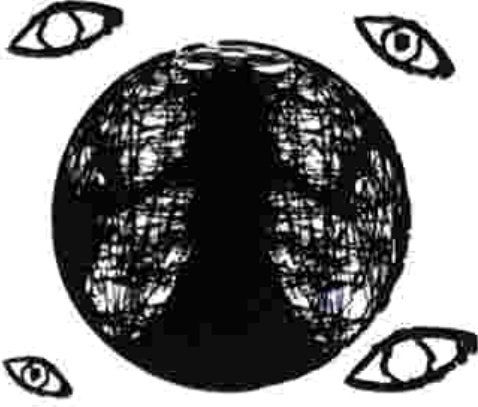
মাথার উপর রোদ, তপ্ত দুপুর, তবে আশার ব্যাপার হলো শোঁ শোঁ করে বয়ে যাওয়া বিলের বাতাস। খসরু সত্যিই নিজের সাত ভাতিজাকে জুটিয়ে ফেলল। সবাই শক্তসমর্থ, একদম খসরুর মতো। বিলের পাড়ে সারি করে ছোটখাটো একটা কলোনি। সবগুলো ঘর ছন দিয়ে বানানো। খসরু একের পর এক ঘর পার করে চলে যাচ্ছে। লোকজন বের হয়ে খুব উৎসুক হয়ে তাদের দেখছে।

আসলানের গলা জ্বলছে। খসরুর স্ত্রী পুলি পিঠা বানিয়েছে। কম করে হলেও দশটি পিঠা খেয়েছে আসলান। এতদিন পর পিঠা দেখে লোভ সামলাতে পারেনি সে, যদিও জাফর মাত্র তিনটি পিঠা খেয়েছে। অবশ্য এই বয়সে কম খাওয়াই উচিত, কিন্তু আসলানের বয়সটাই হলো খাওয়া-দাওয়ার।

আসলান হাঁটতে হাঁটতে জাফরকে জিজ্ঞেস করল, "কাটারি বাড়ি থেকে ছুটে এলাম কেন?"

"ওইখানে গিয়ে মারা পড়তাম নাকি!" চট করে জবাব দিল জাফর।

আসলান হাঁটা থামিয়ে মুখে এক রাশ বিরক্তি নিয়ে বলল, "আমাদের আবার কে মারবে?"

আসলানের প্রশ্ন শুনে জাফরও থেমে গেল। খসরু ঠিকই সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।

"ওখানে অনেক খারাপ জিন ছিল, কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই আমরা সেখানে গেলে আমাদের মেরে তক্তা বানিয়ে ফেলত। আমরা এখানে কিছু না পেলে সেখানে যাব, অবশ্য অনেক ব্যবস্থা করে যেতে হবে," জাফর জবাব দিয়ে দ্রুত হেঁটে খসরুকে ধরল।

আসলান অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। জাফরের মতো লোকও জিনকে ভয় পায়! বিশ্বাস হলো না তার। এদিকে জাফর আর খসরু হেঁটে অনেক দূর চলে গেল। আসলানও আর অপেক্ষা না করে ছোট একটা দৌড় দিয়ে জাফর আর খসরুকে ধরল। তিনজন চুপচাপ হাঁটতে লাগল সামনের দিকে।

খসরু একটা ছনের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে ইশারা করে বলল, "এটাই অতসীর বাবার বাড়ি ছিল।"

ঘরটা তেমন বড় না, ছোট একটা কুঁড়েঘর। বড়জোর পাঁচ গজ প্রস্থ হবে আর সাত থেকে আটগজ লম্বা। ঘরের অবস্থা তেমন ভালো না, ছন পচে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। চারপাশ ফাঁকা। জাফর ঘরে ঢুকল, পায়ের নিচে বালির আস্তরণ। বালি হাতে নিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন পড়ল। পড়া শেষ করে বালিটা উড়িয়ে দিল।

ঘর থেকে বের হয়ে নির্দেশ করল, "খুঁড়ুন।"

খসরু নিজে কোদাল নিয়ে আগে ঢুকল তারপর হাঁক দিল, "আগে আমার সাথে তিনজন আয়।"

রফিকের তিন ভাতিজা ঢুকে পড়ল। প্রচণ্ড রোদের তাপে মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। জাফরের মাথায় টুপি থাকায় কিছুটা রক্ষা পাচ্ছে কিন্তু আসলান মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খসরুর ভাতিজারা প্রতিক্রিয়াহীন। খসরু কিছুক্ষণ খুঁড়ে বের হয়ে আসল। তার বদলে আরেকজন ঢুকে পড়ল।

ইতোমধ্যে লোকজন এসে জড়ো হতে শুরু করল। এক সর্দার ধরনের বৃদ্ধ এসে খসরুকে জিজ্ঞেস করল, "কী খসরু মিয়া? কী হচ্ছে?"

জাফর আর আসলানকে দেখিয়ে খসরু বলল, "এরা পুলিশ। ঢাকা থেকে এসেছে। অতসী আর তার মেয়ের খুনের তদন্ত করতে।"

লোকটা মিইয়ে গেল, আর কিছু বলল না। এ দেখে আসলান মুচকি হাসল। পালাক্রমে খসরুর ভাতিজারা মাটি খুঁড়ছে। অনেক সময় চলে গেল। যোহরের আজানের শব্দ ভেসে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে। জাফর হতাশ হয়ে যাচ্ছে, ধৈর্যের সীমাও চলে যাচ্ছে। আসলানও নানা অঙ্গভঙ্গি করে বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগল, শুধু বিরক্ত হলো না খসরু আর তার গ্রামের লোকেরা, আগ্রহ নিয়ে সবকিছু দেখছে।

"চাচা!" হঠাৎ করে ভিতর থেকে আওয়াজ আসল।

তিনজন কুঁড়েঘরের দিকে তাকাল। খসরু কিছু বলার আগেই জাফর ছুটে গেল। হাঁটু ধরে নুইয়ে নিচের দিকে তাকাল সে। চারদিকে ধুলো উড়ছে। ধুলো থেকে বাঁচতে বাম হাত দিয়ে মুখ ঢাকতে ভুলল না। পুরো জায়গাটা প্রায় হাঁটু

সমান খুঁড়ে ফেলেছে সবাই। একজন ভাতিজা একটা ছোট বাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে তার উপর কোদাল ঠেকিয়ে রেখেছে।

জাফর ব্যাগ থেকে গ্লাভস বের করে ঐ ছেলের দিকে বাড়িয়ে বলল, "এগুলো পরে বাক্সটা তুলে আমার হাতে দাও।"

ছেলেটি গ্লাভস পরে নিল। ইতোমধ্যে একজন গিয়ে বাক্সের পাশের মাটিগুলো সরিয়ে দিয়েছে। ছেলেটি আস্তে করে বাক্সটা তুলে জাফরের হাতে দিল। জাফরও হাতে গ্লাভস পরে নিল। বাক্স নিয়ে বাইরে বের হয়ে আসল জাফর। আসলানও এগিয়ে আসল। চারকোণা ছোট লোহার একটি বাক্স ছোট একটি তালা দিয়ে আটকানো।

জাফর বাক্সটা মাটিতে রেখে বলল, "তালা ভাঙার জন্য কিছু নিয়ে এসো আর কেরোসিনের ব্যবস্থা করো।"

খসরু সাথে সাথে ওই বৃদ্ধকে বলল, "নিয়ে আসুন।"

বৃদ্ধ তার কাছে দাঁড়ানো এগারো-বারো বছরের এক ছেলেকে বলল, "নিয়ে আয়।"

ছেলেটি দৌড় দিয়ে চলে গেল। আসলান ঝুঁকে বলল, "এটা কী?"

"খুললেই বুঝব।"

ছেলেটি একটি হাতুড়ি আর এক বোতল কেরোসিন নিয়ে এসে বৃদ্ধের হাতে দিল, বৃদ্ধ জাফরের দিকে এগিয়ে দিল, সে হাতুড়ি নিয়ে তালার উপর ছোট করে আঘাত করতেই একটা আওয়াজ করে তালা খুলে গেল।

জাফর ঢাকনাটা খুলল, ভিতরে থাকা সমস্ত কিছু এবার তার আর আসলানের চোখের সামনে, তাদের উপর দিয়ে খসরুও সব দেখতে লাগল।

বাক্সের ডান পাশের দেয়াল ঘেঁষে ছোট একটি কাগজ মুড়িয়ে লাল সুতো দিয়ে বাঁধা, তার পাশেই একটি কাঠের পুতুল, পুতুলটির গায়ে অসংখ্য পেরেক। পুতুলটির পাশে এবং সবার শেষে একটি কাপড়ের গুচ্ছ, যেটার মধ্যে অসংখ্য গিঁট দেওয়া।

জাফর সূরা নাস, ফালাক্ব, ইখলাস এবং আয়াতুল কুরসী পড়ে নিজের শরীর বন্ধ করে নিল, তারপর আসলান আর খসরুকে বলল, "সবাইকে বলো দূরে চলে যেতে আর তোমরা তিনবার করে সূরা নাস, ফালাক্ব, ইখলাস আর আয়াতুল কুরসী পড়ে দুই হাত মুঠ করে ফুঁ দাও তারপর দুই হাত দিয়ে শরীর মাসেহ করো।"

খসরু দাঁড়িয়ে তার এক ভাতিজাকে নির্দেশ দিয়ে বলল, "তোরা সবাইকে নিয়ে এখান থেকে সরে যা।"

ভাতিজারা বিনা বাক্যব্যয়ে কথা মেনে নিল। সবাইকে কয়েক সেকেন্ডে প্রায় বিশ গজ দূরে নিয়ে যায়। কেউ যাতে বাড়িটার কাছে আসতে না পারে, সেজন্য তারা সামনে দাঁড়িয়ে রইল মানবপ্রাচীরের মতো। জাফর বুঝতে পারল, লোকবলে খসরুর অনেক ক্ষমতা, তাই কেউ টুঁ শব্দ করারও সাহস পায় না। ইতোমধ্যে আসলান আর খসরু জাফরের কথামতো নিজেদের শরীর বন্ধ করে নিল।

জাফর খসরুকে বলল, "একটি পাতিলের ব্যবস্থা করো। সে পাতিলে পানি নিয়ে এসো।"

খসরু তার এক ভাতিজাকে ডাক দিয়ে পানি আনতে বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যে সেই ভাতিজা একটা পানিভর্তী পাতিল নিয়ে আসে। এবার জাফর সূরা নাস আর ফালাক পড়তে লাগল। প্রথমে কাপড়ের গুচ্ছটা তুলে নিল, সূরা নাস আর ফালাক্ব পড়ে ফুঁ দিল কাপড়ের উপর, তারপর এই সূরাগুলো পড়তে পড়তে একটা একটা গিঁট খুলল। গিঁট খুলে কাপড়টি পানিতে ফেলে দিল। তারপর একই পদ্ধতিতে পুতুলটি তুলে নিল, সূরা পড়তে পড়তে পেরেকগুলো খুলে পানিতে রাখল, আস্তে আস্তে সবগুলো পেরেক তুলে নিল, এবার পুতুলটি দেখা যাচ্ছে। পুতুলটির রং নষ্ট হয়ে গেলেও লাল রঙের জবা ফুলের নকশাটি রয়ে গিয়েছে। সে পুতুলটিও পানিতে রেখে দিল।

দূর থেকে আজানের শব্দ ভেসে আসছে, জাফর নিজের কাজ থামিয়ে আজানের জবাব দিল, আজান শেষ হতেই সবার শেষ কাগজের টুকরোটা তুলে নিল। দোয়া পড়ে সুতো খুলে পানিতে রেখে কাগজটি খুলে পড়ছে। চারকোণা ছোট একটি চিরকুট। কাগজটা হলুদ হয়ে গিয়েছে, ছোপ ছোপ দাগও পড়েছে।

পড়া শেষ করে জাফর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা সাজেদের পরিবারের উপর রহম করুন।"

আসলান পিছন থেকে বলল, "কী হয়েছে?"

জাফর সূরা পড়ে কাগজটা পানিতে রেখে বলল, "একটা জিনের গোত্রকে নিয়োজিত করা হয়েছে সাজেদকে ক্ষতি করার জন্য। গোত্রটি মূলত মারিদদের হলেও তাদের দলপতি হুমা নামের এক ইফ্রিত জিন। আমি এগুলো নষ্ট করলে হুমা মুক্তি পাবে কিন্তু তার স্ত্রী মুক্তি পাবে না। গোত্রের অর্ধেক মারিদ তার অনুগত আর বাকি অর্ধেক তার স্ত্রীর।"

"তাহলে এখন উপায়?" আসলান প্রশ্ন করল।

"হাশেম নামের ব্যক্তিকে দরকার।"

খসরু ভ্রু উপরে তুলে বলল, "হাশেম?"

"হ্যাঁ, সে হুমা আর অতসীর মাঝখানে দালাল হিসেবে কাজ করে। সে-ই জানে হুমার স্ত্রীর চুক্তি কোথায় রাখা আছে।"

খসরু বলল, "হাশেম আর কেউ না, আমাদের জনু কবিরাজ। তার পুরা নাম হাশেম আলী জনু।"

জাফর চমকে উঠে বলল, "বলো কী?"

খসরু মাথা নাড়িয়ে সায় দিল। জাফর পাতিলের দিকে তাকিয়ে বলল, "আগে এগুলোকে নষ্ট করে নিই তারপর জনু সাহেবকে এক হাত দেখে নেব।"

জাফর সূরা আরাফের ১১৭-১২২ নম্বর আয়াত, ইউনুসের ৮১-৮২ নম্বর আয়াত, ত্বহার ৬৯ নম্বর আয়াত এবং সূরা নাস তিনবার তিনবার করে ছয়বার পড়ে নিল, তারপর পানিতে ফুঁ দিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সে। তারপর আসলানকে বলল, "কিছু ছন নিয়ে এসো তো।"

আসলান দৌড়ে গিয়ে অতসীর বাবার ঘর থেকে কিছু ছন নিয়ে আসল। জাফর ছনগুলো মাটিতে বিছিয়ে সেগুলোর উপর পাতিল থেকে তুলে এক এক করে পুতুল, কাপড়, কাগজ আর পিনগুলো রাখল, তারপর কেরোসিন ঢেলে দিল। নিজের পকেট থেকে গ্যাস লাইটার বের করে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বলল, "চলো নামাজ পড়ে আসি।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে সমস্ত কিছু পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল, আর পেরেকগুলো পুড়ে কালো হয়ে গেল। খসরু নিজের ভাতিজাদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে জাফরদের নিয়ে গ্রামের মসজিদের দিকে রওনা হলো।
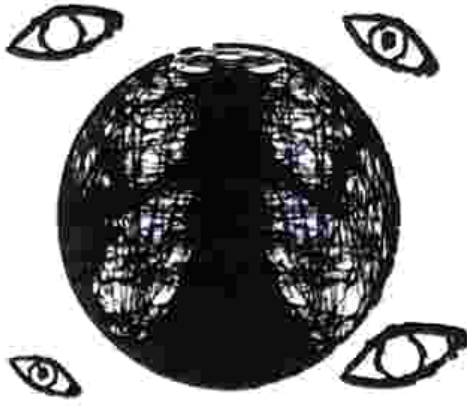
চোখ লেগেই গিয়েছিল রফিকের, এমন সময় পিছন থেকে একজন ডাক দিয়ে বলল, "স্যার আপনাকে একটু রিসিপশনে আসতে হবে।"

রফিক চমকে উঠে চেয়ার থেকে পড়ে গেল। পতন ঠেকানোর জন্য হাত পেতেছিল ঠিকই কিন্তু কোনো লাভ হলো না, দুই হাতের কবজিতেই ব্যথা পেল। চেয়ার ছিটকে কোমরের উপর পড়ল। ডানদিকের কোমরের চামড়া একটু ছিলে গেল। মুখ বাঁকিয়ে একটু আর্তনাদ করল রফিক।

নার্স দৌড়ে এসে চেয়ার তুলে বলল, "স্যার আপনি ঠিক আছেন? "

রফিক নিজেকে সামলে ময়লা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, "আমি ঠিক আছি। আপনি যান।"

নার্স চলে গেল। হাত মালিশ করতে করতে তারিনের দিকে তাকাল। তারিন এখনও ঘুমিয়ে আছে। রফিক হাত ডলতে ডলতে রিসিপশনে গেল। যে মেয়েটি তাকে খবর দিতে গিয়েছিল সে মেয়েটি সেখানে বসে মাথা নিচু করে একটি রিপোর্ট দেখছে।

রফিক জিজ্ঞেস করল, "কী কাজ?"

মেয়েটি মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, "জি স্যার?"

"কী জন্য খবর দিয়েছেন?"

মেয়েটি মুখ হাঁ করে বলল, "স্যার আমি তো খবর দিইনি।"

রফিক অবাক হলো, এই মেয়েটি একটু আগে তাকে খবর দিল, আর এখন তা অস্বীকার করছে। রফিক ধমক দিয়ে বলল, "মজা করছেন আমার সাথে? "

রফিকের ধমক শুনে মেয়েটি তাজ্জব বনে গেল। চেঁচামেচির শব্দ শুনে কোত্থেকে যেন এক লোক হাজির হয়ে মেয়েটিকে বলল, "কী হয়েছে ফারজানা?"

মেয়েটি লোকটিকে বলল, "স্যার আমি এখানে বসে কাজ করছি আর তিনি বলছেন আমি নাকি তাঁকে খবর দিয়েছি।"

লোকটি রফিকের দিকে তাকিয়ে বলল, "তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখুন আপনার রোগী কোথায় গিয়েছে।"

লোকটির কথা রফিক বুঝতে পারল না তাই হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি এবার ধমক দিয়ে বলল, "আরে ভাই দাঁড়িয়ে না থেকে যা বলেছি তা করুন। আপনি ওদিকে দেখুন, আমি এদিকে দেখছি।"

কথা শেষ করে লোকটি বাইরের দিকে দেখতে লাগল, রফিকও দেরি করল না, এক দৌড়ে কেবিনে আসল। ছুটে এসে দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়াল সে। এ কী! তারিন নেই, বিছানা শূন্য। তারিন কোথায় গেল! দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে রিসিপশনের দিকে তাকাতেই লোকটিকে ছুটে আসতে দেখল।

লোকটি দৌড়ে এসে কেবিনের ভিতরটা দেখে রফিককে বলল, "ছাদে চলুন।"

রফিক কিছুই বুঝতে পারল না। লোকটি দৌড় দিয়ে ছাদের দিকে যেতে লাগল, রফিকও অনুসরণ করল, লোকটি উঠে গেল ছাদে। রফিক ছাদে উঠতেই দেখল লোকটি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। সে লোকটির দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনে তাকাল।

এ কী!

তারিন ছাদের রেলিংয়ের উপরে উঠে হাঁটছে আর গুনগুন করে কী যেন বলছে। রফিক এগোতে যাবে ঠিক এমন সময় খপ করে লোকটি তার হাত ধরে মুখের উপর আঙুল দিয়ে চুপ থাকতে বলল। তারিন রেলিংয়ের উপর দিয়ে এপার থেকে ওপার দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছে, অথচ কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে তা প্রায় অসম্ভব। রেলিংয়ে স্টিলের পরিবর্তে রড লাগানো, খুব চিকন রড, এই রডের উপর দিয়ে তারিন হাঁটছে।

লোকটি আস্তে আস্তে সামনে যেতে লাগল। রফিক দাঁড়িয়ে রইল। লোকটি মাথা নিচু করে এমনভাবে গেল যেন তারিনের নজরে না আসে, কিন্তু লাভ হলো না। হাঁটা থামিয়ে লোকটির দিকে তাকিয়ে এক বীভৎস হাসি দিল তারিন। লোকটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল আর হাসি দেখে ভয়ে কেঁপে উঠল রফিক। এত অপার্থিব আর বীভৎস হাসি কোনো মানুষের মুখে দেখতে পায়নি সে।

এক...দুই...তিন...বলে তারিন আবার রেলিংয়ের উপর দিয়ে হাঁটতে লাগল। লোকটি ভয়ে পিছিয়ে এলো। রফিকের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল, "কাল রাতেও এমন হয়েছে।"

রফিক জবাব দিল না, আস্তে আস্তে সামনে এগিয়ে গিয়ে ডাক দিল, "তারিন!"

এতই আস্তে ডাক দিল যে রফিকের বিশ্বাস এই ডাক মুখের ভিতরই হারিয়ে গিয়েছে। এরপর জোর গলায় ডাক দিল, "তারিন!"

তারিন হাঁটা থামিয়ে রফিকের দিকে তাকাল। তারিনের চোখ দিয়ে আগুন জ্বলছে। জান্তব দৃষ্টি দিল রফিকের দিকে। সে কেঁপে উঠল। রফিক একটা ঢোক গিলে বলল, "এখানে কী করছ?"

তারিন কোনো জবাব দিল না।

রফিক আবার জিজ্ঞেস করল, "তারিন, এই দুপুরে এখানে হাঁটছ কেন?"

তারিন এবারও নিরুত্তর, এক দৃষ্টিতে রফিকের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে রফিকের ভিতরে কী আছে সেটা বোঝার চেষ্টা করছে সে। রফিক জানে না সে এখন কী করবে, কিন্তু তাকে যেকোনো মূল্যে তারিনকে বাঁচাতে হবে, না হয় সাজেদের সামনে সে দাঁড়াতে পারবে না।

রফিক এবার জোর গলায় বলল, "তারিন, মাহা তোমার জন্য..."

কথা শেষ হওয়ার আগেই তারিন রফিকের উপর থেকে চোখ সরিয়ে আকাশের দিকে তাকাল, মনে হলো তারিন কিছু বোঝার চেষ্টা করছে। ঠিক কয়েক সেকেন্ড পর আজানের শব্দ আসল। তারিন কেঁপে উঠে। রফিক দেখল তারিন রেলিংয়ের উপর দাঁড়িয়ে মৃগী রোগীর মতো কাঁপছে, কিন্তু নিচে পড়ছে না। তা-ও স্থায়ী হলো না, রফিক দেখল তারিন নিচে হেলে পড়ে যাচ্ছে, ঠিক এমন সময় সে লাফ দিয়ে তারিনের গলার কাছের জামা ধরে ফেলল। তারিনের দুই পা শূন্যে ঝুলছে আর সে অচেতন হয়ে আছে।

পিছনের লোকটিও এক দৌড় দিয়ে এসে তারিনের ডান হাত উপরে তুলে ধরল। রফিক জামা ছেড়ে তারিনের বাম বাহু ধরে ফেলল, তারপর দুজনে আস্তে আস্তে তারিনকে উপরে তুলল। লোকটি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "স্যারের কোন ফোন পেয়েছেন?"

রফিক বুঝতে পারল না কোন স্যারের কথা বলছে। লোকটি আবার বলল, "জাফর স্যার ফোন করে কোনো খবর জানিয়েছে?"

রফিক মাথা নেড়ে না করল। লোকটি তারিনের পা ধরে উপরে তুলল, রফিক দুই বাহু ধরে একটু নিচে নামাল, তারপর দুজনে আস্তে আস্তে করে তারিনকে নিচে নামাল। তারিনের ওজন যেন বেড়ে গিয়েছে তাই দুজন পুরুষও হাঁপাচ্ছে এখন। কয়েক সেকেন্ড বিরতি নিয়ে কেবিনে নিয়ে গেল তারিনকে। তারিনকে কেবিনে শুইয়ে দিয়ে দুজনেই হাঁপাতে লাগল, লোকটি হাঁটু ধরে বসে হাঁপাতে লাগল আর রফিক স্যালাইনের স্ট্যান্ড ধরে।

লোকটি দম নিয়ে বলল, "একা রেখে কোথাও যাবেন না, যদি যাওয়ার দরকার হয় দরজায় দাঁড়িয়ে কাউকে ডাক দেবেন। আমি উঠি। নতুন তালা কিনে ছাদে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করতে হবে।"

রফিক কিছু বলল না। লোকটি হাঁপাতে হাঁপাতে রুম থেকে বের হয়ে গেল। রফিক খেয়ালই করল না যে তারিনের বুক উঠানামা করছে।

মসজিদে তালা লাগাতে লাগাতে হাফেজ মিয়ার বুক থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এলো। আজও শুধু তিনি আর হুজুর নামাজ পড়ছেন। হুজুর ফজরের পর থেকেই কুরআন মজিদ নিয়ে বসে সূরা পড়তে থাকেন, একদম দুপুর অবধি পড়েন, তারপর নামাজ পড়ে আবার চুপচাপ চলে যান তবে যাওয়ার আগে কিছু বলে যান।

আজকে নামাজের পর হুজুর রিযিক নিয়ে কয়েক মিনিট কথা বললেন। পাপ রিযিককে কমিয়ে দেয় এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকেও দূরে ঠেলে দেয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার নৈকট্য লাভের মাধ্যমেই নিয়ামত অর্জন করা সম্ভব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার বিরোধী কাজ করলে তার থেকে নিয়ামত অনেক দূরে চলে যায়। নিয়ামত শুধু থাকা আর খাবারের জায়গা নয়, মসজিদে এসে সিজদা দিতে পারা নিয়ামত, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়াও নিয়ামত, সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো পাপ থেকে দূরে থাকতে পারা।

কোনো জনপদে বিপদ যখন আসে তখন কোনো একজন ব্যক্তির উপর আসে না, সমস্ত জনপদের উপর আসে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সূরা হাদীদের ২২ নম্বর আয়াতে বলেছেন, "পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর বিপদ আসে না।"

হুজুর এই কথা বলে চুপচাপ চলে গেলেন। হাফেজ মিয়া বুঝতে পারলেন এই গ্রামের মানুষ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত। নিয়ামত পাওয়ার জন্য এই গ্রাম থেকে আস্তে আস্তে সব পাপ তুলতে হবে, সবার আগে কুফরী বন্ধ করতে হবে। জনু কবিরাজকে যে করেই হোক শায়েস্তা করতে হবে। তাই তিনি সকাল থেকেই জনু কবিরাজকে অনুসরণ করছেন, এই গ্রামকে জনু কবিরাজের থাবা থেকে মুক্ত করতে হবে, তবেই সবাই মসজিদে ফিরে আসবে।

দুপুরের খাবার খেয়েই এসেছেন হাফেজ মিয়া। মসজিদে তালা লাগিয়ে পুকুর পাড়ে আসতেই দেখলেন রাস্তা দিয়ে তিনজন এদিকে এগিয়ে আসছে। তারা কাছে আসতেই হাফেজ মিয়া একজনকে চিনতে পারলেন, রমিজ উদ্দিনের ছোট ছেলে খসরু। তার সাথে আরও দুজন আসল। দুজনের একজনের বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হবে, পরনে তার ফুল হাতা শার্ট, গাল ভর্তি দাড়ি আর মাথায় টুপি। আরেকজন অল্প বয়স্ক, ছিমছাম দেহের একজন যুবক, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

বয়স্ক লোকটা কাছে এসেই সালাম দিল, "আসসালামু আলাইকুম।"

হাফেজ মিয়া জবাব দিলেন। লোকটি মসজিদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার ঘর কি তালা দেওয়ার জিনিস নাকি?"

লোকটির প্রশ্নে একটু লজ্জা পেলেন হাফেজ মিয়া। লজ্জা নিবারণের ব্যর্থ চেষ্টা করে বললেন, "মসজিদে গ্রামের মানুষ তেমন আসে না। আমি আর হুজুর ছাড়া কেউ নামাজ পড়ে না তাই তালা দিয়ে রাখি।"

হাফেজ মিয়ার কথায় লোকটি অবাক হয়ে বলল, "এত বড় গ্রাম অথচ দশ-বারোজন নামাজ আদায়কারী নেই?"

লোকটির কথায় হাফেজ মিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তাদেরকে বুঝাতে বুঝাতে আমি ক্লান্ত," তারপর মুখ শক্ত করে বললেন, "গ্রামের উপর একটা আপদ আছে। সেটি দূর করতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

হাফেজ মিয়ার কথায় তিনজন কোনোকিছুই বুঝতে পারল না। জাফর খসরুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমাদের বাড়িতে এক ডজন পুরুষ আছে আর তোমরা কেউ নামাজ পড়ো না?"

খসরু জবাব দিল না। জাফর মুখ শক্ত করে বলল, "তুমি কি জানো, যে ব্যক্তি ইচ্ছে করে এক ওয়াক্ত নামাজ ছেড়ে দেয় সে কাফির?"

খসরু নিশ্চুপ। জাফর আবার মুখ শক্ত করে বলল, "রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মুসলমান আর কাফিরের মধ্যে পার্থক্য হলো নামাজ ছেড়ে দেওয়া।' যে কুফরী করে সে কাফির। আর কাফিররা বিনা হিসেবে জাহান্নামী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা সূরা মুদাসসিরের ৪২-৪৩ নাম্বার আয়াতে বলেছেন, 'কোন জিনিস তোমাদেরকে সাকার (জাহান্নাম)-এ নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমার নামাজ আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। শুধু একা একা নামাজ পড়লে হবে না, নামাজ কায়েম করতে হবে। মনে রেখো তোমার অধীন কেউ যদি এক ওয়াক্ত নামাজ না পড়ে তার দায়ভার তোমার উপর

বর্তাবে। এই উম্মাহর মধ্যে সবচেয়ে দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নামাজ পড়ে না। পাঁচ ওয়াক্তের ফরজ নামাজগুলো পড়তে এক ঘন্টাও লাগে না আর তাতেই তোমাদের এত আলস্য। আফসোস তোমাদের জন্য। মুসলিম হয়ে জন্মেছ ঠিকই কিন্তু মুসলিম হয়ে থাকতে পারোনি। এখন বুঝবে না, যেদিন হাশরের মাঠে দাঁড়াবে, ফেরেশতারা শিকল দিয়ে বেঁধে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন তখন বুঝবে নামাজ কী জিনিস।"

কথা শেষ করে জাফর দম নিয়ে বলল, "তওবা করে আজ থেকে নামাজ পড়া শুরু করো। মনে রেখো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার যিকিরেই হৃদয় প্রশান্ত হয়। দুনিয়ার কোনো কিছু তোমাকে সুখ দিতে পারবে না। তুমি সুখী হলেও খুব কম সময়ের জন্য হবে, বাকিটা সময়ে অস্থির থাকবে। দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুর প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার লা'নত তাই দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু তোমাকে টেনশন দেবে। বাজার থেকে যদি তুমি শুঁটকি মাছও কিনে নিয়ে আসো, ঘুমানোর আগে এই তুচ্ছ জিনিসও তোমাকে ভাবাবে। মনে রাখবে, তোমার মনে যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার যিকির না থাকে তাহলে তোমার পাশে কেউ নেই। আর যদি মনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার যিকির রাখতে পারো দুনিয়ার অন্য কিছু তোমার দরকার নেই।"

কথা শেষ করে জাফর পুকুরের দিকে চলে গেল অজু করার জন্য, খসরু মাথা নিচু করে চলল জাফরের পিছন পিছন, আসলান ঠাঁয় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কত ওয়াক্ত নামাজ বাদ দিয়েছে তার হিসাব নেই। তার ভিতরটা কেঁপে উঠল। চোখ থেকে এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। সকালের তীব্র রোদ সহ্য করতে পারেনি, হাশরের ময়দানে সূর্য যখন মাথার সাথে লেগে থাকবে তখন তা কীভাবে সহ্য করবে? আসলান মনেমনে ক্ষমা চেয়ে পুকুরে গেল অজু করতে।

হাফেজ মিয়া নির্বাক। এই লোক যা বলল তা শুনে হাফেজ মিয়ার নিজের শরীরের লোম দাঁড়িয়ে গেল। লোকটি অজু সেরে এসে হাফেজ মিয়াকে বলল, "তালাটা খুলে দিন।"

হাফেজ মিয়া তালা খুলে দিলেন, লোকটি মসজিদে ঢুকে নামাজে দাঁড়াল, তাকে অনুসরণ করতে বাকি দুজনও গেল। হাফেজ মিয়া পুকুড়পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালেন। পুকুরের পানিতে তাঁর প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছে। তিনি তালাটি পুকুরে ছুড়ে মারতেই প্রতিবিম্ব মিলিয়ে গেল। তাঁর কাজ এখন জনু কবিরাজকে সরানো, আজ তিনি জনু কবিরাজকে শায়েস্তা করবেনই।
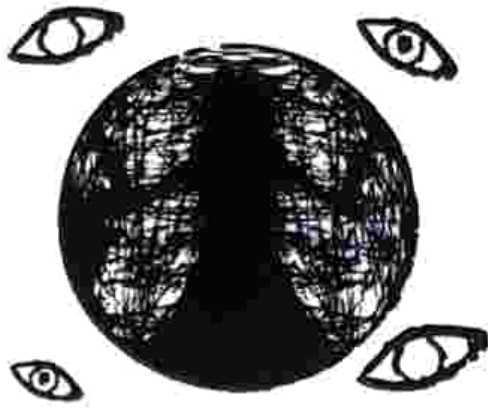
অ্যাম্বুলেন্সটি ছুটে চলছে ঢাকা মেডিকেলের দিকে। তারিনের শ্বাসটান উঠেছে, প্রতিটা শ্বাসের সাথে সে মাছের মতো খাবি খাচ্ছে, মুখের অক্সিজেন মাস্কও যেন কাজ করছে না। তার হাত ধরে সাজেদ কাঁদছে। কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। সব ক্ষমতা প্রয়োগ করেও তারিনের জন্য কিছু করতে পারছে না। মানুষ কতটা অসহায় সে এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। উপরওয়ালা চাইলে মুহূর্তের মধ্যে মানুষের অবস্থা পরিবর্তন করতে পারেন। আর সেই মানুষের কি না এত অহংকার? এত চাহিদা?

দুপুরে হাসপাতালে ফিরেই দেখে সবাই ছোটাছুটি করছে। রফিক ছুটে এসে বলল তারিনের অবস্থা ভালো না, শ্বাসটান উঠেছে। সাজেদ দেরি করেনি, সাথে সাথে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যায়। তার শ্বশুর সেখানেই ভর্তি।

অ্যাম্বুলেন্স ঢাকা মেডিকেলের সামনে থামতেই রফিক দৌড় দিয়ে নেমে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে চলে গেল। সেখান থেকে একটা স্ট্রেচার নিয়ে এসে দরজা খুলল অ্যাম্বুলেন্সের। সাজেদ নেমে গেছে। দুজন লোক উঠে তারিনকে নামিয়ে নিয়ে গেছে। সাজেদ আর রফিক তাদের পিছন পিছন গেল। তারিনকে নিয়ে ডাক্তাররা ব্যস্ত। নার্সরাও ছোটাছুটি করছে।

সাজেদের সেদিকে যাওয়ার সাহস হলো না। তারিনের মৃত্যু সে মেনে নিতে পারবে না। এই ভয়ে এখন সে ঠান্ডা মাথায় কিছু ভাবতে পারছে না। তার স্বাভাবিক কাজগুলোও কেমন অস্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। নিজের প্রাণ যখন আরেকজনের দেহে থাকে তখন তার মৃত্যুতেই নিজের আত্মার মৃত্যু ঘটে। তাই নিজের থেকে অন্য কাউকে ভালোবাসা মোটেও উচিত নয়। এই পৃথিবীতে কেউ কারো নয়। সাজেদ দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল আর জোর করে চিন্তাভাবনাগুলোকে এক করার চেষ্টা করল।

রফিক সাজেদের কাঁধে হাত রেখে বলল, "ভেবো না, তারিনের কিছু হবে না।"

সাজেদ জবাবে কিছু বলল না। রফিক ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের কাছে যেতেই একজন ডাক্তার চেঁচিয়ে বলল, "তার ফুসফুসে পানি চলে এসেছে। আপনারা কোথায় রেখেছিলেন তাকে?"

কোনো পরীক্ষা না করে ডাক্তার কীভাবে বুঝল সেটাই রফিকের বোধগম্য হলো না। অবশ্য তারিনকে যে ডাক্তার দেখছে তার বয়স কম করে হলেও সত্তর হবে, মাথার সবগুলো চুল পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে। গালের চামড়ায় ভাঁজগুলো খুব বেশি। এই বয়সে ডাক্তাররা অবসরে চলে যায় অথচ সে রোগী দেখছে। হয়তো তার অভিজ্ঞতার আলোকেই বলছে তারিনের ফুসফুসে পানি চলে এসেছে।

রফিক বলল, "আজ কয়দিন যাবৎ এমন। একটা প্রাইভেট ক্লিনিকে রেখেছি।"

"হ্যাঁ, আমরা তো কিছুই পারি না। ক্লিনিকেই রাখতেন, এখানে কেন নিয়ে এলেন?" ডাক্তার খোঁচা দিয়ে বলল।

"এই মেয়ে প্রতিমন্ত্রী শহিদ হোসেনের মেয়ে আর এমপি সাজেদের স্ত্রী।"

রফিকের কথা শুনে চুপ হয়ে গেল ডাক্তার। আর কিছু বলল না, তারিনকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তারিনকে ইনজেকশন আর স্যালাইন দিয়ে বলল, "তাকে দেশের বাইরে নিয়ে গেলে ভালো হবে। আমাদের যতটুক সম্ভব আমরা করব কিন্তু কিছু পরীক্ষা আছে যেগুলো এদেশে করা সম্ভব না, বাইরে নিতে হবে।"

"আপনাদের যা করার তা করুন। কাল-পরশু আমরা বাইরে নিয়ে যাব," রফিক এ কথা বলতেই ডাক্তার তারিনকে নিয়ে চলে গেল। যেতে যেতে বলল, "লাইফ সাপোর্টে রাখছি আপাতত।"

রফিক কিছু বলল না। সাজেদ হাসপাতালের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে। রফিক বলল, "বাইরে নিতে হবে তারিনকে।"

সাজেদ রফিকের দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু বলল না। রফিক সাজেদের পাশে বসে বলল, "ওর ফুসফুসে নাকি পানি চলে এসেছে। আরও অনেক সমস্যা। ডাক্তার বলছে বাইরে নিয়ে যেতে।

"জাফর সাহেব আজ বা কাল চলে আসবে। তুমি মাদ্রাজ কিংবা অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো।"

রফিকের কথায় সন্তুষ্ট হলো সাজেদ। দাঁড়িয়ে কিছু না বলেই বের হয়ে গেল। রফিকও পকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে লাগাল। সিগারেট খেত না সে, কিন্তু গতরাতেই শহিদকে পাহারা দিতে গিয়ে অনেক সিগারেট পুড়িয়েছে, যেগুলো বেঁচে গিয়েছে সেগুলো আজ পোড়াতে হবে।

দুপুরের খাবার খেতে জাহাঙ্গীরনগর যেতে হলো। না গিয়েও উপায় ছিল না। খসরুর প্রতি রুকন সাহেবের কঠোর নির্দেশ আছে। জাফর যদিও যেতে রাজি হয়নি, কিন্তু খসরুর জোরাজুরি অগ্রাহ্য করার শক্তিও ছিল না তার, অবশ্য খসরু যে সময় নষ্ট করেছে তা-ও না, খুব দ্রুত গাড়ি চালিয়ে জাহাঙ্গীরনগর এসেছে।

রুকন সাহেব লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি রেডি করে রেখেছিলেন। জাফর, খসরু আর আসলানকে গোসল করে নিতে নির্দেশ দিয়ে নিজেও গোসল সেরে এসেছে। হলরুমে মাথা নিচু করে বসে আছে। আসলান গোসল সেরে গামছা দিয়ে চুল মুছতে মুছতে দোতলার বারান্দায় এসে দেখে জাফর মাথা নিচু করে কী যেন ভাবছে। আসলানের মাথায় সেই কখন থেকেই একটা কথা ঘুরছে।

সুফিয়া!

সুফিয়া কে তা জিজ্ঞেস করতে হবে। আসলান মাথা মুছতে মুছতেই নিচে নামল। আসলানের পায়ের শব্দ শুনে জাফর তাকাল।

আসলান বলল, "সুফিয়া কে?"

জাফর ভ্রু কুঁচকিয়ে বলল, "একে আবার কোথায় পেলে?"

"আপনি যখন অতসীর বাড়ি গিয়েছিলেন তখন এটা বলেছিলেন," আসলান মুচকি হেসে জবাব দিল।

জাফর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি এত আগের কথা মনে রেখেছ?"

"আমার স্মৃতিশক্তি ভালো," আসলান মুচকি হেসে বলল।

জাফর মাথা নিচু করে বলল, "এটি এক ধরনের কালো জাদু।"

"সুফিয়া! অদ্ভুত নাম তো!" খানিকটা ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে আসলান বলল।

জাফর খোঁচাটা ঠিকই টের পেল, কিন্তু কিছু বলল না। আসলান এখনও অনেক ছোট, তার সবকিছু সহজভাবে নিতে অনেক সময় লাগবে।

জাফর মুচকি হেসে ছোট করে জবাব দিল, "হ্যাঁ।"

"কালো জাদু কীভাবে করে?" আসলান চট করে প্রশ্ন করল।

জাফর আসলানের দিকে এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "এটা জানা কি জরুরি?"

আসলান মুচকি হেসে বলল, "জানলে ক্ষতি নেই। বলে ফেলুন।"

জাফর মুখ ফিরিয়ে বলল, "নানানভাবে।"

আসলান প্রশ্ন করল, "কী কাজ? কিছু এঁকে মন্ত্রপাঠ করা? না শ্মশানে বসে দুর্বোধ্য ভাষায় মন্ত্র পাঠ করা। তারানাথ তান্ত্রিকের মতো?"

আসলানের কথায় রসিকতা টের পেয়েও জাফর সেদিকে পাত্তা না দিয়ে উত্তর দিল, "সেরকম কিছু নয়। আবার সেরকম কিছুও।"

"সেগুলো কী?"

জাফর আসলানের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, "তাহলে তো লম্বা লেকচার শুনতে হবে তোমাকে।"

আসলানও মুচকি হেসে বলল, "আমি বিন্দুমাত্র বিরক্ত বোধ করব না ইনশাআল্লাহ।"

"তাহলে শোনো," ঠোঁটদুটি চেটে নিয়ে জাফর আবার শুরু করল, "কালো জাদু করতে গেলে অনেক নিকৃষ্ট পাপ করতে হয়। এই পাপগুলো কুফরী। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, পবিত্র কুরআন বাথরুমের জুতো হিসেবে ব্যবহার করা, উল্টো করে পবিত্র কুরআনের সূরা লেখা, পায়ের নিচে সূরা লিখে বাথরুমে যাওয়া, অজু ছাড়া নামাজ পড়া, শয়তানের নামে কোরবানি করা, ইনসেস্ট, শয়তানের ভাষায় কিছু লেখা ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো করে একজন সাহির শয়তানের সান্নিধ্য লাভ করে। তারপর শয়তানি কাজগুলো করে। জঘন্য কাজগুলো না করে কেউ শয়তানের সান্নিধ্য পায় না। শয়তান তাদের কাছে তখন ঈশ্বররূপে হাজির হয়। তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার বদলে শয়তানের প্রভুত্ব স্বীকার করে। যার ফলে শয়তান তাকে মোহাবিষ্ট করে ফেলে এবং তার মনের সাময়িক চাহিদা পূরণ করে।"

আসলান মনোযোগ দিয়ে সব শুনল।

আসলান আবার প্রশ্ন করল, "সেই শয়তান দিয়ে সব কাজ করানো যায়?"

আসলানের প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ চোখ বুজে নিঃশ্বাস নিল। নিজের হাত দুটো বুকের উপর ভাঁজ করে নিয়ে অনেকটা ক্লান্ত স্বরে বলতে লাগল, "সিহর অনেক রকমের হয়। একেকটি সিহরের জন্য আলাদা আলাদা শয়তান নিয়োজিত। সবচেয়ে ভালো শ্রেণিবিন্যাস করেছেন ওয়াহিদ বিন আব্দেসসালাম বালি তার লিখিত *সোর্ড এগেইন্সট ব্ল্যাক ম্যাজিক অ্যান্ড ইভিল ম্যাজিশিয়ানস* বইতে।" কয়েক সেকেন্ড থেমে জাফর আবার বলল, "যেখানে প্রায় আট ধরনের সিহরের কথা উল্লেখ আছে। সেগুলো হলো—

প্রথমত, বিবাহ বিচ্ছেদের সিহর। যেটি সর্বাধিক ব্যবহৃত সিহর। আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি এই সিহর করা হয়। যার ফলে স্বামী-স্ত্রীতে দ্বন্দ্ব লেগে যায়। এমনকি সে দ্বন্দ্ব খুনোখুনি পর্যন্ত গড়ায়।

দ্বিতীয়ত, সিহরুল মাহাব্বা বা ভালোবাসার মানুষকে পাওয়ার জন্য সিহর। এই সিহরও আমাদের দেশে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। আমরা সাধারণত বাংলা ভাষায় একে বলি তাবিজ করা। গ্রামে-গঞ্জে এটি অনেক দেখতে পাওয়া যায়।

তারপর বাকিগুলো হলো, সিহরুত তাখিল বা বিভ্রম সৃষ্টির সিহর, সিহরুল জুনুন বা পাগল করার সিহর, সিহরুল খুমুল বা অলস করার সিহর, সিহরুল হাওয়াতিফ বা খারাপ স্বপ্ন আর অডিটোরি হ্যালুসিনেশন সৃষ্টি করার সিহর, সিহরুল মারাদ বা অসুস্থ করার সিহর, সিহরুন নাজিফ বা অনিয়মিত মাসিক করার সিহর, সিহরুর রাবত বা বন্ধ্যা করার সিহর।"

আসলান ভাবত জাফর এই বিষয়ে অনেক জ্ঞানী, এখন দেখা যাচ্ছে জাফর ওস্তাদ। অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। ডাক্তার হয়ে এই বিষয়ে জ্ঞান অবাক করার মতো। আধুনিক বিজ্ঞান যেখানে ঝাড়ফুঁককে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়, সেখানে একজন ডাক্তার হয়ে এই ঝাড়ফুঁক বিষয়ে এত অধিক জ্ঞান রাখা অবাক করার মতোই বিষয়।

"কিন্তু সুফিয়া কী তো এখনও বললেন না!" আসলান আবার প্রশ্ন করল। জাফর দীর্ঘশ্বাস ফেলবে ঠিক এমন সময় রুকন সাহেবের গলা শোনা গেল, "খেতে এসো।"

জাফর আসলানের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়েছেন।"

"মুক্তারপুরে যেতে যেতে শুনব। কোনো সমস্যা নেই," আসলান ফিক করে হেসে ফেলল।

খাবার টেবিলে এসে দেখে বিশাল আয়োজন। এত আয়োজন যে তা দিয়ে পঞ্চাশ থেকে ষাটজন মানুষ খাওয়ানো যাবে। খাবার দেখে জিভে পানি এসে গেল আসলানের। টেবিলের বসতেই রুকন সাহেব খাবার নেওয়ার জন্য ইশারা করলেন। আসলান দেরি না করে ভাত আর একটা কাতলা মাছের মাথা নিয়ে খেতে শুরু করল।

জাফর প্লেটে কিছু না নিয়ে বলল, "খালাম্মা খাবেন না?"

"এই তো বাবা, আসছি," রুকন সাহেবের স্ত্রী রান্নাঘর থেকে এসে বসলেন।

তিনিও প্লেটে খাবার নিতে শুরু করলেন। জাফর একটু বিরিয়ানি নিয়ে খেল, পাঁচ মিনিটের মতো খেয়ে উঠে গেল।

জাফর দাঁড়াতেই রুকন সাহেব প্রশ্ন করলেন, "এত তাড়াতাড়ি উঠে যাচ্ছ যে? এত কিছু রান্না হলো, বিরিয়ানি ছাড়া তো কিছুই নাওনি।"

জাফর মুচকি হেসে বলল, "আলহামদুলিল্লাহ, পেট ভরে গিয়েছে। তবে পায়েস খাব।"

জাফর হাত ধুয়ে এসে পায়েস নিল। আসলান নেহারি খাচ্ছে, গরুর পা চুষছে। রুকন সাহেবও খাবার শেষ করে একটু পায়েস নিলেন।

এক চামচ মুখে নিয়ে বললেন, "নীরার মায়ের কাছে শুনতাম তুমি খুব পেটুক ছিলে। নীরা অনেক সময় তোমার জন্য রেঁধে নিয়ে যেত আর তুমি নাকি কিছুই ফেরত দিতে না। এখন এই অবস্থা হলো কী করে?"

জাফর মুচকি হেসে জবাব দিল, "বয়স," তারপর আসলানের দিকে ইশারা করলেন। রুকন সাহেব হাহা করে হেসে বললেন, "ঠিক বলেছ।"

তাঁর স্ত্রীও হেসে উঠলেন। আসলান কিছুক্ষণের জন্য তাকিয়ে খাবার বন্ধ করলেও, সেই বিরতি দীর্ঘক্ষণ হলো না। ইলিশ ভাজা নিয়ে খেতে লাগল।

রুকন সাহেব আবার এক চামচ পায়েস মুখে নিয়ে বললেন, "তুমি তো জিন ছাড়াও?"

জাফর মুচকি হেসে বলল, "জি, চেষ্টা করি। বিশেষ করে কালো জাদুতে কেউ আক্রান্ত হলে সেটা।"

"তুমি না ম্যান অভ সায়েন্স, এই অদ্ভুত কাজ কী করে করো।"

রুকন সাহেবের কথায় জাফর কিছুই বলল না, পায়েস খেতে লাগল। রুকন সাহেবের স্ত্রী খাবার শেষ করে বললেন, "আজ কিন্তু আমার হাজব্যান্ড তোমার থেকে গল্প শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।"

জাফর অবাক হয়ে বলল, "গল্প!"

রুকন সাহেব বললেন, "আচ্ছা হারুত মারুতের সাথে নাকি জাদুবিদ্যার সম্পর্ক রয়েছে। আমি এক বইয়ে পড়েছি এক ইহুদী রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাদু করার অপচেষ্টা করেছে। প্রশ্ন হলো জাদুবিদ্যা কি তার আগেও ছিল?"

প্রশ্ন শুনে জাফর খুব দ্রুত পায়েস শেষ করে নিল। এক ঢোক পানি খেয়ে বলল, "জাদুবিদ্যা এই কালের নয়। অনেক পুরানো। এই নিয়ে অনেক কাহিনি গড়ে ওঠে যুগের পর যুগ। আমি সেদিকে না যাই। আমাদের পবিত্র কুরআনে কী আছে তা বলি।"

লম্বা একটা দম নিয়ে জাফর বলতে শুরু করল, "সূরা বাক্বারার ১০২ নাম্বার আয়াতে আছে, 'তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম কুফরী করেননি; বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল।"

"সেটা আমিও জানি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব?" জাফর থামতেই রুকন সাহেব প্রশ্ন করলেন।

জাফর মুচকি হেসে বলল, "আসলে এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ আছে যে, হারুত আর মারুত নামে দুই ফেরেশতা বাবেল মানে ব্যাবিলনে এসেছিলেন জাদু শিক্ষা দেওয়ার জন্য কিন্তু জাদু শিক্ষা দেওয়ার আগে তাঁরা এই বলে সতর্ক করতেন যে, 'আমরা পরীক্ষার জন্য এসেছি; কাজেই তোমরা কুফরী করো না।'

কিন্তু বাবেলবাসী তাদের কথা শুনল না। তারা তাঁদের কাছে আসত এবং তাঁদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যেটা দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারত। তারা ভালোভাবেই জানত যে, যদি কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোনো অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মা বিক্রয় করেছে! ডেভিল প্যাক্ট। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার আদেশ ছাড়া কিন্তু কিছুই হয় না।"

সবার মনোযোগ জাফরের দিকে। আসলানও খাবার ছেড়ে জাফরের কথা শুনছে। জাফর আবার বলতে শুরু করল, "হারুত ও মারুতকে নিয়ে অনেক কাহিনি প্রচলিত আছে। তাঁরা দুজন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার নির্দেশে প্রথম বাবেল শহরে নেমে আসেন। তাফসীর পড়লেই পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। তাফসীরে ইবনে কাসীর, ফাতহুল মজিদে বিস্তারিত আছে। আমি খণ্ডাকারে এসব তাফসীরগুলো থেকে আপনাদেরকে সারমর্ম দিচ্ছি।"

জাফর থেমে গেল, দীর্ঘ একটি শ্বাস নিল, সেটা কিছুক্ষণ ধরে রেখে উপরের দিকে তাকিয়ে ছেড়ে দিল। আসলান তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে এসে বসে পড়ল। জাফর একটু পানি খেয়ে নিল। আসলান বুঝতে পারল জাফর বড় লেকচার দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

জাফর এবার রুকন সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, "তাফসীরে ইবনে কাসীরে, সূরা বাক্বারার ১০২ নম্বর আয়াতের তাফসীরে বলা আছে যে,

হযরত সাঈদ বিন যুবাইর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "শয়তানদের হাতে যেসব জাদু ছিল হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম সেগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে তাদের থেকে নিয়ে তাঁর সিংহাসনের নিচে পুঁতে রাখতেন। শয়তানরা সেখানে যেতে সমর্থ হতো না। মানুষের নিকট তা প্রকাশ পেয়ে গেলে শয়তান তাদেরকে বলল, তোমরা কি জানো, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম কীসের দ্বারা এ রাজ্য পরিচালনা করেন? তারা বলল, হ্যাঁ, তা হলো যা তাঁর সিংহাসনের নিচে পুঁতে রাখা হয়েছে। মানুষ তা বের করল এবং তার ওপর আমল শুরু করল।"

শুধু তাই নয়, হিজাজবাসীরা বলল, 'হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম এ জাদুর দ্বারা রাজ্য পরিচালনা করতেন। তখন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামকে জাদুর অপবাদ থেকে মুক্ত করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন।"

জাফর চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে করতে বলল, "এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'শয়তানরা আকাশে ওহী শুনত। যদি একটি ওহী শুনত তাহলে তার সাথে আরও শত শত মিথ্যা কথা মিশ্রিত করে দিত। তাদের নিকট যা আছে তা নিয়ে আসার জন্য হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম বাহিনী প্রেরণ করলেন। তারা তা নিয়ে এলে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম তা সিংহাসনের নিচে পুঁতে রাখলেন। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার নিকটে প্রত্যাবর্তন করার পর শয়তানরা তা বের করে মানুষকে জাদু শিক্ষা দিল।"

সবাই চোখ বড় বড় করে জাফরের দিকে তাকিয়ে আছে।

জাফর পায়চারি থামিয়ে রুকন সাহেব আর তাঁর স্ত্রীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা ঢোক গিলে বলতে লাগল, "একটি বইয়ের কথা পাওয়া যায়। যেটিকে ঈসায়ীরা 'সলোমনস বুক' বলে। যে বইটিতে কী করে জাদু করে, কী করে শয়তানকে অনুগত করা যায় সেসব লেখা ছিল। সেটি দিয়ে শয়তান মানুষকে

প্রতারিত করত। নিজের বশে নিয়ে নিত মানুষকে। বইটি সে কতিপয় শয়তানের অনুগত পূজারি বা জাদুকরকে দিল। তারা সেগুলো দিয়ে জাদু করত। ফলে মানুষ সঠিক পথ থেকে ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল।"

কয়েক সেকেন্ড থেমে আবার বলল, "আরেকটি তাফসীর শুনাই। তাহলে অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জাদু হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের পূর্ব থেকেই ছিল। কেননা হযরত মুসা আলাইহিস সালামের যুগে অনেক জাদুকর ছিল। আর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের পূর্বের যুগের।' উল্লেখ্য, হযরত হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ ভুল বলেননি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা কিন্তু ঠিকই সূরা আ'রাফের ১১১-১১৩ নাম্বার আয়াতে বলেছেন, 'তারা বলল : 'তাঁকে ও তাঁর ভাইকে কিঞ্চিত অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে (জাদুকর) সংগ্রহকারীদেরকে পাঠাও, 'যেন তারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ জাদুকর উপস্থিত করে।' জাদুকরেরা ফিরাউনের নিকট এসে বলল : "আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো?"

জাফর কথা থামিয়ে সবার দিকে চোখ বুলাল। সবাই নীরব, মনযোগী শ্রোতা। এমন শ্রোতা জাফরের বোরিং লেকচারে পাওয়া খুবই দুর্লভ। সে যখন এ নিয়ে কথা বলতে শুরু করে তখন অনেকে বিরক্ত হয়। নাক সিঁটকে চলে যায়। বলে তথ্যের উপর তথ্য আর রেফারেন্সের উপর রেফারেন্স। অথচ এই বিষয়টা অনেক সেনসিটিভ। মানুষকে না জানালে মানুষ শয়তানের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবে না আর প্রত্যেকটা রেফারেন্স তার অনুসন্ধানের একটি রাস্তা। কিন্তু তাদের দেখে বেশ মনযোগী শ্রোতা মনে হলো।

জাফর আসলানের পাশে এসে বসে আবার বলতে লাগল, "ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, বাবেল শহরের ইহুদীরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার কিতাব এবং তার অঙ্গীকারের কোনো পরোয়া তো করলই না, উপরন্তু শয়তানের অনুসরণ করে তারা জাদুর ওপর আমল করতে লাগল। শুধু তাই নয়; বরং তারা এ দাবিও করল যে, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম কোনো নবী ছিলেন না, তিনি একজন জাদুকর ছিলেন। জাদুর মাধ্যমে তিনি রাজত্ব করতেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলে দিলেন, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম জাদুর মতো নিকৃষ্ট কার্যকলাপ করতেন না। কারণ তা কুফরী কাজ, বরং শয়তান মানুষকে জাদু শিক্ষা দিয়ে কুফরী করেছে।"

"এক সেকেন্ড। একটি প্রশ্ন। সেই কখন থেকে জাদু জাদু করছ। জাদু আসলে কী? ভেলকি, না সত্যি?" জাফরকে থামিয়ে দিয়ে রুকন সাহেব প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন।

কথার মাঝখানে থামিয়ে দিলে যেরকম বিরক্ত হওয়ার কথা ঠিক তেমনটা হলো না জাফর, বরং ভ্রু কুঞ্চিত করে বলতে লাগল, "জাদুর শাব্দিক অর্থ হলো যা গোপন থাকে এবং যার কারণ অত্যন্ত সূক্ষ্ম। পরিভাষায় জাদু বলা হয় এমন সব মন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক, পরিষেধক ও ধোঁয়া সেবনের সমষ্টি, যার কু-প্রভাবে কেউ অসুস্থ হয়, নিহত হয় অথবা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়।

জাদুকে সিহর বলে নামকরণের কারণ হলো জাদুকর অত্যন্ত গোপন ও সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত করে, বিভিন্ন মন্ত্র ও ঝাড়-ফুঁক দিয়ে অথবা এমন বন্ধন দেয় যা সূক্ষ্মভাবে অন্তর ও শরীরে প্রভাব ফেলে। কখনো এই আছর (প্রভাব) অসুস্থ করে ফেলে, কখনো হত্যা করে আবার কখনো স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে।

জাদুর অন্তর্ভুক্ত হলো, স্ত্রীকে স্বামী বিমুখ করা ও স্বামীকে স্ত্রী বিমুখ করা। জাদুর মাধ্যমে স্বামীর কাছে স্ত্রীকে এমনভাবে তুলে ধরা যে, যখনই স্বামী স্ত্রীর কাছে আসে তখনই তাকে খারাপ আকৃতিতে দেখে ফলে স্ত্রী থেকে দূরে সরে যায়।

আরেকটা একদম উপরের সিহরের বিপরীত অর্থাৎ কোনো মেয়ের প্রতি কোনো পুরুষকে আসক্ত করাতে এমনভাবে জাদু করা যে, সে পুরুষ ঐ মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তার কাছে তাকে খুব রূপবতী মনে হয়, যদিও সে মেয়ে কুৎসিত ও কদাকার হয়। অনুরূপভাবে যদি কোনো মহিলাকে এমন জাদুগ্রস্ত করা হয় যে, সে একজন পুরুষকে উত্তম ও সুন্দর মানুষ হিসেবে দেখে যদিও সে লোক কদাকার হয়।"

জাফর থেমে আবার একটু পানি খেয়ে গলা ভিজিয়ে নিল। এতক্ষণ কথা বললে গলা শুকিয়ে উঠা স্বাভাবিক। সে একটা দম নিয়ে বলল, "জাদুর অন্তর্ভুক্ত আরও হলো তাওলা। তাওলা বলা হয় এমন কিছুকে যা জাদুকরেরা তৈরি করে স্বামী অথবা স্ত্রীকে প্রদান করে এটা বিশ্বাস করায় যে, এটা সাথে থাকার কারণে স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি আর স্বামীকে স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট করে তুলবে।"

জাফর থেমে আড়চোখে আসলানের দিকে তাকাল, আসলান মাথা নিচু করে মনোযোগ সহকারে সব শুনছে। রুকন সাহেব আর তাঁর স্ত্রীও জাফরের সব কথা মনোযোগ সহকারে শুনছেন। এরকম মনোযোগী শ্রোতাদের মনোযোগ ভাঙতে চায় না জাফর।

তাই দেরি না করে জাফর আবার বলল, "জাদুর বাস্তব প্রতিক্রিয়া রয়েছে। রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও জাদু করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার ইচ্ছা ছাড়া জাদুর কোনো প্রভাব পড়বে না। জাদু তাওহিদের সম্পূর্ণ পরিপন্থি ও শিরকে আকবর, এর বাস্তবতাকে কার্যকর ও ক্রিয়াশীল করতে হলে শয়তানের নৈকট্য লাভ করতে হয়। শয়তানের নৈকট্য লাভ ছাড়া কোনো জাদুকরই জাদু বাস্তবে রূপ দিতে পারে না। যে ব্যক্তি জাদু করবে, অথবা জাদুবিদ্যা শিখবে বা অন্যকে শেখাবে অথবা এসকল কাজ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করবে বা সন্তুষ্ট থাকবে, সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। কেননা কুফরী কাজে সন্তুষ্ট থাকা আর কাজ করা উভয়ই সমান। ইহুদীরা জেনেশুনেই এসব গ্রহণ করেছে। তাই যে ব্যক্তি এ বিদ্যা অর্জন করবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে তার জন্য কিয়ামতের দিন জাহান্নাম ছাড়া কিছুই নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা এই আয়াতেই বলেন, 'নিশ্চয়ই তারা জ্ঞাত আছে যে, যে ব্যক্তি এ কাজ অবলম্বন করবে, তার জন্য পরকালে কল্যাণের কোনো অংশ নেই।"

রুকন সাহেব গ্লাসে পানি ঢেলে ঢক ঢক করে পান করলেন। মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "আমাদের সমাজে এটা অহরহ। কোনো কিছু হলেই কবিরাজের কাছে চলে যায়। এটা ওটা করে। অথচ এটার শাস্তি কত ভয়াবহ।"

জাফর বলল, "সহীহ বুখারী ২৭৬৬ নাম্বার হাদীসে আছে, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বস্তু থেকে দূরে থাকো।' (ছাহাবায়ে কিরাম রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সেগুলো কী কী?'

তিনি বললেন, 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা, জাদু করা, অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, অন্যায়ভাবে এতিমদের সম্পদ খাওয়া, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং সতীসাধ্বী নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া।' অতএব, জাদুবিদ্যা সম্পূর্ণ কুফরী যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়।"

কয়েক সেকেন্ড থেমে জাফর আবার বলল, "এমনকি নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামকে ভাই বললেন এবং একজন নবী বললেন তখন ইহুদিরা কটাক্ষ করে বলল, 'আশ্চর্যের কথা! হযরত মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামকে নবীদের মধ্যে শামিল করে হক ও বাতিলের মধ্যে সংমিশ্রণ করছেন। অথচ তিনি ছিলেন একজন জাদুকর! কেননা স্বাভাবিকভাবে মানুষ কি বাতাসের

পিঠে সওয়ার হয়ে চলতে পারে?' এই ঘটনা তাফসীরে তাবারীতে উল্লিখিত আছে।"

রুকন সাহেব দুই হাত থুতনির উপর রেখে বলল, "আমরাও জানি যে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম একজন নবী।"

"মূলত, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম যে সত্য নবী এবং তিনি জাদুকর নন, জনগণকে তা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এবং নবীদের মুজিজা ও শয়তানের জাদুর মধ্যে পার্থক্য বোঝানোর জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা হারুত ও মারুত নামে দুজন মালাইকাকে বাবেল শহরে মানুষের বেশে পাঠিয়ে দেন।" কয়েক সেকেন্ড বিরতি নিয়ে আসলানের দিকে তাকিয়ে জাফর হাত নেড়ে বলল, "বাবেল হলো ইরাকের একটি প্রাচীন নগরী, যা ঐ সময় জাদুবিদ্যার কেন্দ্র ছিল। হারুত ও মারুত আলাইহিমাস সালাম সেখানে এসে জাদুর স্বরূপ ও ভেলকিবাজি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে থাকেন এবং জাদুকরদের অনুসরণ থেকে বিরত হয়ে যেন সবাই হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের নবুওয়াতের অনুসারী হয়, সে কথাও বলতে লাগলেন।

আসলে, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের নবুওয়াতের সমর্থনেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে হারুত ও মারুত আলাইহিমাস সালামকে বাবেল শহরে পাঠিয়েছিলেন। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামকে জিন, বাতাস, পাখিদের ও জীবজন্তুর ওপরে একচ্ছত্র ক্ষমতা দান করা ছিল যেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার এক মহা পরীক্ষা। শয়তান ও তাদের অনুসারী দুষ্ট লোকেরা সর্বদা একে বস্তুবাদী দৃষ্টিতে দেখেছে এবং যুক্তিবাদের জালে পড়ে পথ হারিয়েছে। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার নবী হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম সর্বদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করেছেন। আমরাও তাঁর নবুওয়াতের প্রতি দ্বিধাহীনভাবে বিশ্বাস স্থাপন করি।"

জাফর থামল। কথা বলতে বলতে জাফরের কপালে ভাঁজ পড়ে গেছে। জাফরের কথা শোনার পর কান দিয়ে গরম বাতাস বের হতে লাগল আসলানের, ব্যতিক্রম হলো না বাকিদের ক্ষেত্রেও। জাফর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে চারটা পাঁচ বাজে। আসলানের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি নামাজ পড়ো, আমি একটু ঢাকার খবরটা নিয়ে আসি। তারপর জনু কবিরাজের কাছে যাব।"

আসলান মাথা নেড়ে সায় দিল। জাদুবিদ্যা এত পুরানো তা ভাবা যায় না। তাছাড়া তার সাথে এত ঘটনা জড়িত তা-ও জানা ছিল না। অনেক কিছুই জানল

এই কয়দিনে। একসময় যা মিথ ভেবে উড়িয়ে দিত সেগুলো এখন বিশ্বাসযোগ্য হতে লাগল। বিশেষ করে জাফরের সাথে পরিচয় হওয়ার পর।

"আচ্ছা অনেক নাস্তিক এগুলোকে মিথ বলে।" জাফরের কাছ থেকে আরেকটু বিস্তারিত জানার জন্য আসলান খোঁচা দিয়ে প্রশ্ন করল।

জাফর টেলিফোনের দিকেই যাচ্ছিল। প্রশ্নটা শোনার পর ঠোঁটের কোণে একটি হাসি ফুটিয়ে পিছন ফিরে বলল, "এন্টিডিলুভিয়ান বা মহাপ্লাবনের আগের সভ্যতার ইতিহাস হযরত নূহ আলাইহিস সালাম ও তার আগের সভ্যতাগুলোর অতীতের রহস্য খুঁজে বের করার চাবি। এই রহস্যগুলা অতীতের সাথে মরে যায়নি, বর্তমানেও আছে। পৃথিবীতে 'মিথ' বলতে কিছুই নেই। ফ্যাক্ট ইতিহাসে পরিবর্তিত হয়, ইতিহাস হাজার বছর পর কিংবদন্তিতে পরিবর্তিত হয়। সেই কিংবদন্তি আবার হাজার হাজার বছর পর মিথে পরিবর্তন হয়। আমরাও একসময় মিথে পরিণত হবো। এটিই সভ্যতা।"

জাফর বিরতি নিয়ে আবার বলল, "কিন্তু ইসলামে কোনো মিথ নেই। হ্যাঁ, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সমস্ত ঘটনাই সত্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা কিছু সরাসরি বলেছেন আর কিছু কোড করে। আমরা যদি ডিকোড করতে পারি তাহলে বুঝব। বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি রিসেন্ট সেঞ্চুরির আবিষ্কার। কিন্তু পবিত্র কুরআনে তা অনেক আগে বর্ণিত হয়েছে। সূরা আল-কিয়ামাহ এর চার নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেছেন, 'বস্তুত, আমি তার আঙুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনঃবিন্যস্ত করতে সক্ষম।'

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা এই আয়াতের দ্বারা পুনরুত্থানকে নির্দেশ করেছেন। একজন মানুষের আঙুলের ছাপের সাথে আরেকজন মানুষের আঙুলের ছাপ মেলে না। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা ওই আঙুলের অগ্রভাগ বা ফিঙ্গার টিপকেও আবার জাগাবেন। শারীরিক রূপ দেবেন, যাতে যার যেই দেহ সেই দেহই পায়। হাশরের দিনে যেন একজনের দেহের সাথে আরেকজনের দেহের কোনো মিশ্রণ না হয়। আঙুলের অগ্রভাগ যে ইউনিক তা পবিত্র কুরআনে কত বছর আগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেছেন!"

আসলান কিছু বলল না। আসলে বলার মতো কিছু খুঁজে পেল না। তার নিউরনগুলোর মধ্যে ঝড় হচ্ছে। সেই ঝড় সামলাচ্ছে আপাতত। সে জাফরের পাশাপাশি হেঁটে রুমে ঢুকে গেল।

রুকন সাহেবের স্ত্রী চুপচাপ রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন, রুকন সাহেব আড়চোখে জাফরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।
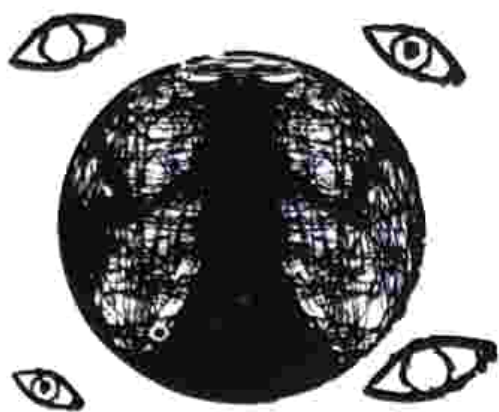
দুপুরের পর থেকে জনু কবিরাজের বাড়ির পিছনে বাঁশঝাড়ে চুপটি করে বসে আছেন হাফেজ মিয়া। মশা কামড়িয়ে দুই পা লাল করে দিয়েছে, কিন্তু আজ এখান থেকে উঠবেন না, সবকিছুর সমাধান করেই ছাড়বেন। দুপুরে জনু কবিরাজ যে ভিতরে ঢুকেছে আর বের হয়নি। আসরের আজান ভেসে আসছে গঞ্জের মসজিদ থেকে। না, আর বসে থাকা যাবে না।

আজান শেষ হতেই দাঁড়িয়ে পড়লেন হাফেজ মিয়া। এদিকে আকাশের অবস্থাও ভালো না। মেঘের আড়ালে সূর্য চলে গিয়েছে। সন্ধে নামার আগেই চারদিকে অন্ধকার নেমে আসছে। হাফেজ মিয়া বাঁশঝাড় থেকে বের হতে যাবেন, এমন সময় দেখেন জনু কবিরাজ ঘর থেকে বের হয়ে বাঁশঝাড়ের দিকেই আসছে। জনু কবিরাজের বাড়ির বামপাশেই বাঁশঝাড়, তা অনেকটাই গহিন, তাই মানুষ ভুলেও এদিক মাড়ায় না। দিন-দুপুরে এদিকে আসলে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায়।

জনু কবিরাজ বাঁশঝাড়ে না এসে বাঁশঝাড়ের সামনে ছোট একটি গর্তের সামনে দাঁড়াল। এখান থেকে মাটি নিয়ে জনু কবিরাজ নিজের বাড়ি উঁচু করেছে। সে ডান হাত দিয়ে কোমরের পিছন থেকে কী যেন বের করে ফেলল। হাফেজ মিয়া ঠিক করে দেখতে পেলেন না তা কী। সে ওটা গর্তে ফেলে দিল, তারপর উপর দিকে হাত দিয়ে কী যেন বলতে লাগল। মনে হচ্ছে যেন দোয়া করছে। দোয়া শেষ করে আবার বাড়িতে ফিরে গেল।

হাফেজ মিয়া বাঁশঝাড় থেকে বের হয়ে সে গর্তের সামনে হাজির হলেন। গর্তের পানি ময়লা। শুকনো বাঁশপাতা পানির উপরে ভাসছে। সেই পাতার

মধ্যেই তিনি একগুচ্ছ কাপড় দেখতে পেলেন। দেখে মনে হচ্ছে মহিলাদের আঁচল। তাহলেই এটাই সে জায়গা যেখানে জনু কবিরাজ তার সবকিছু রাখে।

হাফেজ কী করবেন বুঝতে পারলেন না। এখানে নামাও উচিত হবে না, তার চেয়ে বরং হুজুরের কাছে গেলে ভালো হবে। সেটাই করা যাক। তবে আগে বাড়ি গিয়ে গোসল সেরে নামাজ পড়ে তারপর হুজুরকে সব বলতে হবে।

গর্ত থেকে সরে চুপচাপ রাস্তার দিকে পা বাড়ালেন হাফেজ মিয়া। বাঁশপাতার উপর পা পড়লেই আওয়াজ হয়, তবুও তিনি চেষ্টা করলেন তা এড়ানোর। বাবলা গাছের সামনে আসতেই পিছন থেকে কে যেন গমগমে গলায় ডাক দিল, "থাম।"

ডাক শুনে ভিতরটা কেঁপে উঠল হাফেজ মিয়ার। গলাটা ছিল জনু কবিরাজের। হাফেজ মিয়া পিছন ফিরে বললেন, "কী জনু মিয়া?"

"ভদ্রতা ছাড়, এখানে কী করছিলি?" জনু কবিরাজ চোখ রাঙ্গিয়ে জিজ্ঞেস করল।

হাফেজ মিয়া বুঝতে পারলেন না কী করবেন। জনু কবিরাজের চোখ থেকে যেন আগুন ঝরছে। সে যদি কোন জিন লেলিয়ে দেয় হাফেজ মিয়ার পিছনে? এটা ভেবে পেটের ভিতরটা মোচড় দিল তাঁর। তিনি দ্রুত সূরা ইখলাস তিনবার পড়ে বুকে ফুঁ দিয়ে নিলেন।

"এমনিই তোমার কাছে এসেছিলাম। কিন্তু আজান পড়ে গিয়েছে" মুখে জোর করে হাসি ফুটিয়ে বললেন হাফেজ মিয়া।

জনু কবিরাজ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে মুখ শক্ত করে হাফেজ মিয়াকে দেখছে। সে আবার প্রশ্ন করল, "তোর কাজ মসজিদে, এখানে কী করিস? সত্যি করে বল।"

হাফেজ মিয়ার থেকে জনু কবিরাজ প্রায় পনেরো-বিশ বছরের ছোট। গ্রামের সবাই হাফেজ মিয়াকে সম্মান দিয়ে কথা বলে। এমনকি জনু কবিরাজও কখনো তাঁর সাথে তুইতোকারি করেনি অথচ আজ এমন ব্যবহার করছে। সে কি বুঝে গেল নাকি হাফেজ মিয়া কেন এখানে এসেছে!

"তুমি এইভাবে কথা বলছ কেন?"

"তোর সাথে আমি কীভাবে কথা বলব? তুই এখানে লুকিয়ে লুকিয়ে কী করছিলি তা আগে বল। না হলে তোর কলিজা বের করে খেয়ে ফেলব।"

এবার হাফেজ মিয়াও ক্ষেপে বললেন, "এই শয়তান তুই আমাকে কী করবি? কুফরী কালাম দিয়ে ক্ষতি করবি?"

"বেশি জেনে গিয়েছিস তুই," বলেই জনু কবিরাজ চোখ বুজে কী যেন পড়তে লাগল। পড়া শেষ করে হাফেজ মিয়ার দিকে তাকিয়ে কুৎসিত হাসি দিয়ে বলল, "ধর একে।"

হাফেজ মিয়া দেখলেন জনু কবিরাজের পিছন থেকে তিনটা ছায়া বের হয়ে আসছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী মানবাকৃতি ধারণ করলে যেরকম হয় ঠিক সেরকম। ভয়ে তাঁর পা জমে যাচ্ছে, কিন্তু সেদিনের মতো আজ আর ভয়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করলেন না। পিছন ফিরে ভোঁ দৌড় দিলেন ভূঁইয়া বাড়ির দিকে।

ভূঁইয়া বাড়ির রাস্তার কাছে এসেই দেখলেন একটি গাড়ি থেমে আছে এবং গাড়ির সামনে দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। আরেকটু সামনে যেতেই দুজনকে চিনতে পারলেন। তারা সেই দুপুরের দুজন। এক দৌড়ে গিয়ে তাদের সামনে গিয়ে মাটিতে শুয়ে হাঁপাতে লাগলেন। বয়স্ক লোকটি ঝুঁকে হাফেজ মিয়ার ডান হাত ধরে বলল, "কী হয়েছে?"

হাফেজ মিয়া চোখ বুঝে লম্বা লম্বা শ্বাস নিলেন, বুড়ো বয়সে যদি দৌড় না দিতেন তাহলে অনেক বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেত। তিনি লোকটির সাহায্য নিয়ে উঠে পিছনে ফিরে তাকালেন। না, কিছুই নেই।

লোকটির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "জনু কবিরাজ আমার পিছনে জিন ছেড়ে দিয়েছে।"

এই কথা শোনার পর লোকগুলো একে অপরের দিকে চাওয়াচাওয়ি করল। দাড়িওয়ালা লোকটি কম বয়স্ক ছেলেটিকে বলল, "পানি দাও।"

সে ছুটে গেল, কিছুক্ষণ পর এক বোতল পানি নিয়ে এগিয়ে দিয়ে বলল, "বিসমিল্লাহ বলে খান।"

হাফেজ মিয়া পানির বোতলটা নিয়ে ঢকঢক করে খেলেন। নিজেকে শান্ত করতেই লোকটি বলল, "কী হয়েছে বলুন তো।"

হাফেজ মিয়া ভ্রু কুঁচকে বললেন, "আপনারা কারা?"

"আমরা জনু কবিরাজের বিপরীত দলের মানুষ। সে শয়তানের অনুসারী আর আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার," লোকটি তাঁর কাঁধে ধরে আশ্বস্ত করে বলল।

হাফেজ মিয়া সব খুলে বললেন। লোকটির মুখে হাসি ফুটে উঠল। হাফেজ মিয়া বুঝলেন না এই মর্মান্তিক আর ভয়ংকর ঘটনা শোনার পর একজন লোক কী করে হাসতে পারে! হাফেজ মিয়া ক্ষেপে বললেন, "হাসছেন কেন?"

লোকটি হাসি থামাল না, বরং হাসতে লাগল।
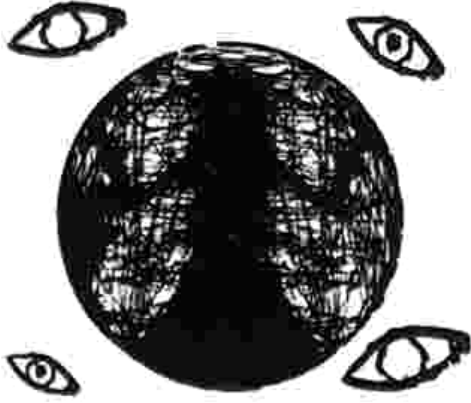
বৃদ্ধ মুখ শক্ত করে জাফরের হাসি দেখছেন। বৃদ্ধের পরিণতি দেখে যে জাফর হাসছে না তা বৃদ্ধ বুঝতে পারছেন না, তাই হয়তো রেগে যাচ্ছেন। জাফর হাসছে জনু কবিরাজের বৃত্তান্ত শুনে। যদিও হাসার বিষয় না তবুও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা রহম করেছেন। গর্তের কথা না জানলে চুক্তি বের করতে কষ্ট হয়ে যেত। এই রহম পেয়েই তার ভিতর থেকে হাসি আসছে।

আছর নামাজ পড়ে সবাই জাহাঙ্গীরনগর থেকে রওনা দেয়। এক ঘন্টা লেগেছে মুক্তারপুর আসতে। ভাগ্য ভালো এদিকের গ্রামের রাস্তা বড়। সাধারণ গ্রামে অ্যাম্বাসাডর গাড়ি নিয়ে ঢোকা যায় না। খসরু গাড়ি থামিয়েছে স্থানীয় সর্দার ভূঁইয়া সাহেবের বাড়ির সামনে।

খসরু ভূঁইয়া সাহেবের সাথে দেখা করতে গিয়েছে। জাফর আর আসলান নেমে অপেক্ষা করছিল। আকাশের অবস্থা ভালো না, কোন সময় বৃষ্টি নামবে ঠিক নেই। ঢাকার অবস্থাও ভালো না, তারিন লাইফ সাপোর্টে আছে। যাইহোক, জাফর হাসি থামিয়ে আসলানকে বলল, "গাড়ির ভিতর থেকে আমার ব্যাগটা নিয়ে এসো।"

আসলান জাফরের ব্যাগ নিয়ে এলো। ব্যাগ খুলে একটা পানির বোতল বের করে লোকটিকে বলল, "চলুন, শয়তানের সাথে দেখা করে আসি।"

জাফরের কথা শুনে লোকটি পিছিয়ে গেলেন। ভয়ে ভয়ে বললেন, "আর আমি যাব না।"

"ভয় পাবেন না। আপনি আমাকে গর্তটা দেখিয়ে চলে আসবেন" জাফর আশ্বস্ত করে বলল। লোকটি শান্ত হলেন না, বরং দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি যাই।"

জাফর খপ করে তাঁর হাত ধরে বলল, "জনু কবিরাজ আপনাকে ছেড়ে দেবে না। আপনি আমার সাথে চলুন, ইনশাআল্লাহ তাকে শায়েস্তা করব।"

"আপনি কে?"

"জনু কবিরাজের যম," বলেই জাফর লোকটিকে টান দিল জনু কবিরাজের বাড়ির দিকে।

লোকটি আর বাধা দিলেন না। তারা রওনা হলো। জাফর যেতে যেতে বলল, "তা মুয়াজ্জিন সাহেব আপনার নাম কী?"

"আমার নাম হাফেজ মিয়া," হাফেজ মিয়া নিজের নাম বললেন।

জাফর কিছু বলল না, চুপচাপ সামনে যেতে লাগল। হাফেজ মিয়া সামনে থেকে পথ দেখাতে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

আসলান জাফরের পাশে এসে বলল, "আচ্ছা আমরা যে যাচ্ছি, বিপদ আসবে না?"

"বিপদ চলে এসেছে। ভেবো না, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা আমাদের সাথে আছেন।"

"খসরু ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করলে ভালো হতো না?"

আসলানের কথায় জাফর কোনো জবাব দিল না। বোতলটা খুলে জাদুর বস্তু নষ্ট করার জন্য সূরা পড়ে ফুঁ দিয়ে আটকে নিল। সরু রাস্তার দুপাশেই এখন মেহগনির বাগান। সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে গিয়েছে, এদিকটা এখন অন্ধকার।

রাস্তার মাথায় তারা একটি টিনের ঘর দেখতে পেল। ঘরের সামনেই ভীষণ অন্ধকার হয়ে আছে। তার বামপাশে বাঁশঝাড়, সেখান থেকে ঝিঁঝি পোকার ডাক ভেসে আসছে, মাঝেমধ্যে ব্যাঙের শব্দ আসছে, পাখির শব্দে ঝাড়টা মেতে আছে।

বাড়ির সামনে আসতেই দেখল একজন লোক দরজায় বসে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। হাফেজ মিয়া বাড়ির সামনে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল, ভিতরে যাওয়ার সাহস হলো না। জনু কবিরাজ দরজার চৌকাঠে বসে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। গলায় গামছা বাঁধা আর পরনে লুঙ্গি।

হাফেজ মিয়া জনু কবিরাজের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "এ হলো জনু কবিরাজ।"

জাফর সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বলল, "গর্তটা কোন দিকে?"

হাফেজ মিয়া কোনো কিছু না বলে বাঁশঝাড়ের দিকে ইশারা করে বললেন, "সেখানে।"

জাফর সেদিকে তাকাল। অন্ধকারের কারণে কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে না। পকেট থেকে লাইট বের করে সুইচ চাপল। এবার বাঁশঝাড়ের সামনে ছোটখাটো

একটি গর্ত দেখতে পেল। এবার জনু কবিরাজ চৌকাঠ থেকে নেমে বলল, "হাফিজ্জা! কাকে নিয়ে এসেছিস? "

হাফেজ কিছু বললেন না। জাফর পানির বোতলের মুখ খুলে সূরা নাস আর ফালাক্ব পড়তে পড়তে গর্তের দিকে যাচ্ছে। অপরদিকে জনু কবিরাজও জাফরের দিকে আসছে। আসলান কী করবে বুঝতে পারছে না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে হাফেজ মিয়ার পাশে।

গর্তটা বেশি দূরে না, মাত্র পাঁচ হাত গেলেই তার সামনে চলে যাবে। ঠিক এমন সময় জনু কবিরাজ জাফরের সামনে এসে বাধা দিয়ে বলল, "ওইদিকে কোথায় যাস? "

জাফর কিছু বলল না, সূরা পড়তে লাগল। সূরা পড়া শেষ করে মুচকি হেসে বোতল থেকে একটু পানি বের করে জনু কবিরাজের মুখে ছিটা দিল। জনু কবিরাজ নিজের দুই হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে, "ও মা...।" বলে এত জোরে চিৎকার দিল যে বাঁশঝাড়ের পাখিগুলো ডানা ঝাপটে উড়ে যাচ্ছে। আসলান আর হাফেজ মিয়ার বুকটাও কেঁপে উঠল।

জাফর এই সুযোগে এক দৌড়ে গর্তের সামনে এসে বোতলের সবটুকু পানি ঢেলে দিল।

জনু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "কে তুই? তুই আমার সব নষ্ট করে দিলি রে... সব দিলি।"

"আমি মানুষ। তোর মতো শয়তান তো না।" জাফর বেশ ঠান্ডা গলায় জবাব দিল। সে কোমরে হাত দিয়ে জনু কবিরাজের দিকে তাকিয়ে আছে। কিছু একটা ছুটে যাচ্ছে, কিন্তু সেটা কী বুঝতে পারছে না।

"জানোয়ার, কোত্থেকে আসলি তুই? আমার সবকিছু তুই শেষ করে দিলি। জাদুর পানি আমার কুয়োতে ঢেলে দিয়ে আমার জিনগুলোকে ছেড়ে দিলি তুই। শুয়োরের বাচ্চা, তোকে আমি ছাড়ব না। কবিরাজ হয়েছিস? আমার থেকে বড় কবিরাজ তুই?"

জাফর মুচকি হাসল কেবল। জনু কবিরাজ আরও ক্ষেপে গেল।

"হাসছিস আবার?"

এই বলে জনু কবিরাজ জাফরের দিকে তেড়ে আসতে লাগল। জাফর কিছু বলার আগেই জাফরের পাঞ্জাবি ধরে নিচে ফেলে দিয়ে কী যেন পড়তে লাগল। পড়া শেষ করে জোরে জোরে বলল, 'এখন তোকে কে বাঁচাবে? "

ইতোমধ্যে আসলান আর হাফেজ মিয়া দেখল জনু কবিরাজের পিছনে তিনটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাতে শুরু করেছে। দুজনে ভয়ে জমে গেল। ওদিকে জাফর নিচে পড়ে আছে। আসলান কী করবে বুঝতে পারছে না, চিৎকার দিয়ে জাফরকে সতর্ক করতে চাইল কিন্তু গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বের হলো না।

জাফর উত্তেজিত হলো না বরং সে মুচকি হেসে বলল, "কেন? তোর শয়তানরা খবর দেয়নি যে আমি আসছি?"

জাফরের মুখে এ কথা শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কয়েক কদম পিছনে চলে গেল জনু কবিরাজ। তাকে যেন টান দিয়ে কেউ পিছনে নিয়ে এসেছে। পাথরের মতো জাফরের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে রাগের পরিবর্তে এখন ভয়।

জাফর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তুই কার আদেশে এসব করিস বল!"

জনু কবিরাজ জবাব না দিয়ে ঘরের দিকে ছুটল। জাফর পিছু নিতে চাইল কিন্তু জাফরকে তিনটি ছায়া এসে বাধা দিল। জাফর পিছনে সরে এসে সূরা পড়ছে। সূরা নাস শেষ করতেই ছায়াগুলো তিনটি থেকে দশটি হয়ে গেল। জাফর বুঝতে পারল এগুলো থেকে মুক্তি পাওয়া মুশকিল হবে, কিন্তু হাল ছাড়ল না। এদিকে এত জোরে বাতাস বইতে শুরু করল যে, মনে হলো বাঁশবাগান যেন জাফরের উপর ভেঙে পড়বে।

জনু কবিরাজ ঘর থেকে এক রামদা নিয়ে উন্মাদের মতো ছুটে আসছে। এত জোরে ছুটছে যে তার লুঙ্গি যে খুলে পড়ে গিয়েছে সেদিকে তার খেয়াল নেই। এই দেখে আসলান এক দৌড় দিয়ে এসে জনু কবিরাজকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। সে এতটা উন্মাদ হয়েছিল যে, আসলান যে ছুটে আসছে তা খেয়াল করেনি।

জাফর একের পর এক সূরা পড়ছে, কিন্তু লাভ হচ্ছে না। তার কান বেয়ে রক্ত পড়তে লাগল। সে বুঝতে পারল কী হতে যাচ্ছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বুঝি এভাবেই তার মৃত্যু লিখে রেখেছেন। মনে হলো কে যেন তার গলা চেপে ধরেছে, পিঠে অসংখ্য আঁচড় পড়ছে। সে বুঝতে পারল, আর চেষ্টা করে লাভ হবে না।

জাফর ভেবেছিল এগুলো বুঝি মারিদ, কিন্তু না, এগুলো হলো ইফ্রিত। তাই এত কম রুকইয়া কাজে দিচ্ছে না, কিন্তু এরকম ব্যর্থ হওয়ার কথাও না, কোথাও নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে। ছায়াগুলো পর্দার মতো চারপাশ বন্ধ করে দিচ্ছে জাফরের। চোখের সামনে সবকিছু অন্ধকার হয়ে গিয়েছে।

আসলান জনু কবিরাজের উপর চড়ে বসেছে। একের পর এক ঘুষি বসাচ্ছে। জনু কবিরাজ আসলানের উপর্যুপরি মার খেয়ে বেহুঁশ হতে চলেছে। আসলান জাফরের দিকে তাকাতেই দেখল জাফর কালো একটা পর্দার ভিতর চলে যাচ্ছে।

আসলান উঠে দাঁড়াল, জাফরের কাছে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল, কিন্তু আরেক পা সামনে দেওয়ার আগে নিচে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তার বাম পা ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ফেলে দিয়েছে জনু কবিরাজ। নাক ফেটে রক্ত বের হচ্ছে, ঠোঁটের উপর দাঁত বসে গিয়েছে। আসলানও ছেড়ে দিল না। ডান পা দিয়ে জোরে লাথি দিল জনু কবিরাজের মুখে। লাথি সহ্য করতে না পেরে সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

আসলান জাফরের দিকে তাকাল। অন্ধকার জাফরকে গ্রাস করে নিচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে সে। জাফরের গলার শব্দও হারিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ করেই আসলান দেখল উপর থেকে একটি সাদা আলো নেমে আসছে। তা অন্ধকার পর্দার উপরে পড়তেই সবগুলো ছায়া ছিটকে গেল চারপাশে।

আলোটা বিশাল এক আকৃতি ধারণ করল। সবগুলো কালো ছায়া আলোটার দিকে ছুটে আসছে, কিন্তু আলোর কাছে যেতেই তা সবগুলোকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। চোখের সামনে এরকম আলো আঁধারের খেলা কেবল গল্পেই দেখা যায়। ধীরে ধীরে সবগুলো কালো ছায়া হারিয়ে গেল। জাফর মাটিতে পড়ে রইল।

বাতাসও থেমে গেল, পরিবেশ শান্ত হয়ে গেছে। চারদিকে অন্ধকার, কিন্তু অন্ধকারের সেই গুমোট বৈশিষ্ট্যটা আর নেই। সাদা আলোটি হঠাৎ করে একজন মানুষের রূপ নিল। তারপর জাফরকে ধরে দাঁড় করাল। আসলান পিছন দিকে তাকিয়ে দেখে জনু কবিরাজ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। আসলান কষ্ট করে দাঁড়াল।

জাফর হঠাৎ করেই নিজের কাঁধে স্পর্শ অনুভব করল। একটু আগেই সারা শরীরে অসংখ্য যন্ত্রণা নিয়ে মাটিতে পড়ে কোঁকাচ্ছিল। সেই যন্ত্রণাও কমে গিয়েছে। চোখ মেলে দেখল একজন তরুণ তাকে ধরে দাঁড় করাচ্ছে। জাফর তার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়াল। অবাক করার ব্যাপার হলো তরুণের শরীর থেকে বেশ মিষ্টি একটা গন্ধ আসছে।

আসলান ছুটে জাফরের সামনে এসে ভয়ে ভয়ে জাফরের দিকে তাকাল।

ছেলেটি বলল, "আসসালামু আলাইকুম। আমি ইমরান। আমি একজন জিন। আমার বাড়ি পাকিস্তান। আমার বাবার নাম হুমা আর মায়ের নাম শেফা। আমার বাবা-মাকে ইফ্রিত সর্দার বন্দি করে এই জাদুকরের গোলাম বানিয়ে দিয়েছিল। তাদেরকে মুক্ত করতে আমি এই গ্রামে এসেছি। ইমাম হিসেবে আশ্রয়

নিয়েছি এখানকার মুয়াজ্জিনের বাসায়। আমি বাংলাদেশের এক মাদরাসায় থেকে পড়াশুনা করেছি।"

ছেলেটি থামতেই জাফর ওর কাঁধ ছেড়ে দিয়ে নিজের পাঞ্জাবি ঝাড়তে লাগল। আসলান ভয়ে আর বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে। জাফর ঝাড়তে ঝাড়তে দেখল ওর পায়জামায় কুকুরের পায়খানা লেগে আছে, এবার বুঝতে পারল কেন রুকইয়া কাজে দিচ্ছিল না, অপবিত্র বস্তু তার গায়ে লেগে ছিল।

মাগরিবের আজান হয়তো দিয়ে দিয়েছে। জাফর দেখল তার সারা শরীরে আঁচড়ের চিহ্ন। মাগরিব কাজা হয়ে গিয়েছে হয়তো। আজানের শব্দ এখানে আসলে এই ঝামেলা পোহাতে হতো না।

জাফর দাঁড়িয়ে জিন ইমরানের দিকে তাকিয়ে বলল, "তারপর কী হলো?"

"আমি কোনোভাবেই মুক্ত করতে পারছিলাম না। এক হাজার বার সূরা জিন পড়া আজই শেষ করলাম। তারপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার রহমতে আপনারা এসে চুক্তি নষ্ট করে দিয়েছেন," সে জবাব দিল।

"আপনার মা-বাবা ঠিক আছে?"

"আলহামদুলিল্লাহ, তাদেরকে আমি দূরে রেখে এসেছি।"

"আচ্ছা," তারপর জনু কবিরাজের দিকে তাকিয়ে বলল, "এর এই অবস্থা হলো কী করে?"

আসলান জবাব দিতে পারল না। পাথরের মতো তাকিয়ে আছে ইমরানের দিকে। ইমরান জাফরের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি আসি। আমাকে দেখে আপনার সঙ্গীর এই অবস্থা হয়েছে। আমার বাবা-মায়ের কাছে যাচ্ছি," তারপর জনু কবিরাজের দিকে তাকিয়ে বলল, "ওর পিছনে বড় একজন মানুষ শয়তান আছে। সে কে আমি জানি না।"

জাফর নিশ্চুপ।

"আপনি যখন বেহুঁশ ছিলেন তখন জনু কবিরাজের পাশে এক শয়তান এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি তাকে এক ঝলক দেখেছি, তার অনুগতরা আপনাকে মারতে চেয়েছিল।"

ইমরানের কথা শুনে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল জাফর। ইমরান জাফরের কাঁধে হাত রেখে বলল, "শুকরিয়া আমার বাবা-মাকে মুক্ত করার জন্য। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন।"

কথা শেষ করেই বাঁশবাগানের দিকে চলে গেল ইমরান। জাফরের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেল। জাফর আসলানের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "আসলান! আসলান!"

আসলান চমকে উঠে বলল, "ও চলে গিয়েছে!"

জাফর বুঝতে পারল আসলান ইমরানের কথা বলছে।

জাফর মাথা নেড়ে সায় দিল। আসলানের বাহু ধরে যেতে লাগল গাড়ির দিকে। বাবলা গাছের সামনে এসে দেখল হাফেজ মিয়া বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন। জাফর আসলানকে বলল, "ইমরান তাঁকে ব্যবহার করে আমাদেরকে এখানে এনেছে।"

আসলান আড়চোখে জিজ্ঞেস করল, "মানে?"

"ইমরান তাঁকে প্ররোচিত করেছে জনু কবিরাজের পিছু নিতে। ওজিফা পড়ে নিজের বাবা-মাকে মুক্ত করাতে পারত না তাই ওর এমন একজনের দরকার ছিল যে ওই গর্তের সবকিছু নষ্ট করে দেবে। সে ভেবেছিল মুয়াজ্জিনকে দিয়ে করাবে কিন্তু আমরা তা করে ফেললাম," জাফর থেমে হাত দিয়ে হাফেজ মিয়ার দিকে ইশারা করে বলল, "তাঁকে কাধে নিয়ে চলো।"

আসলান পিছন ফিরে জনু কবিরাজের দিকে ফিরে বলল, "ওর কী হবে?"

"আমাদের কিছুই করার নেই। এ দেশে ইসলামি আইন চললে রাষ্ট্র তার গর্দান কেটে নিত। তা যেহেতু নেই, আমাদেরও আর কিছু করার নেই।"

"সে যদি আমাদের পিছনে লাগে?"

জাফর জবাব দিল না, মুচকি হাসল। আসলান এই হাসির মানে বুঝল না। আসলান হাফেজ মিয়াকে কাঁধে তুলে নিল। নাক আর মুখ প্রচণ্ড ব্যথা করছে। জাফরও মনে মনে যিকির করতে লাগল।

তারা বাড়ি ছেড়ে যেতেই অন্ধকারে কয়েকটি ছায়া জনু কবিরাজের শরীরের চারপাশের শকুনের মতো জড়ো হলো। জনু কবিরাজের আচমকাই হুঁশ ফিরেছে। চোখ খুলে দেখল তার চারপাশে অসংখ্য ছায়া। সে কথা বলতে চাইল কিন্তু পারল না। মনে হলো তার ঠোঁটদুটি কেউ সেলাই করে দিয়েছে।

ছায়াগুলো তার উপর হামলা করল। তার শরীরের মাংস খুবলে খুবলে খেতে লাগল। সে চিৎকার করতে চাইল কিন্তু সমর্থ হলো না। ছায়ারা তার চোখ খুবলে নিল। চোখের সামনে তার অন্ধকার হয়ে গেল আর এই অন্ধকারের মধ্যেই সে মৃত্যু যন্ত্রণার সাথে সাথে আগুনের উত্তাপ অনুভব করল নিজের শরীরে। (৮)

মাথায় শীতলতা অনুভব করলেন হাফেজ মিয়া। চোখ খুলে দেখলেন তাঁর চোখের সামনে একটা মুখ, ভূঁইয়া সাহেবের মুখ, ভূঁইয়া সাহেব হেসে বলল, "তাহলে তোমার জ্ঞান ফিরেছে।"

হাফেজ মিয়া কিছু বললেন না, উঠে বসলেন। কপাল আর ঘাড় বেয়ে পানি পড়তে লাগল। সন্ধ্যার সমস্ত ঘটনা তাঁর মনে পড়ে গেল। কী বীভৎস ছিল সবকিছু। তিনি চারদিকে তাকালেন। ভূঁইয়া সাহেব আর তার কাজের বুয়া ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলেন না। কাজের বুয়া গামছা এগিয়ে দিল তার দিকে। তিনি গামছা দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বললেন, "তারা চলে গিয়েছে?"

"হ্যাঁ, তোমাকে এখানে রেখে চলে গিয়েছে। আচ্ছা জনু মিয়া কেন আজ আমার এখানে এলো না? আর তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?" ভূঁইয়া সাহেবের প্রশ্নের জবাবে মাথা নিচু করে ফেললেন হাফেজ মিয়া। কী জবাব দেবেন ভাবতে লাগলেন। ছায়াগুলো যখন লোকটিকে ঘিরে ধরল ঠিক তখনই মূর্ছা গিয়েছিলেন তিনি।

বিছানা থেকে নেমে বললেন, "জনু মিয়ার ওখানে গিয়েছিলাম। যাইহোক, আমি বাসায় যাই।"

ভূঁইয়া সাহেব আবার প্রশ্ন করল, "জনু কোথায়?"

"তা আমি জানব কীভাবে?"

"তুমি জানবে কী করে মানে? তুমি যখন ঐ দুজন লোককে নিয়া গেলে তখন তো জনু ছিল।"

"হ্যাঁ, কিন্তু আমি অজ্ঞান ছিলাম। আর তারা নাকি পুলিশের লোক আবার চেয়ারম্যান সাহেবের খাস আত্মীয়। জনুর যা-ই হোক না কেন, তাতে কিন্তু আপনারও লাভ আমারও লাভ।"

"জনুকে না পেলে ভেজাল হবে বলে দিলাম!" ধমক দিয়ে বলল ভূঁইয়া।

ধমক খেয়ে মোটেও বিচলিত হলেন না হাফেজ মিয়া, বরং কঠিন সুরে বললেন, "ঢাকার লোকেরা সব জানে, আমি অনেক আগেই বেহুঁশ হয়ে গিয়েছি। এটা আমি আপনাকে আগেও বলেছি।"

কথা শেষ করে সামনের দিকে পা বাড়ালেন হাফেজ মিয়া। ভূঁইয়া সাহেব নিজের লাঠি দিয়ে বাধা দিয়ে বললেন, "দাঁড়াও, জনুকে খোঁজার জন্য বাড়িতে লোক পাঠিয়েছি।"

হাফেজ মিয়া ভূঁইয়া সাহেবের দিকে তাকালেন। মুখ শক্ত করে আছে ভূঁইয়া সাহেব। কোনো উপায়ান্তর না দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন সব কথা। হঠাৎ করে তাঁর পাঞ্জাবির পকেটে কী যেন অনুভব করলেন। ডান পাঞ্জাবির পকেটটা ভারী হয়ে আছে। তিনি পকেটের ভিতরে হাত দিলেন। কাগজের একটা প্যাকেট হাতে লাগল। প্যাকেটটি তিনি বের করে নিলেন।

ভূঁইয়া সাহেবও দেখল তাই জিজ্ঞেস করল, "এগুলো কী?"

হাফেজ মিয়া প্যাকেটটা খুলতেই দেখলেন কিছু খেজুর।

ভূঁইয়া সাহেব বলল, "তুমি সৌদির খেজুর কোথায় পেলে?"

হাফেজ মিয়া জবাব দিলেন না। একটা খেজুর ভূঁইয়া সাহেবকে দিলেন, বাকিগুলো কাগজে মুড়িয়ে আবার পকেটে রেখে দিলেন। ভূঁইয়া সাহেব খেজুরটা মুখে দিয়ে বলল, "আহা! গুড়ের চেয়েও মিষ্টি।"

হাফেজ মিয়া জবাবে কিছু বললেন না। রাস্তার দিকে তাকাতেই দেখলেন দুজন টর্চের আলো ফেলে এদিকে আসছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে তারা ভূঁইয়া সাহেবের রোয়াকে এসে হাজির হলো। দুজনকেই চিনতে পারলেন হাফেজ মিয়া। ভূঁইয়া সাহেবের কাজের লোক সলিম আর কলিম।

"জনু ভাইকে তো পাইনি," সলিম বলল।

ভূঁইয়া সাহেব অবাক হয়ে বলল, "কোথায় গিয়েছে?"

তারা একসাথে জবাব দিল, "জানি না।"

ভূঁইয়া সাহেব হাফেজ মিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, "গ্যাঞ্জাম বাধাওনি তো?"

"শুনুন, আমি কিছুই জানি না। সে হয়তো নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে আগেরবারের মতো। ইশার ওয়াক্ত হয়েছে। আমি এখন আজান দিতে যাব," বলেই হাফেজ মিয়া বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলেন।

"বেশি বাড় বেড়ে গেছ তুমি," চোখ রাঙিয়ে বলল ভূঁইয়া সাহেব।

হাফেজ মিয়া হাঁটা থামিয়ে ভূঁইয়া সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সলিমের বাপকে খুন করে যে জনুর বাশঝাড়ে কবর দিয়েছেন সেটা আমি ভুলিনি। আমি ফাঁসলে সবাইকে ফাঁসাব। একা কবরে যাব না। আর ভাববেন না যে আমাকে খুন করে হজম করতে পারবেন। আমার কিছু হলে ঐ দুজন লোক ঢাকা থেকে ঠিকই আসবে। তখন কিন্তু বাঁচতে পারবেন না।"

ভূঁইয়া সাহেব আর কিছু বলল না। হাফেজ মিয়া রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে লাগলেন জনু মিয়ার কী হলো? আর ঐ লোকগুলো কোথায় গেল? এই রহস্যের কথা ভাবতে ভাবতে তিনি বুঝতেই পারলেন না তাঁর জন্য কত বড় রহস্য অপেক্ষা করছে।
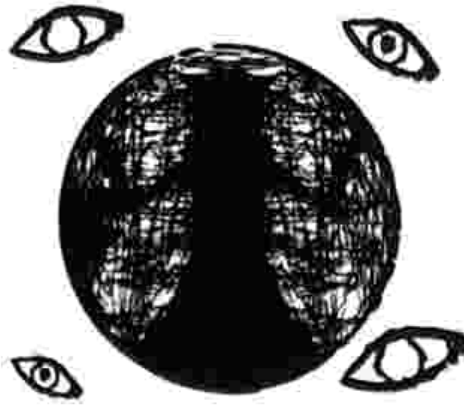
পাশাপাশি বেডে শুয়ে আছে জাফর আর আসলান। সেদিন রাতেই দুজনের প্রচণ্ড জ্বর এসেছিল। খসরু যদি জমি নিয়ে ভূঁইয়ার সাথে ঝামেলা না বাধাত তাহলে হয়তো জাফরের উপর দিয়ে এত বড় ঝড় বয়ে যেত না। খসরু থাকলে আরেকটা অতিরিক্ত লোক থাকত। শক্তিমত্তা থাকত। অবশ্য জাফর ভাবেনি যে তাদের উপর হঠাৎ করেই বিপদ আছড়ে পড়বে। মানুষ দোষ চাপাতে পছন্দ করে। তাই জাফরও খসরুর উপর খানিক বিরক্ত হয়ে মনকে হালকা করছে।

রুকন সাহেব জাফর আর আসলানকে ঢাকায় নিয়ে এসেছেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন। তারিনের অবস্থা এখন অনেক ভালো। সুস্থ হতে শুরু করেছে আর ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করছে, তবুও জাফর ভাবছে আজ রুকইয়া করবে আরেকবার।

আসলান বেডের উপর বসে একটা বই পড়ছে। নাসির সাহেবকে বলে আসলান আনিয়েছে। বইটার নাম 'মাজমুআল ফতওয়া'। আসলান বই বন্ধ করে জাফরের দিকে তাকাল। জাফর বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে আছে।

আসলান বিছানায় বসে বলল, "স্যার?"

জাফর চোখ বন্ধ রেখেই বলল, "কী?"

"কালো জাদু কীভাবে করে?" আসলান ভয়ে ভয়ে বলল।

জাফর এবার চোখ খুলে আসলানের দিকে তাকিয়ে ধমকের সুরে বলল, "এসবে তোমার এত কেন আগ্রহ? হুম?"

জাফরের প্রশ্নে কাঁচুমাচু হয়ে আসলান বলল, "জানলে ভালো। কোথায় কাজে লাগবে বলা তো যায় না।"

জাফর চোখ বন্ধ করে বলল, "জিন দুইভাবে ডাকা যায়। একটি হলো শরীয়ত অনুযায়ী বিভিন্ন দোয়া পড়ে, আরেকটি হলো শয়তানের শিখানো পদ্ধতি

দিয়ে। যারা কালো জাদু করে তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালাকে ভয় করে না যে শরীয়ত মানবে। তারা শয়তানের পদ্ধতি অনুসরণ করে। সেই হিসেবে কয়েকটি পদ্ধতির অনুসরণ করে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে তারা জিন ডাকে এবং কাজ সম্পাদন করায়।"

জাফর থামতেই আবার আসলান প্রশ্ন করল, "সে পদ্ধতিগুলো কী কী?"

আসলানের প্রশ্ন শুনে জাফর চোখ খুলল, আসলানের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর আবার চোখ বন্ধ করে বলতে লাগল, "প্রথম পদ্ধতি হলো আল-ইকসাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালাকে অস্বীকার করে শয়তানের নামে কসম করা এবং শয়তানের আশ্রয় প্রার্থনা করা। এটি হলো প্রথম ধাপ, আবার পদ্ধতিও বটে। সাহির একটি অন্ধকার রুমে আগুন জ্বালায়, তারপর কিছু ধূপ ছিটায় আগুনের মধ্যে যাতে খারাপ গন্ধ বের হয় এবং সমস্ত রুমে খারাপ গন্ধ বিরাজ করে। যদি ভালোবাসার জন্য জাদু করা হয় তাহলে সুগন্ধি ধূপ ছিটায়। তারপর সে তার মন্ত্র পড়ে।

মন্ত্রগুলো নানা ভাষায় হতে পারে। এই মন্ত্রগুলোতে যা লেখা থাকে সব আল্লাহ বিরোধী। সাহিরকে অবশ্যই অপবিত্র অবস্থায় থাকতে হয়। তারপর সামনে জিন হাজির হয় সাপ, কুকুর ইত্যাদির আকৃতিতে। মাঝেমধ্যে সে শুধু আওয়াজ শুনতে পায়। তারপর সে ওই জিনকে নির্দেশ দেয়। যার উপর জাদু করা হবে তার শরীরের সাথে সম্পৃক্ত কিছু কাপড় বা কোনো কিছু ওই মন্ত্র লেখা কাগজের সাথে বাঁধতে হয়। মাঝেমধ্যে পুতুল, কাক, শিংমাছ বা অন্যান্য কিছু ব্যবহার করে সেই শরীরসম্পর্কীয় বস্তু বাঁধতে হবে। এই ক্ষেত্রে যতদিন কোনো প্রাণী বাঁচবে যার উপর জাদু করা হয় সে ততদিন বাঁচবে। আর পুতুলের উপর বাঁধলে পুতুলের হাত, পা কিংবা মাথা মচকে দেয়া হয় যাতে এই অঙ্গগুলো বিকল হয়ে ভুক্তভোগী মারা পড়ে। তারপর সাহির জিনকে আদেশ করে তার কাজ করার জন্য।"

"হলিউডের ছবিগুলোতে এমনটাই দেখা যায়," জাফর থামতেই আসলান যোগ করল।

জাফর আসলানের দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখো, বাইবেল কিংবা কুরআন মজিদ, যেটাই হোক, ব্ল্যাক ম্যাজিক করার পদ্ধতি এক। যাইহোক, দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, শয়তানের নামে কুরবানি দেয়া। এই ক্ষেত্রে জিনের আদেশ অনুযায়ী সে কুরবানি দেয়। কিছু ক্ষেত্রে নরবলিও দেয়া হয়। সাহির কখনো সেই রক্ত নিজের

শরীরে মাখে। তারপর সেই পশুর দেহকে জিনের জন্য কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলে দেয় সাহির। তারপর বাড়ি এসে সে মন্ত্র পাঠ করে জিন ডেকে তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়।

তৃতীয় পদ্ধতি হলো আস-সুফিয়া। খুব ঘোরতরভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার বিরোধিতা করা এবং প্যাগানিজমে বিশ্বাস করা। এটি হলো জিন ডাকার সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি। কারণ এর মাধ্যমে জিনের দলকে বশ করা যায়। তারিনের উপর এই পদ্ধতিতে জাদু করা হয়েছে। আর মারিদকে একমাত্র এই পদ্ধতিতেই বশ করা যায়। এই পদ্ধতিতে সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজ সাহিরকে করতে হয়। পবিত্র কুরআনকে জুতো হিসেবে ব্যবহার করে টয়লেটে যায় সাহির।

মন্ত্র পড়ে পবিত্র কুরআন টয়লেটে নিক্ষেপ করে। তারপর শয়তানের বশ্যতা শিকার করে মন্ত্র পড়তে থাকে। মন্ত্র পড়া শেষ হলে নিজের জায়গায় ফিরে যায়। শয়তান তার কাছে ছুটে আসে এবং সে শয়তানকে নির্দেশ করে কাজ করার জন্য। শয়তান ডাকতে হলে সাহিরকে এই ধরনের যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। যারা যোগ্যতা অর্জন করে তাদেরকে সুফলি বলে। আর সুফলি হওয়ার জন্য ভয়াবহ পাপ করতে হয় যেমন– ইনসেস্ট, হোমোসেক্সুয়ালিটি ইত্যাদি।"

"তার মানে জনু কবিরাজ সুফলি ছিল?" আসলান প্রশ্ন করল।

জাফর এবার ভাবনার মধ্যে পড়ে গেল। মুন্সিগঞ্জে আরেকবার যেতে হবে, সেখানে একজন লোককে বিপদের মুখে ফেলে এসেছে। তার সাথে দেখা করতে হবে আর জনু কবিরাজেরও খোঁজ নিতে হবে। এত বড় পরাজয়ের পর নিশ্চয়ই সে থেমে থাকবে না। বেঁচে থাকলে অবশ্যই ঝামেলা বাধাবে। কিন্তু চিন্তা এখন অন্য জায়গায়। সে বেঁচে আছে কি না তা এখন সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয়। সে যদি মারা যায় তাহলে তার সাথে বড় একটা রহস্য কবরে চলে যাবে।

"কী হলো? কোথায় হারিয়ে গেলেন আবার?" জাফরকে নিশ্চুপ দেখে আসলান প্রশ্ন করল।

জাফর সত্যটা বলে আসলানকে চিন্তায় ফেলতে চাইল না, সে বরং অন্য যে টপিকে আছে তার কথা বলতে শুরু করল, "চতুর্থ পদ্ধতি হলো আন-নাজাস। এই পদ্ধতিতে সাহির একটি কাগজ ময়লা করে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরা তার উপর লিখে তারপর মন্ত্র পাঠ করতে থাকে। এই পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআনকে অপমান করা হয়, সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালাকে। তাই শয়তান তার কাছে ধরা দেয়। পঞ্চম পদ্ধতি হলো আত-তানকিস। এই পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআনের কোনো একটি সূরা বা আয়াতকে উলটো করে লেখা হয়। এতে

আয়াতের অর্থ পুরোপুরি বদলে যায়। তারপর মন্ত্র পড়ে সাহির শয়তান হাজির করে এবং কাজ করায়।"

জাফর থেমে কয়েক সেকেন্ড বিরতি নিয়ে বলল, "মাঝেমধ্যে দেখবে বাংলাদেশের কবিরাজরা তাবিজ দিয়ে বলে, সেটাকে কোথাও ঝুলিয়ে রাখতে। তাহলে যে ঝুলায় তার আশা পূরণ হয়। তুমি যদি পারো এরকম একটা তাবিজ সংগ্রহ করে খুলে দেখো। দেখবে কোন সূরা উলটো করে লেখা আছে।"

আসলান মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, একদম ঠিক বলেছেন। আমি অবশ্য কোনো তাবিজ খুলে দেখিনি তবে আমাদের কবিরাজরা প্রায় এরকম ঝুলিয়ে রাখার জন্য তাবিজ দিয়ে রাখে।"

জাফর হাই তুলে বলল, "বাকিগুলো বলব নাকি?"

"বললে তো সমস্যা নেই?"

"বলে কী লাভ? তুমি কি সব মনে রাখতে পারবে?"

আসলান মুচকি হেসে বলল, "ভাইবা দেব না যে সবকিছু মুখস্থ করতে হবে। জাস্ট জেনে রাখছি কোনটা কেমন।"

"আচ্ছা।"

"তবে আপনি এত কিছু মুখস্থ রেখেছেন কীভাবে?"

আসলানের প্রশ্নে জাফর কিছু না বলে মুচকি হেসে বলতে লাগল, "ষষ্ঠ পদ্ধতি হলো আত-তানজিম। এক কথায় তারকাদের সাথে যোগাযোগ করা। অদ্ভুত শোনাচ্ছে না? এই পদ্ধতিকে আর-রাশদও বলা হয়। সাহির রাতে অপেক্ষা করে। কোনো একটি নির্দিষ্ট তারকা আকাশে দৃশ্যমান হলে তখন সাহির তারার সাথে কথা বলতে শুরু করে। বাংলা ভাষায় নয়, এনচ্যান্টিং ভাষায় কথা বলে। একতরফা যোগাযোগ। এগুলো হলো মন্ত্র। সে সিলও আঁকে। সিলগুলো প্রধানত পেন্টাগ্রাম হয় কারণ তারকা পেন্টাগ্রাম আকারে দৃশ্যমান হয়। যে তারকাগুলোকে দেখে এসব করা হয় সেই তারকাগুলো সবসময় আকাশে থাকে না। বছরের পর বছর ধরে সাহির অপেক্ষা করে এই তারা দেখার জন্য। তারপর পেন্টাগ্রামে মন্ত্র পড়লে সেখানে শয়তান হাজির হয়। আসলে শয়তান হাজির হয় কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালাকে অস্বীকার করে সে তারাকে ঈশ্বররূপে গ্রহণ করে। তারপর সে তার কাজ করিয়ে নেয়।"

"এই পেন্টাগ্রামের সাথে স্যাটানিজমের ভালো সম্পর্ক আছে।"

"হ্যাঁ, ওয়েস্টার্ন কিংবা ইস্টার্ন, সেমিটিক কিন্তু পলিথিজম সবকিছুর সাথে এই পেন্টাগ্রামের ভালো সম্পর্ক আছে। সপ্তম পদ্ধতি হলো আল কাফফু। এই

পদ্ধতিতে একটি শিশুর বাম হাত দিয়ে মাটিতে বর্গ আঁকা হয়। এই ক্ষেত্রে শিশুটি অপবিত্র অবস্থায় থাকে। তারপর সাহির বর্গের চার কোণায় বিভিন্ন কিছু লেখে। সাহির বাচ্চাটির হাতে নীল গোলাপ অথবা নীল তেল, যা বিশেষ নিয়মে তৈরি তরল পদার্থ, তা শিশুটির বাম হাতে মাখে। সাহির আবার একটি আয়তাকার কাগজে অনেক কিছু লিখে তারপর শিশুটির চেহারা সেই কাগজ দিয়ে বেঁধে দেয় যাতে কাগজটি চেহারা থেকে সরে না যায়।

তারপর শিশুটিকে কালো আলখেল্লা দিয়ে ঢেকে দেয়। তারপর মন্ত্র পড়তে শুরু করে। ফলে অন্ধকারের মধ্যে শিশুটি তার হাতে ছবি দেখতে পায়। তারপর শিশুটিকে সাহির জিজ্ঞেস করে যে, সে কাউকে দেখতে পাচ্ছে কি না? যদি হ্যাঁ বোধক জবাব দেয় তাহলে সাহির শিশুটির মাধ্যমে জিনকে বলে তার কাজ করে দিতে।"

"এক মিনিট।" জাফরকে থামিয়ে দিয়ে আসলান বলল, "এটা আমাদের সমাজে কোনো কিছু হারিয়ে গেলে কিংবা কারো খোঁজ পেতে হলে তুলা রাশির কারো হাতে কিংবা নখে সেটা দেখানো হয়।"

"হ্যাঁ, বলতে পারো এটা কাফফুর বিবর্তিত রূপ। সবার শেষে আল-আতহার। এই পদ্ধতিতে যার উপর জাদু করা হবে তার কাপড় আনা হয়। বিশেষ করে রুমাল, যা থেকে ঘামের গন্ধ আসে। তারপর সাহির জোরে জোরে সূরা তাকাছুর পড়ে। তারপর আবার নীরবে মন্ত্র পড়ে। এই ক্ষেত্রে সে রুমালে চারটি গিঁট দেয়। যাতে রুমালটিকে মাপা যায়। তারপর জিন হাজির হয়। এই সিহর করা হয় রোগীকে চিকিৎসা করার জন্য। কালো জাদুর মাধ্যমে কালো জাদুর চিকিৎসা," কয়েক সেকেন্ড থেমে জাফর ছোট করে একটা কাশি দিয়ে বলল, "এই আটটি পদ্ধতির মাধ্যমে একজন সাহির শয়তান ডাকে। সবগুলো পদ্ধতিতেই অনেক কুফরী আছে। যে এগুলো করে, সে কাফির। তার শাস্তি ভয়াবহ। তাকে পেলে গলা কেটে হত্যা করার নির্দেশ আছে। তবে শাস্তির মাত্রা সাহিরের উপর ভিত্তি করে। যদি সে মুসলমান হয়ে থাকে তাহলে এক রকম আর যদি অমুসলিম হয়ে থাকে তাহলে আরেক রকম।"

আসলান মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে নিজের সমস্ত চিন্তাকে এক জায়গায় জড়ো করার চেষ্টা করল, তাহলে সুফিয়ার উত্তর মিলল।

শয়তান ডেকে কাজ করানোর জন্য শয়তানের চেয়েও ভয়াবহ কাজ মানুষকে করতে হয়। শয়তান নিজে কখনো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালাকে সরাসরি

অস্বীকার করে না। কিন্তু মানুষ! মানুষ তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালাকে অস্বীকার করে!

শুধু অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হয় না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা, তার প্রেরিত নবী-রসূল আলাইহিমুস সালাম ও তাঁর কিতাবসমূহকে অপমান করে। এই ধৃষ্টতা দেখানোর সাহস শয়তানও পায় না, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি মানুষ লোভের বশবর্তী হয়ে বিনা দ্বিধায় তা করে। শয়তান শুধু আদেশ করে আর সবকিছুই মানুষ কার্যে পরিণত করে।

জাফর বলেছিল, শায়াতিন হলো মানুষের উপর নিয়োজিত জিন যারা মানুষকে ক্ষতি করে, মানুষকে ভুল পথে ধাবিত করে, তাকে পাপ করতে উৎসাহিত করে। তাহলে এই শায়াতিনকে বশ করতে হলে একজনকে মানুষ আরও বড় শয়তান হতে হয়। সেই শায়াতিনের বশ্যতা এবং প্রভুত্ব স্বীকার করতে হয়, অনেক কিছু উৎসর্গ করতে হয়, দীর্ঘদিন তপস্যা করতে হয়। ঘোরতরভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার বিরোধিতা করতে হয়।

জুতার শব্দে চিন্তার জগৎ থেকে বের হয়ে এলো আসলান। দেখল একজন নার্স হাতে একটা ফাইল নিয়ে ঢুকছে। নার্স ফাইলে চোখ রেখে বলল, "আপনাদের রিলিজ হয়েছে।"

জাফর উঠে বসল। জুতোটা পরে বালিশের নিচ থেকে মানিব্যাগটা নিয়ে আসলানের দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিক আছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তোমাকে ভালো রাখুন। আল্লাহ হাফিয।"

জাফরের কথা শুনে আসলান লাফ দিয়ে নেমে বলল, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

জাফর নার্স থেকে ফাইল নিয়ে সাইন করে বলল, "আমার কাজে।"

আসলান পাঞ্জাবি ঠিক করে বইটা নিয়ে বলল, "চলুন আমিও যাই।"

জাফর আসলানের মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার দেখে বলল, "তুমি কোথায় যাবে?"

"আপনার সাথে।"

জাফর ওয়ার্ড থেকে বের হতে হতে বলল, "আমার সাথে মানে?"

"সাগরেদ তো ওস্তাদের সাথেই থাকবে।"

"উঁহু, আমি কারো ওস্তাদ না।"

"আপনি আমার ওস্তাদ।"

"বিরক্ত করো না, আমার ক্লাস আছে।"

"আমিও ক্লাস করি..."

জাফর ক্লাস নেওয়ার জন্য আরেক বিল্ডিংয়ে যেতে লাগল। আসলান চুপচাপ পিছনে পিছনে যাচ্ছে। জাফর হাঁটতে হাঁটতে বলল, "হলে যাও। পরীক্ষা দাও। আর আমি তো দূরে থাকি না যে তোমার সাথে দেখা হবে না। তোমার হল থেকে এখানে পাঁচ মিনিটের রাস্তা।"

আসলান হাঁটা থামিয়ে হেসে বলল, "ঠিক আছে, আমি বিকেলে বাসায় আসব। আসসালামু আলাইকুম।"

জাফর সালামের জবাব দিয়ে মুচকি হেসে ক্লাসের জন্য রওনা হলো।
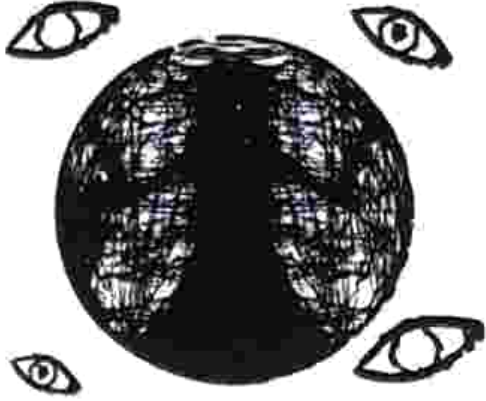
আসরের নামাজ পড়ে আসলান বের হলো। হলের বারান্দা দিয়ে হাঁটছে। শীত এসে গিয়েছে। চারদিকে কুয়াশা পড়তে শুরু করছে। ঠান্ডা বরাবরের মতো আস্তে আস্তে আসছে, সে চাদর নিয়ে আসেনি, তাই কেঁপে কেঁপে হাঁটছে। মৃদু শীত কিন্তু শুধু পাঞ্জাবি পরার কারণে তীব্র শীতের মতো ঠান্ডা অনুভব করতে হচ্ছে আসলানকে। পরীক্ষা আজ শেষ হলো। বরাবরের মতো এখন থেকে বেকার জীবন পার করা শুরু। গ্রাম থেকে কোনো চিঠি আসেনি। বাড়িতে গিয়েও তেমন কোনো কাজ নেই। সোনালির হয়তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে, মায়ের কবরটা হয়তো আবার জঙ্গলে ভরে গিয়েছে। বাড়িতে আবার কুকুরগুলো বাসা বেঁধে ফেলল।

প্রায় এক বছর হলো মাহার পরিবারের ঘটনার। যে ঘটনা বদলে দিয়েছে আসলানকে। তার সমস্ত চিন্তা, পরিকল্পনা, জীবনবিধান সব বদলে দিয়েছে। সে মাঝেমধ্যেই ঢুঁ মারে ওই বাড়িতে। মাহাকে পড়াতে আরেকটি ছেলেকে পাঠিয়েছে। যদিও তারিন আর সাজেদ প্রথমে রাজি হয়নি, কিন্তু আসলান অনেক বুঝিয়ে রাজি করিয়েছে ওদের।

অবশ্য সাজেদ প্রত্যেক তিন দিনে একবার আসলানকে দেখতে আসে। জোর করে পকেটে টাকা ঢুকিয়ে দিয়ে যায়। আড্ডা দেয়। মাঝেমধ্যে পুরো পরিবার নিয়ে হাজির হয়। সবাই একসাথে সময় কাটায়। সাজেদ তার পরিবার নিয়ে সুখেই আছে। সে অনেকটাই ভালো হয়ে গিয়েছে, রাজনীতি ছেড়ে ব্যবসাতে মনোনিবেশ করছে। তারিন পুরো সুস্থ। গতকাল আসলান সবাইকে দেখে এলো। সবাই সুখে আছে, কিন্তু শহিদ শয্যাশায়ী হয়ে গিয়েছে। তার পুরো শরীর প্যারালাইজড হয়ে গিয়েছে। দেশের বাইরেও নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু লাভ হয়নি।

সেদিনের পর থেকে জাফর নিখোঁজ। শেষবারের মতো হাসপাতালে দেখেছিল আসলান। জাফর তারিনকে নির্জন রুমে রুকইয়া করে। সেটি ছিল জাফরের শেষ উপস্থিতি। সাজেদ থেকে এই কথাটা জানতে পারে আসলান। জাফরের চেহারাটা মনে পড়লেই এক অদ্ভুত বেদনা মনকে গ্রাস করে ফেলে। জাফরকে সে তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েছে। নাসির সাহেবের বাড়িতে কয়েকশ বার গিয়েছে। তিনিও চুপ ছিলেন। কিছু বলেননি তার সম্পর্কে।

রহস্য কুরে কুরে খাচ্ছে আসলানকে। কালও গিয়েছিল নাসির সাহেবের বাসায়, জিজ্ঞেস করেছিল জাফরের কথা, কিন্তু নাসির সাহেব থেকে কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি সে। হাওয়ায় মিলিয়ে গেল একজন মানুষ। জলজ্যান্ত একজন মানুষ জাদুকরের মতো ভেলকি দেখিয়ে নিখোঁজ।

যাইহোক, শহিদুল্লাহ হলের মসজিদ থেকে বের হয়ে দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে রুমের দিকে রওনা হলো আসলান। এই এক বছরে দাড়িগুলো অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। রুমের সামনে যেতেই দেখল একটি পনেরো-ষোলো বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। শুকনো ছেলেটির দেহ, সাদা একটি শার্ট পরে আছে। আরেকটু কাছে যেতেই বুঝল সে মাসুদ। হলের ক্যান্টিন বয়। মাসুদ রুমের দিকে মুখ করে তাকিয়ে আছে। আসলান আস্তে আস্তে পা ফেলে মাসুদের পিঠে হাত রাখল। সে চমকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে আসলানের দিকে তাকাল।

আসলান মুচকি হাসি দিয়ে বলল, "কী রে? কী হয়েছে? এখানে কেন? ভিতরে চল।"

মাসুদ কিছু বলল না। একটি সাদা খাম এগিয়ে দিল আসলানের দিকে। তারপর বলল, "চিঠি এসেছে আপনার নামে।"

আসলান বেশ অবাক হলো। কে লিখবে তাকে চিঠি? যার লেখার কথা তার সাথে তো সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে। সে চিঠিটি ছোঁ মেরে নিয়ে নিল মাসুদের হাত থেকে।

"যা তুই," আসলান মাসুদকে বলল।

মাসুদ গেল না। দাঁড়িয়ে রইল।

"এখন যা। রাতে খেতে গেলে ইনশাআল্লাহ দেব।" আসলান আবার মুচকি হাসি দিয়ে বলল। মাসুদ চলে গেল।

আসলান চিঠি নিয়ে ভিতরে গেল না, একটু হেঁটে বারান্দার পিলারের কাছে দাঁড়াল। পিলারে হেলান দিয়ে চিঠিটি দেখতে লাগল। হলুদ খামে বেনামি একটি

চিঠি। খামের এপিঠ-ওপিঠে কিছুই লেখা নেই। আসলান সাতপাঁচ না ভেবে চিঠি খুলল। সাদা একটি কাগজ বের হয়ে এলো। সে কাগজটি চোখের সামনে ধরে পড়তে লাগল।

আসসালামু আলাইকুম আসলান।

আমি জাফর। তুমি হয়তো অবাক হয়েছ আমার চিঠি পেয়ে। অবাক হওয়ারই কথা। সেদিনের পর তোমার সাথে দেখা করার সুযোগ ছিল না। যদি থাকত তোমার সাথে দেখা করে আসতাম। তুমি আমাকে খুঁজছ, নিশ্চয়ই মামাকে জ্বালাচ্ছ। আমি এখন যা বাস্তব তা তোমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে। কিন্তু বাস্তবতা তোমাকে মানতে হবে।

এই পৃথিবীতে ভালো আর খারাপের যুদ্ধ অনেক আগে থেকে চলে আসছে। তেমনি পৃথিবীতে শয়তান আর বিশ্বাসীদের যুদ্ধও চলছে। আমি একজন রাকী। রাকী মানে যে রুকইয়া করে। কালো জাদুকর বা ব্ল্যাক ম্যাজিশিয়ানের সাথে যুদ্ধ লেগে থাকে আমাদের। তারা ইবলিসের সহচর। দুনিয়ার মানুষদের নানাভাবে ক্ষতি করে।

সেদিন বিকেলে আমি তারিনকে যখন রুকইয়া করি তখন একটি নাম পাই আমি। সেই নামের জের ধরে ঘটনাচক্রে আমি একটা অ্যাকসিডেন্টের শিকার হয়ে এখন চট্টগ্রামে এক প্রত্যন্ত গ্রামে আছি। মামার সাথে কিছুদিন হলো আমার যোগাযোগ হয়েছে। আমরা ভুল সাহিরের সন্ধান পেয়েছিলাম। একজন সাহির জন্নু কবিরাজকে পেয়াদা হিসেবে ব্যবহার করেছে।

যাইহোক, তোমার সাথে আমার পরিচয় অনাকাঙ্ক্ষিত। সেই পরিচয় থেকে তোমার প্রতি মায়া জন্মে গিয়েছে। আমি কয়েকদিনের মধ্যে ইনশাআল্লাহ ঢাকা পৌঁছে যাব। কিন্তু তার আগেই তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। যাত্রাবাড়িতে

গিয়ে ইব্রাহিম আলীর খোঁজ করো। আমার সময় নেই, নাহয় আমিই যেতাম। আশা করি আল্লাহ্ তায়ালা তোমার পাশে থাকবেন।

ইতি
তোমার ওস্তাদ,
জাফর আহমেদ।

আসলানের চোখ থেকে টপটপ করে দুই ফোঁটা পানি পড়ল চিঠির উপর। তার চোখদুটি ঝাপসা হয়ে এলো। সে চমকে উঠল, কারণ তার কান্না পাচ্ছিল। মা মারা যাওয়ার সময় তার চোখ দিয়ে পানি আসেনি, কিন্তু চিঠি পড়ার পর তার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। আবেগে সে ভীষণ পাতলা হয়ে গিয়েছে এখন। সে পানি মুছে আবার চিঠিটি চোখের সামনে ধরল পড়ার জন্য। এবার আবার চমকে উঠল।

চিঠির উপর পানি পড়তেই সেখানে সবগুলা লেখা মিলিয়ে যেতে লাগল। একে একে চোখের কয়েক ফোঁটা পানি সমস্ত কালো কালির অক্ষরগুলো মুছে দিতে লাগল। দেখতে দেখতে সমস্ত অক্ষর মুছে সাদা হয়ে গেল পুরো কাগজটি। হতভম্ব হয়ে আবার কাগজের দিকে তাকাতেই দেখল সেখানে ফুটে উঠেছে,

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

"যাঁরা ঈমান আনেন এবং তাঁদের মহান রবের উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করেন, তাঁদের উপর সে (শয়তান) আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না।" [সূরা নহল— ৯৯]

দেখে মুচকি হাসল আসলান। সাদা কাগজটি পকেটে পুরে নিল। বারান্দা থেকে হেঁটে ক্যান্টিনের দিকে রওনা দিল সে। নিশ্চিত হতে হবে মাসুদ এসেছিল কি না। ক্যান্টিনের কাছে যেতেই আসলান দেখল মাসুদ ক্যান্টিন ম্যানেজারের সাথে বসে আছে।

"এই মাসুদ!" দূর থেকে ডাক দিল আসলান।

ডাক শুনে মাসুদ ছুটে এলো।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "কী হয়েছে ভাই? "

আসলান চোখ সরু করে বলল, "তুই কি আমার সাথে একটু আগে দেখা করতে এসেছিলি?"

"কী বলেন ভাই! আমি তো এইমাত্র বাজার থেকে আসলাম!" মাসুদ ঝট করে জবাব দেয়।

"আচ্ছা যা," আসলান বলল। মাসুদ চলে গেল।

আসলান আবার ঘুরে নিজের রুমের দিকে রওনা দিল আর পড়তে লাগল,

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
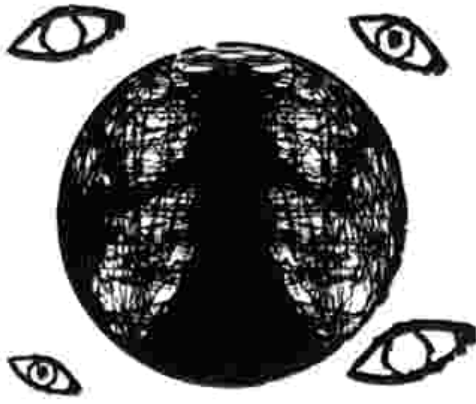
গোসল করেছে রফিক। পানি দিয়ে না, বরং বিদঘুটে ঘাম দিয়ে। বাগানের ফুলগাছগুলো লাগাতে গিয়ে এই অবস্থা হয়েছে। সেই ভয়াবহ ঘটনার পর প্রায় এক বছর পার হয়ে গেছে। এক বছর ধরে বাগানের আশেপাশে কেউ আসেনি। এই বাগান থেকেই চল্লিশটি তাবিজ তুলেছিল রফিক। সাজেদ বলল, বাগান খুঁড়ে দেখতে। প্রায় তিন-চার হাত নিচে খোঁড়ার পর একটি বাক্স দেখতে পেল। সবুজ রঙের একটি কাঠের বাক্স, বাক্সটি বেশি বড় ছিল না, ছোট একটি বাক্স। বাক্সটি দেখে রফিক ভেবেছিল গুপ্তধন তার হাতে লেগেছে। সে আনন্দিত হয়ে তা তুলে নিয়ে আসে।

সাজেদ সেটি ভাঙতে নির্দেশ দিল। বাক্সের মধ্যে কোন তালা ছিল না, চারদিক থেকে পেরেক লাগানো ছিল। রফিক কুড়াল এনে বাক্স কাটল, দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে ফেলল। বাক্স খুলে দেখল তার মধ্যে চল্লিশটি তাবিজ। রফিকের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। সাজেদ নির্দেশ দিল তাবিজগুলো বাক্স থেকে বাইরে নিয়ে আসতে। তাবিজগুলো বাইরে আনতেই দেখল সেগুলো সাজেদ আর তারিনের কাপড় দিয়ে মুড়ানো। সেগুলো এক হুজুরকে দেওয়া হলো, তারপর হুজুর সেগুলোকে ঝাড়ফুঁক করে রেখে দিলেন। বাকিটা রফিক জানে না, জানার ইচ্ছাও ছিল না, বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েছে এ-ই বড় কথা।

রফিক ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে। সেই সকালে এসে কাজে লেগেছে এখানে। সূর্য এখন মাথার উপর, একটু পর জোহরের আজান দেবে। এখন উঠতে হবে, উঠে গোসল করে নামাজে যেতে হবে। সে ঝুড়ির মধ্যে কাস্তে রাখল। বিকেলে আবার একদফা কাজ করতে হবে। সে উঠে ঘরের দিকে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে যখন দরজার সামনে এলো ঠিক এমন সময় অস্বাভাবিক অনুভূতি হলো তার। যেমনটা হয়েছিল আট মাস আগে। ভয়ে তার পেটের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠল। দরজা আংশিক খোলা।

রফিক সূরা পড়ে নিল, যা যা পারে সব পড়ে বুকে ফুঁ দিল, তারপর দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলল। ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হলো। দরজা খুলেই ভিতরে ঢুকল সে। পুরো হলরুম ফাঁকা। কেউ নেই। হলরুমে যেতেই প্রচণ্ড পোড়া গন্ধ নাকে এলো রফিকের। মনে হচ্ছে কিছু পুড়ছে। রফিক রান্নাঘরের দিকে তাকাল, রান্নাঘর ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে, তারিন কি নেই নাকি সেখানে!

রফিক হলরুম থেকেই ডাক দিল, "তারিন! এই তারিন!"

কোনো জবাব নেই, অথচ এত জোরে ডাক দিয়েছে যে দোতলা থেকেও সেই ডাক শোনা যাওয়ার কথা। উপায়ান্তর না দেখে রফিক নিজেই গেল কিচেনে। যেতেই ধোঁয়া এসে তার নাক দিয়ে ঢুকল। সে হাঁচি দিল কয়েকটা, তারপর মুখ চেপে চলে গেল চুলার কাছে। ধোঁয়ায় কিছুই ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না। সবকিছু আচ্ছন্ন হয়ে আছে ধোঁয়াতে। চুলার কাছে গিয়ে চুলা বন্ধ করে দিল। তারিনের উপর রাগ হলো। এতটা কাণ্ডজ্ঞানহীন কী করে হতে পারে একটা মানুষ!

কিছুক্ষণের মধ্যে ধোঁয়া চলে গিয়ে সবকিছু স্পষ্ট হলো। রফিক চুলার উপর দেখল কী পুড়ছে। যদিও মাংস পোড়ার গন্ধ আসছে, তবুও সে উঁকি দিয়ে দেখার জন্য হাতে ন্যাকড়া নিয়ে পাতিল থেকে ঢাকনা সরিয়ে নিল। ঢাকনা সরাতেই একটি বাজে গন্ধ এসে লাগল নাকে, সাথে এক পশলা ধোঁয়া। সহ্য করতে না পেরে সে পিছিয়ে গেল, বাজে দুর্গন্ধ আসছে পাতিল থেকে।

রফিক নাক চেপে দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে আস্তে পাতিলের ওপর থেকে ধোঁয়া সরে যেতেই সে এগিয়ে গেল। ভিতরে চোখ রাখতেই দেখল পাতিলের মধ্যে একটি মাথা। কোনো পশুর মাথা না, মানুষের মাথা। মাথায় কোনো চুল নেই, মুখ থেকে সমস্ত মাংস গলে পাতিলের চারপাশে পড়ে আছে, চোখদুটি গলে বের হয়ে আছে। মাথাটা আর কারও নয়, শহিদের! এ দৃশ্য দেখেই রফিক 'আল্লাহ!' বলে পিছিয়ে আসল।

রফিকের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। এ কী দেখল সে! তার বুক ধকধক করছে, মনে হচ্ছে হৃৎপিণ্ডে কেউ হাতুড়ি দিয়ে পিটাচ্ছে। এক দৌড় দিয়ে রান্নাঘর থেকে বের হয়ে এল হলরুমে। হলরুমে এসে থেমে জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল। দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, ঠিকমতো শ্বাস নিতে পারছে না। বড় করে হাঁ করে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছে সে। বুকেও প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছে। রফিক দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে সোফায় বসল।

সোফায় হেলান দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগল। চোখ লেগে আসছে তার। রফিক চোখ খোলা রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করল। অতি কষ্টে ডাক দিল, "সাজেদ! সাজেদ !...সাজে..."

আর পারছে না রফিক, মনে হচ্ছে এখনই মারা যাবে। চোখ লেগে আসছে, চেতনা লোপ পাচ্ছে, তার চোখ বন্ধ হয়ে আসল। থপথপ শব্দ এসে তার কানে বাজল। কে যেন আওয়াজ করে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছে। রফিক সব শক্তি একত্রিত করে চোখ খুলল। সিঁড়ির দিকে তাকাতেই দেখল মাহা নামছে। তার দিকে তাকাতেই রফিকের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। মাহার দুই হাতে দুটি কাটা মাথা, মাথাদুটি তারিন আর সাজেদের। মাহা তাদের চুল ধরে টেনে নামাচ্ছে। মাথা দুটি থেকে রক্ত গড়িয়ে নিচে পড়ছে, রক্ত গড়িয়ে নিচে পড়ার টপটপ শব্দ রফিকের কানে আসল।

এই টপটপ শব্দ রফিকের হৃৎস্পন্দন আরও বাড়িয়ে দিল। বুকও ব্যথায় ফেটে যাচ্ছে, এই বুঝি সে মারা গেল। সে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, কিন্তু শরীরে কোনো জোর পাচ্ছে না। কোমর থেকে উপরের অংশ অবশ হয়ে গেল। মাহার দিকে তাকাতেই সাজেদ আর তারিনের কাটা মাথা চোখে পড়ল। দুজনেরই চোখ খোলা, মনে হচ্ছে জীবিত অবস্থায় মাথা কাটা হয়েছে তাদের। সাজেদের চেহারার প্রচণ্ড বিষাদের ছাপ ফুটে উঠেছে। সে এগুলো দেখে সহ্য করতে পারল না, জোরে চিৎকার করল। তার চিৎকারে সমগ্র বাড়ি কেঁপে উঠল।

মাহা আস্তে আস্তে রফিকের কাছে আসল। রফিক চোখ খুলে তাকাল, মাহার মুখের দিকে চোখ পড়ল তার। সেই নিষ্পাপ মুখ, গোলাপের পাপড়ির মতো দুটি ঠোঁট, নিষ্পাপ দুটি চোখ। চেহারায় কোনো পাষণ্ডতা, ক্রুরতা, হিংস্রতা দেখতে পেল না সে। মাহা তার দিকে তাকিয়ে হাসি দিল। কী ভয়ংকর সে হাসি! সে নিতে পারল না, আবার চিৎকার করল। এবারও কোনো কাজ হলো না। রফিকের দুই চোখ বেয়ে অঝোরে পানি ঝরতে লাগল।

এবার সে মিনতি করে বলল "আমাকে ছেড়ে দাও।"

মাহা এবার হাসি দিল। অট্টহাসি। হাসির শব্দে পুরো বাড়িটি জেগে উঠল। রফিক নির্বাক হয়ে গেল মাহার গলার শব্দ শুনে। বাকশক্তিহীন মাহা কী করে এত জোরে হাসি দেয়? মাহা মাথা দুটি রফিকের সামনে ধরে বলল, "হ্যালো বাবা!"

অতসী!

অতসীর পেটে আর কারও বাচ্চা ছিল না, তা ছিল রফিকের। সাজেদের আড়ালে অতসীর সাথে সম্পর্ক করে সে। সেটার জের ধরেই অতসীর বাচ্চা হয়। কিন্তু সে বাচ্চাকে তো রফিক ফেলে দিয়ে আসে! অতসীকে এক বছর সে নিজের

বাড়িতে লুকিয়ে রাখে। সাজেদকে বলে মিডিয়া জানতে পারলে তাকে এমপি হতে দেবে না। এক বছর অতসীকে লুকিয়ে রাখতে হবে। সাজেদ রফিকের ফাঁদে পা দেয়। অতসীকে তার সাথে পাঠিয়ে দেয়।

অতসীকে সেখানে বাচ্চা প্রসব করে। বাচ্চা হওয়ার পর অতসীকে আবার ঢাকায় নিয়ে আসে। কিন্তু বাচ্চাটিকে সে তো রাস্তায় রেখে এসেছিল। রফিক বুঝতে পারে অতসীকে ঢাকা থেকে ভাগাতে হবে। মাহা আসার পর সে সুযোগ এসে যায় তার কাছে। সে সাজেদকে প্ররোচিত করে অতসীকে ঢাকা ছাড়তে বাধ্য করে। রফিক অতসীর মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে হুমকি দিয়ে তাকে চুপ থাকতে বাধ্য করে কিন্তু এতগুলো বছরেও অতসীর কাছ থেকে কোনো চিঠি পায়নি সে।

মাহার চেহারায় অতসীর চেহারা ফুটে উঠল। রফিক ভয়ে চোখ বুজে ফেলল। নিজের জন্য তার ভাইয়ের পরিবার মারা পড়ল। বিষয়টি তাকে মৃত্যুর থেকেও বেশি কষ্ট দিচ্ছে। নিজের মৃত্যু নিজের চোখে দেখতে চায় না সে। সে জানে তার রক্ষে নেই। শেষ সময়ে আল্লাহকে স্মরণ করার প্রস্তুতি নিল সে। 'আল্লাহ' বলে ডাক দিল। ডাক দিয়েই অন্ধকার জগতে হারিয়ে গেল।